একুশ বিঘার বসত

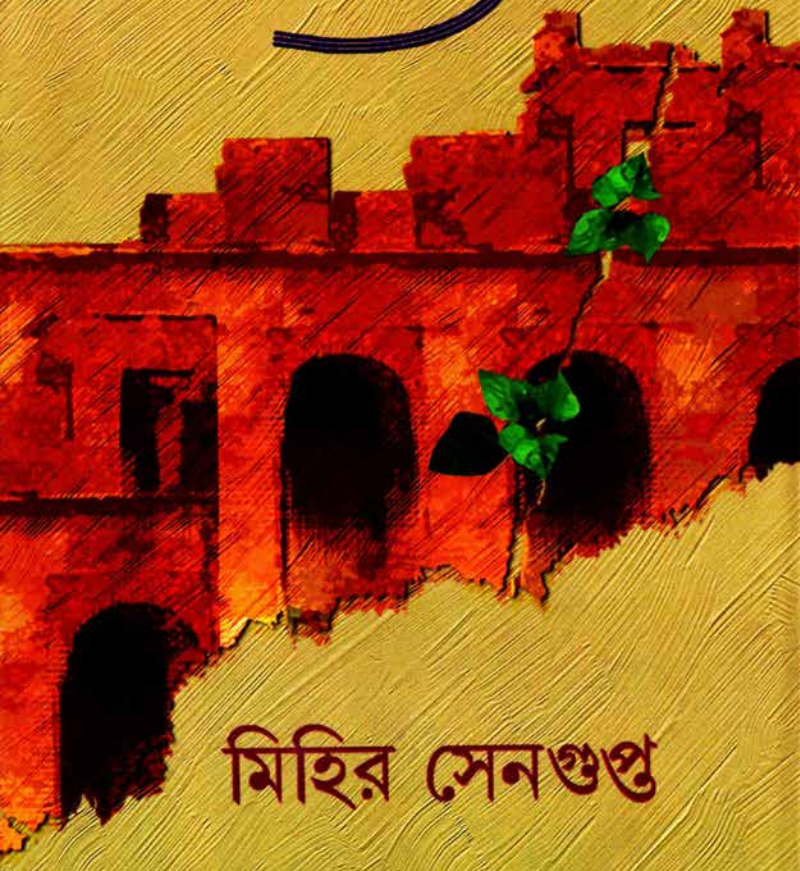

মিহির সেনগুপ্ত

একুশ বিঘার বসত

মিহির সেনগুপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

নি বে দ ন

পুজিপাটা তেমন কিছু নেই। অথচ খরচের হাত বে-হিসাবি। লেখক সতীর্থরা বলেন, শুরুতেই পুঁজি-পাটা সব একটাই মাত্র জাবেদা বইএর দুই মলাটে গুঁজে দিয়ে বসে আছো, পরে কী করবে? কথাটা সওয়া-ভাগ সত্যি। কিন্তু যার যা স্বভাব। কী আর করা যাবে।

এখন কায়ক্লেশে, উঞ্ছবৃত্তির খুদ-কুড়ো নিয়ে দোকানদারি বজায় রাখা। তাও নানান জাতের চালের খুদ। তবে ভরসা এই, গরম গরম খুদের 'জাউ' পছন্দ করারও মানুষ আছে। তাঁরা যদি মাংস-মিষ্টান্নর মুখ পাল্টে একটু সাবেক গরিবী-খাদ্যটা আস্বাদ করেন গেরস্থ হিসাবে অতিথি সেবার পূণ্যিটাতো হবে।

একটা কথাই শুধু বলার। মনটাই নেই, তাই মনন-শীলতা আশা করবেন না। আনন্দটাও নেই, তাই বিনোদনের লোভও দেখাতে পারছি না। আছে শুধু বুকের বাঁ-দিকের কিঞ্চিৎ হাঁচোর-পাঁচোর। তারই খানিকটা ভাগ যদি আপনারা নেন তাহলেই হবে। আর আছে কিছু সাম্প্রতিক পাঠ-প্রসঙ্গ, মন আর মননের কিছু প্রচেষ্টা। টাক্‌না হিসাবে চেখে দেখতে পারেন।

কৃতজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট সবাইকে।

বিনীত লেখক
বই মেলা ২০১০

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

একুশ বিঘার বসত

একুশ বিঘার বসত

(এক)

প্রায় পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগের দেখা বাড়িটাকে আজ সকালে একেবারেই নতুন করে আবিষ্কার করলাম যেন। এটা কি সেই বাড়িটা যাকে এই গ্রামগুলির মানুষেরা এমনকী তিন মাইল দূরের বন্দর শহর বা তখনো যাকে গঞ্জ বলা হতো, মহারাজগঞ্জ, সেখানেরও ধনী দরিদ্র সবাই বাড়োবাড়ি বলতো? কিছুতেই যেন মেলাতে পারছিলাম না। এতোটুকুন! অথচ, শৈশবে কি বিশাল আকৃতিরই না মনে হতো বাড়িটাকে। সামনে সিঁড়িগুলির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা এমন এক বিন্যাসে ছিল যে মনে হতো যেন একটা অট্টালিকা। আর আজ? আজ এটা যেন একটা পাঁচপেঁচি দালান বাড়ি। অনধিক অর্ধশতকের ব্যবধানে অনেক বড়ো একটা ইমারত এরকম ছোট হয়ে যায় নাকি! নাকি প্রাচীনত্বের জন্য বাড়িটা মাটিতে বসে গেছে। সেটা অবশ্য খানিকটা সত্য। নইলে প্রাচীন নগর, প্রাসাদ একসময় প্রত্নবস্তু হয়ে যায় কী করে? তবে বাইরের থেকে ছোট মনে হলেও, ভেতরে গেলে তা মনে হয় না।

অন্য একটা কারণও আছে ছোট দেখাবার, বড়ো ছোট পরিমাপের মধ্যের আপেক্ষিকতা সেটা। যখন শৈশব কৈশোরে এই গ্রাম বা আশপাশ দুদশ গ্রামের ছোট ছোট টিনের ঘর, পাতার কুটিরের আকৃতির ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে এই বাড়িটাকে দেখতাম, তখন এর বড়োত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অহংকারী ছিল। গাম্ভীর্যে গম্‌গম্ করতো সে। অলিন্দের থামগুলির স্থূল আকৃতি প্রায় রবিবর্মার ছবিতে দেখা প্রাসাদ অট্টালিকার গথিক অবয়বের মতো মনে হতো। তাদের আড়ালের পায়রা কবুতরদের চৌখুপিগুলো পর্যন্ত ছিল আকারে বেশ বড়ো সম্ভ্রমে। এতকাল পরে এসে আজ যেরকমটা দেখতে পাচ্ছি, তার সঙ্গে কোনও মিলই নেই। ব্যাপারটা হঠাৎ আশ্চর্যতায় আমাকে যেন কেমন বিমূঢ় করে দিল।

বাড়িটা ভেঙ্গে চুরে বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে। তার সর্বাঙ্গে বা বিশেষ বিশেষ স্থানে বটের শেকড় অজগরের পেশির মতো গা ফুলিয়ে আছে। এ সব কিছু অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু 'বড়ো বাড়ির' বাড়িটার আকৃতি এতো ছোট হয়ে গেল কী করে?

একটা গল্প মনে পড়লো। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় অবন ঠাকুরের প্রিয় একটি বনসাই তেতুল গাছ ছিল। এক ছাত্রকে বলেছিলেন গাছটির একটা ছবি লিখতে। সে বেশ ভালো ছবি আঁকিয়ে ছিল। অত্যন্ত নিষ্ঠায়

BanglaBook.org

সে আঁকলো সেই বনসাই তেঁতুলের ছবি, একেবারে টবটি সুদ্ধু। যখন গুরুকে দেখালেন সেই ছবি, তিনি বললেন, "তেঁতুল গাছ কোথায়? এযে টব এঁকেছ"। ছাত্র টবে গাছটি যেমন দেখেছিল তেমনই এঁকেছে। অবন ঠাকুর বললেন, "গাছ আঁকতে বললুম তুমি টব এঁকে বসলে! আমার তেঁতুল গাছকে তাহলে তুমি দেখতেই পাওনি। আমার গাছ কী ঐটুকুন নাকি? ছবি আঁকছিলে যখন গাছের বয়সের কথা মনে হয়নি? কী দেখছিলে ঠিক করে বলতো? টব না গাছ?

—আজ্ঞে, গাছও দেখছিলুম, টবও দেখছিলুম।

—কে তোমায় টব দেখতে বলল? অর্জুনের লক্ষ্যভেদের গল্প পড়েছ? পড়ে নিও। শুধু যদি গাছটাকে দেখতে চোখের সামনে, গাছটা বড়ো হয়ে যেত। তুমি হয়ে যেতে ছোটো। গাছের ডাল যে কতকালের পুরনো, কত তার বয়স স্পষ্ট দেখতে পেতে।" এর পরে তিনি ছবিটাকে ঠিক করে দিলেন। টবের অর্ধেকটা বাদ দিয়ে বাকি অর্ধেকটা দিলেন রঙ দিয়ে ঢেকে জমির সঙ্গে মিলিয়ে। ছাত্রকে বললেন দূরের রেলিং-এর কাছে দাঁড়াতে। তারপর ছোট্ট করে আঁকলেন তার অনুগত চেহারা এবং এক টুকরো আকাশ। বললেন, "কত এর বয়েস! এর সঙ্গে চালাকি? দিলুম তোমাকে বুড়ো-আংলা করে। নাও।"

এখন বাড়িটাকে ছোট দেখে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'দক্ষিণের বারান্দা'র এই ধ্রুপদী গল্পটিই আমার মনে পড়ল। অবন ঠাকুর ছাত্রটিকে বলেছিলেন যে, তার চোখ ঠিক হয়নি। আমি যখন বাড়িটা ছেড়ে চলে যাই জন্মের শোধ, তখন আমার বয়স আর আকৃতি ছিল তেঁতুল গাছের তলায় পরে আঁকা ঐ 'বুড়ো আংলার'। বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে তাই তাকে পেল্লায় মনে হওয়ায় কোনো ভ্রম হয়নি। আজ এতকাল পরে আমার সেই চোখ, শৈশবী বিস্ময়বোধ কীভাবে থাকবে? চোখটাও তৈরি হয়নি, বয়সটাও গেছে বেড়ে।

গঞ্জের খেয়া পেরিয়ে, ভারানির খালের কিনার ধরে যখন চলতে শুরু করেছিলাম, তখন বাড়িটার ছবি মনের মধ্যে আস্তে আস্তে ফুটে উঠছিল একটা বড়ো ক্যানভাসে আঁকা ছবির মতো। কোন্ এক অদৃশ্য শিল্পী যেন গভীর নিষ্ঠায় ফুটিয়ে তুলছিল সেই ছবি। সেই শিল্পী হয়তো আমারই এক সত্তা। নচেৎ পুরো ছবিটার জন্য আমাকে একটা ধারা বিবরণী তার কাছে বলে যেতে হতো। এটাতো কাল্পনিক কোনো ছবি নয়। এটা যে বাস্তবে আছে এবং সেই বাস্তবের সঙ্গে আমার মনের মধ্যের চিত্রটাকে মিলিয়ে নিতে চাইছি আমি। এখন যেমন এই ডানদিকে ভারানির খালটাকে রেখে, বাঁহাতি মুসলমানদের একটা গ্রাম।

BanglaBook.org

গ্রামটার নাম জানি না, অথবা একদিন হয়তো জানতাম আজ মনে নেই। মুসলমানদের গ্রাম এরকম নির্দিষ্ট করে বলছি একারণে এই গ্রামে কোনো অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের বসতি শৈশবে দেখিনি। গ্রামটি নদীর গা ঘেঁষে। রাস্তার বাঁ পাশ ঘেঁষেই ইতস্তত সুপারি পাতা বা টিনের ঘেরাটোপ বাড়িগুলোর আব্রু রক্ষার জন্য। আর সুপারি গাছের সারি।

বাড়িটার ছবি যদিও মনের ক্যানভাসে আঁকা হয়ে চলেছে, তারই সঙ্গে তাল রেখে এই রাস্তাটার ছবিটাও লেখা হয়ে চলেছে। অথবা এমনও বলা যায় যে এর কোনোটাই নতুন করে আঁকা হচ্ছে না। যেন একটা অ্যালবাম এবং আমি জানি পরপর কোন্ কোন্ ছবি গুলো সাজানো আছে, আমি শুধু পাতা উল্টে দেখে যাব।

খেয়া পেরিয়ে খানিকদূর চলতে চলতে তেমন কিছু তফাৎ নজরে আসেনি। সবকিছু মোটামুটি একরকমই আছে। রাস্তাটাও যে পর্যন্ত পাতা ইঁটে বাঁধাই ছিল তেমনই আছে। কোনো কিছুরই বিশেষ পরিবর্তন নজরে আসছে না। এরকম একটা স্থিতিশীলতায় মন বেশ আরাম পাচ্ছিল। যেন যেমনটি ছেড়ে গিয়েছিলাম তেমটিই আছে। ভারানির খালটাও এঁকেবেঁকে, এই আছে এই নেই করে শেষ পর্যন্ত রুপোসিয়ার 'ঠোডা'র কাছে গিয়ে গাবখানের নদী বা খালে পড়েছে। এই দৃশ্য স্মৃতির অ্যালবামের সঙ্গে কোনোরকম ব্যাপক বৈপরীত্যে যায়নি। সামান্য দু-চারটা যা ব্যতিক্রম নজরে পড়েছে, তা হঠাৎ আছাড় দেওয়ার মতো কোনো পরিবর্তন নয়, যেমন, খেয়াপার হবার পর, এপারে কয়েকটা অতিগর্জনশীল মোটর চালিত যান চোখে পড়েছে, যেগুলো ডানহাতি মূল রাস্তা ধরে সোজা চলে যাবে কীর্তিপপাশা, এখানকার নামকরা গ্রাম। সেদিকটায় এখানো মানুষজনের আনাগোনা ভালো, কারণ সেখানে একটা বাজার আছে। ওই রাস্তায়ও মাইলখানেক গিয়ে, বাঁহাতি মেঠো রাস্তায় আরও মাইল খানেক হাঁটলে আমার গ্রামে পৌঁছোনো যায়। সে রাস্তাও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের (কাউন্সিলের) তত্ত্বাবধানে, তবে বর্তমানে একেবারেই অসংস্কৃত। যথেষ্ট হাঁটার লোক নেই, সুতরাং কারুর সংস্কার করানোর দায়ও নেই।

গঞ্জের একেবারে এত কাছে হয়েও এই অঞ্চলটুকুর কোনো উন্নয়ন হয়নি। শুধু একটা ছোটো খেয়ার এপার ওপার। আসলে শহর বাড়ছে পূবে আর উত্তরে। খানিক এগিয়েই আছে এক লোহার ব্রিজ এবং তার উপর দিয়েই

BanglaBook.org

আধুনিক হাইওয়ের গতি সরাসরি পূবে পশ্চিমে। সুতরাং নাগরিকতা, উন্নয়ন তাকে কেন্দ্র করেই সব। কিন্তু যে যাই বলুন আর ভাবুন, আমার কিন্তু এই সুপারি গাছ ঘেরা অঞ্চলটি তার ঝোপঝাড় সমন্বিত এই ভারানির খালটি বড়ো প্রাণ কাড়ছে। কারণ তার সঙ্গে স্মৃতি খাপ খেয়ে গেছে। আর দক্ষিণে আছে নদী। সে এক সুখ।

কিন্তু সে সুখ সইলো না। অ্যালবামের একটা পাতা যেন তেরছা ভাবে ছিঁড়ে গেল। ভাবছিলাম ভারানির খালের মুখে এসে বাঁয়ে দেখবো নদীর বিস্তার। নদীর পার ধরে মেঠো রাস্তায় ছোটবেলার অনেক অনেক আরও সব স্মৃতির ছবি দেখতে দেখতে, গঞ্জ থেকে কিনে আনা চিনে বাদাম ভাঙতে ভাঙতে আর খেতে খেতে ঘণ্টা, সওয়া ঘণ্টা, বয়সটাও ভুলে চলতে থাকবো, চলতেই থাকবো, যতক্ষণ না নৈকাঠি-কেওড়ার খালের মুখটাতে পৌঁছোই। বাঁয়ে নদী, নদীতে নৌকো, ক্বচিৎ লঞ্চ বা ইস্টিমার বা গাদা-বোট দেখতে দেখতে, বা আমার দিকের পারের কোনো গুণটানাইয়ার সঙ্গে দেখা হলে, চলতে চলতেই দুচারটা কথা আদানপ্রদান হবে। অথবা এ গাঙে কী এখন আর কলমিকান্দরের যে জিওলি বা কৈবর্তদের আমি চিনতাম তারা মাছ ধরতে আসে না দল বেঁধে আগের মতো? তাহলে তাদের সঙ্গে কিছু পুরোনো পরিচয় ঝালাই করা যাবে। ওই গ্রামের জিতেনের বাবা শ্রীধর কৈবর্তের সঙ্গে একবার জিতেন আর আমি এসেছিলাম ইল্‌শার মরশুমে রূপোসইয়ার ঠোডায়। মাছ পাওয়া যায়নি। পথে শ্রীধর কাকা রাগতভাবে বলেছিলেন, বাবুর বাড়ির পোলারে লইয়া আইছ ইল্‌শা মাছ ধরতে, মাছ পাবি না বাল পাবি। বাল কথাটা বাংলায় অসভ্য কথা। পরে জেনেছি হিন্দিতে চুলকে বাল বলে এবং সেটা অসভ্য কথা নয়। তখনতো হিন্দি জানতাম না, তাই আমার খুব রাগ হয়েছিল। জিতেনেরও। সে আমার বন্ধু। সে জানতো ভদ্দরলোকেরা 'অসোইব্য কতা' কয় না, ছোটদের সামনে তো নয়ই। সে বাপকে তেড়ে বলেছিল, "খমাহা—খামার দেও কিয়া? দেহ না বড়োবাড়ির পোলায় নাওয়ে রইছে?" অসভ্য কথা মানেই 'খামার'। গালাগালি দেওয়া অসভ্য শব্দ বলাকে এখানে খামার বলে। শ্রীধর কাকা ছেলের ধমকে খুবই অপ্রস্তুত হয়েছিলেন সেদিন। ঠোডার মুখে আসতে আসতে, নদী যেমন গাছপালার ফাঁক দিয়ে নজরে এলো, কথাটা মনে পড়লো।

ভারানির ওপরের সাঁকোটা পেরিয়েই মনের মধ্যের চলমান চিত্রমালা ছিন্ন হয়ে গেল। নদীটা নাকি এইটুকু! এইখানে ভারানি নদীতে মিশেছে। এই

BanglaBook.org

'ঠোডাই' রূপোস্ইয়ার ঠোডা'। সুগন্ধা থেকে বেরিয়ে আসা এই খালটাই ধানসিদ্ধির খাল, যা উনিশ শতকের কোনো এক সময় ব্রিটিশ শাসকেরা কাটিয়ে বড়ো করে কচার সঙ্গে যুক্ত করেছিল। তদবধি আমরা একে গাবখানের খাল বলি। ওপারের গ্রামটির নাম গাবখান। কিন্তু সে কী এতো ছোট ছিল?

এখানেও বোধহয় চোখের দৃষ্টির আপেক্ষিকতার ব্যাপার আছে। যে বয়সে তাকে প্রথম দেখেছি, সেই বয়সের চোখটা আর নেই। এরপর সুদীর্ঘ অদর্শনকালে তার পরিবর্তন এবং আমর চোখের দৃষ্টির পরিবর্তনে সামঞ্জস্য রক্ষা হয়নি। সময় বড়ো লুকোচুরি খেলনেওয়ালা যাদুকর। "আছে" কে নেই করতে বড়োকে ছোট করতেই তার দক্ষতা যেন বেশি। অন্তত এই এখন, যখন আমি মাত্র আধাশতক, কী তারও কম একটা সামান্য সময়ের ব্যবধানে ছোটবেলার সোজা পথটা ছেড়ে, হাঁটছি সামান্য ঘুর পথে, মনে উত্তেজনা বড়োবাড়ি দেখতে যাব। ঘুর পথে কেন? কারণ নদীটাকেও তো দেখতে হবে। কতদিন পর! বড়োবাড়ি দেখার সঙ্গে নদীর যোগটা কী? একথা যদি শুধোও, সে অনেক কথা বলতে হবে, অনেক পথ ঘুরতে এবং ঘোরাতে হবে। সেদিকে যাব না। শুধু একটা কথা বললেই বেবাক বোঝা যাবে। বড়ো-বাড়ির মানুষেরা এই নদীর বুক বেয়েই চিরকালের জন্য চলে গিয়েছিল পশ্চিম পানে। তারপর হারিয়ে গেল তারা। শুধু হারানো অবস্থা থেকে ফিরে এসেছি আমি। বাড়িটা একবার দেখব বলে। এই পথে এলে নদীকে পাবো, হয়তো আরও অনেককে অনেক কিছুকে পাবো। খেয়া পেরিয়ে তাই মন হলো এই পথেই যেতে হবে। আমি নদীকে দেখবো, নদী আমাকে দেখবে। তারপর কতো কী হতে পারে। ছোটবেলার অনেক গল্প আর স্মৃতি আছে এই নদীর বিষয়ে আমার। তার দু'একটা শোনানো যেতে পারে। বড়োবাড়ি এখানো ঢের পথ। ততক্ষণ সেই গল্প শোনাই। কাকে শোনাবো? কাকে আবার? আশপাশে তো কেউই নেই। নিজেকেই শোনাই, না হয় নদীকে। ছোটোখাটো, রোগা পাতলা হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু সেতো আছেই। সে সব সময়ই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, সেই প্রথম দেখা থেকেই।

একটা গল্প বাঁধা আছে নলখুরি ফুলের লতার সঙ্গে। সারাজীবনে আর সেটা ভুলতে পারলাম না। এখন শরতকাল। আর কয়েকটা দিন পরেই লক্ষ্মীপুজো। নদীর কিনারে যে হোগলা বন, তার গোড়ায় ঐতো অনেকগুলো লতা জড়াজড়ি

BanglaBook.org

করে আছে। সাদা এবং হালকা বেগুনির মিশেলে ফুলগুলো যেন আমারই জন্য ফুটে রয়েছে। মায়ের কথা মনে পড়েছে। বড়োবাড়ি— যেখানে যাচ্ছি সেই বাড়ির 'সোনা ঠাইরন'— সোনা ঠাকরুণ। কিন্তু তাঁর কথা মনে পড়ছে কেন? আসলে ঐ যে গল্পটা বলতে চেয়ে, মনে করতে চেষ্টা করছিলাম, সেটা ভেঙে ভেঙে মনে আসতে চাইছে। এইরকম ভাঙা টুকরো ছবিগুলো, মনের মধ্যে জড়ো হলে, এই সংলাপটাও ভেসে উঠলো—

—আইজ লক্ষ্মীপূজা। নলথুরি ফুল আর লতা লাগে এই পূজায়। কাউরে লইয়া খালপার থিকা আনতে পারবি?

—পারমু।

—একলা যাইস না, খবরদার। জলে টলে পড়বি।

—না পড়মু না।

—কাউরে লগে লইস।

—হ, লমু হ্যানে।

তারপর দৌড়। কিন্তু সঙ্গে আর কাকে নেবো। আশপাশ বাড়িগুলোর বেশিরভাগই দেশ ছেড়ে হিন্দুস্তান। দু-এক ঘর যারা আছে, তাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা নিজেদের বাড়ির পুজোর জন্য নলথুরি সেই ভোরবেলায় উঠে জোগাড় করে রেখেছে। এখন তারা অন্য কাজে ব্যস্ত। বড়ো খালপারের একটা মাত্র হোগল ঝোপে যতটা ছিল সব সাফ। এখন আনতে হলে যেতে হবে নদীর পারে। তখনও নদী আমার একবারের জন্যও দেখা হয়নি। মা বুঝতে পারলে বলবেন, লাগবে না, কাউর বাড়ি থিকা চাইয়া নিমু হ্যানে। আর বাবা যদি টের পান, নদীপারে যাওয়ার সাহস ব্যক্ত করার জন্যই খড়ম-পেটা করবেন। কিন্তু মাথার মধ্যে তখন নলথুরি গৌণ, নদী তার কল্লোল শুরু করে দিয়েছে। নদীর কাছে যেতে হবেই।

তারপর সে এক দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী। তখন সময় দুপুর। বড়োবাড়ির লোকেরা খেয়েদেয়ে গড়াচ্ছে। জানা ছিল বড়ো খালের পার ধরে সোজা দক্ষিণে গেলে নদী। শুনেছিলাম বাড়ির এক চাকরের কাছে। তখনও বাড়িতে দু'চারজন চাকর বাকর ছিল। এইসব কাজকর্ম তারাই করতো। কিছুকাল হলো বড়োবাড়ির চাকরের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুজন মাত্র। তার মধ্যে একজন ব্যস্ত থাকে গরুবাছুর সামাল দেওয়ার জন্য। অন্যজন সর্বক্ষণের নয়। পুজো পার্বনে এটা সেটা করে।

BanglaBook.org

একা একা নদীর ধারে যাবার মতো বয়স তখনো হয়নি। তাছাড়া সে যুগের গার্জেনরা ছোটদের চলাফেরা করার স্বাধীনতাও দিতেন খুব মেপে। তদুপরি, অবস্থা তখন যেমনই হোক, আসলে তো 'বড়ো বাড়ির পোলা'। তারা যেখানে সেখানে, যে বাড়ি সে বাড়ি যেতে পারে না। বড়োবাড়ির বড়োত্ব তখন যদিও একেবারে তলানিতে, মধ্যস্বত্ব যায় যায়। বাড়িতে হাঁড়ি চড়া দায়। কিন্তু বাইরের লোকেরা তার বিশেষ কিছু জানে না।

চলতে চলতে নদীর কিনারে পৌঁছেছিলাম ঠিক এবং কূলে দাঁড়িয়ে সেদিন যে বিস্ময় জেগেছিল, নদীকে যতবড়ো মনে হয়েছিল, সেই ছবিটা মনের থেকে কোনোদিন যায়নি। পরে যতবার তার পারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তার সৌন্দর্য বা বিশালতার কিছুমাত্র ইতরবিশেষ হয়নি।

একটা হোগলা ঝোপের মধ্য থেকে নলখরি লতা তুলছিলাম। হোগলের রেণুর সুবাস, নলখুরি সংগ্রহের উত্তেজনা, নদীর জলের কিনারে এসে আছড়ে পড়া, সব মিলিয়ে এমন বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম যে, বাড়িঘরের কথা, মা বাবার শাসনের ভয় কিছুই আর মাথার মধ্যে ছিল না। পার ছাড়িয়ে একটুখানি এগিয়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ একটা বড়ো ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে ইজের, জামা ভিজিয়ে দিল। একটা ভোঁ শব্দে চমকে তাকিয়ে দেখি নদীর মাঝ বরাবর থেকে একটা ইস্টিমার যাচ্ছে। ইস্টিমারে চড়ার একটা শৈশবস্মৃতি ছিল, তাই চিনতে পারলাম যে ওটা ইস্টিমার। আর ঠিক তক্ষুণি কে যেন আমাকে দুহাতে তুলে একটা ডিঙি নৌকোয় বসিয়ে দিল। চমক আর হঠাৎ ভীতিটা কাটার সঙ্গে সঙ্গেই চিনলাম সে ময়জদ্দি কাকা। ময়জদ্দি কাকা নৌকায় করে ফিরছিলেন।

তারপরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। প্রথমে ময়জদ্দি কাকার কানমলা এবং তিরস্কার। তারপর বাড়িতে যা হলো সেসব আজকের দিনে ঘটলে, শিশু নিগ্রহের জন্য থানা পুলিশ, মা বাপের হাতে দড়ি পড়ার সম্ভাবনা। এর মধ্যে যেটা মনে দাগ কেটে ব'সে গেছে, তাহলো ময়জদ্দি কাকার কানমলা দেওয়ার পর গোটা রাস্তা আফশোস, কখনো চোখের জল এবং নাগাড়ে উপদেশ। তাঁর সেই এক কথা, তুমি না বড়োবাড়ির পোলা? তোমার কী এইসব কাম করার কতা? তুমি একবার মুখ ফুড়্ইয়া কইলে, বিশ জোন কাম্‌লা, চাহর বাহর দৌড়াইয়া যাইয়া লইয়া আইবে হ্যানে ঐ'সব ছাই ছাতা। ইস্‌স্, কও ছেন দেহি, যদি গাঙে ভাসইয়া যাইতা? এমন আর করবা না।

BanglaBook.org

চোখের জলটা কীসের জন্য, সেটা সেদিন বুঝিনি, বুঝেছি অনেক পরে। সেটা বড়োবাড়ির তখনকার কথা, অর্থাৎ দৈন্য দারিদ্রের কথা চিন্তা করে সরল মানুষটির সরল অভিব্যক্তি। গোটা রাস্তা সেদিন বড়ো বাড়ির বড়ো সময়ের নানান গল্প বলতে বলতে আসছিলেন তিনি। কিন্তু সেসব গল্প এত শুনেছি যে সেদিকে আর কান ছিল না। মাথায় তখন বকুনি খাওয়ার ভয়। শুধু ময়জদ্দি কাকাকে মনে হয়েছিল সদ্য দেখা ঐ নদীর মতন। তখন বয়স কম হলেও দুঃখের আগুনে পুড়তে শুরু করেছি। সে দুঃখ বড়োবাড়ির অভাব অনটনের। বড়োদের হৃদয়হীনতার। সব চাইতে বেশি যেটা, তাহল একজন উঠতি কিশোরের নিঃসঙ্গতার বিষণ্ণতা।

ডানদিকের গ্রামটা যেটা এখন পেরোচ্ছি, তার নাম বোধহয় তারুলিই, পশ্চিম তারুলির দক্ষিণভাগ এটা। আনন্দকাঠিও হতে পারে। কাছাকাছি বাড়িঘর বিশেষ দেখছি না। নদীপার ধরে আগে অনেক বড়ো বড়ো গাছ দেখেছি। এখন প্রায় নেই। দূরে দূরে আছে। বোঝা যায় বোধহয় কোনো সময় কাছাকাছির গুলো কেটে ফেলা হয়েছে। এতক্ষণে একজন লোকের দেখা মিলল। একটা উঁচু ঢিবিমতো জায়গায় একটু ঝোপের ছায়ায় ঘাসের ওপর বসে আছে। সামনের মাঠে গরু বাছুর কিছু ইতস্তত চড়ছে। মনে হল, কাছের গ্রামেরই লোক গরু বাছুরগুলো চড়ানোর জন্যই বসে আছে। কাছে যেতে, জিজ্ঞাসু তাকিয়ে বলল, সালাম আলেকুম। আপনে কেডা?—প্রত্যভিবাদন করে বসলাম তার কাছে। ছায়া খুব একটা নেই, তথাপি নদীর দিক থেকে বয়ে আসা হাওয়া অনেকটাই পুষিয়ে দিচ্ছিল।

'আমি কেডা?' লোকটির এই প্রশ্নের জবাব না দিয়েই তার সঙ্গে অন্য কথা বলতে শুরু করলাম। ছোটবেলার ব্যাপার হলেও এক কথায় পরিচয় দেওয়া যেত হয়তো—'আমি বড়বাড়ির পোলা।' তারপর প্রশ্নোত্তর শুরু হত। 'বড়োবাড়ির কোন্ বাবুর পোলা?' 'এদিকে কোথায় আইছিলেন?' এইসব। এবং তৎসহ বিনীতভাবে সঙ্গে হয়তো বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে দিত। বাবা হয়তো জিজ্ঞেস করতেন, কেডা কদমের পোলায় নাকি? আছো তো ভালো?

কিন্তু এখন পরিচয় দিতে গেলে কী এ ঠিক ঠাহর পাবে? 'বড়ো বাড়ি' বলতে সে কী কিছু বুঝবে? বুঝতেও পারে। এর বয়সতো দেখছি আমারই কাছাকাছি। বড়ো বাড়ি এখান থেকে আধ মাইলটাক হবে। কী জানি, একসময়

BanglaBook.org

হয়তো একে চিনতামও। বললো, মোর বাড়ি এহান থিহা একটু দূর। এহানে গরুগুলারে খাওয়াইতে আই পেরায়ই। এ জাগাডা এহন সরকারি জমি কিনা, হে কারণ খালি পড়ইয়া আছে, চাষবাস অয়না, মেলা ঘাস।

—ক্যান্ চাষবাস অয়না ক্যান? সরকারি জমি মানে?

—আপনে জানেন না কিছু?

সুতরাং 'কেন জানি না' সেকথা বোঝাতে 'আমি কেডা' বলতে হলো। বললাম, আমি হিন্দুস্থান থিকা আইছি। এহন বাড়িডা একটু দেহনের লইগ্যা যাইতে আছি। খেওয়া পার অইয়া ভাবলাম এই রাস্তাডায় এট্টু হাডি। আসলে ছোডোকালে এই পথটায় হাটতেই মজা পাইতাম। নদীডার কথা মনে অইল।

—নামডা কী যেন?— লোকটি হঠাৎই খুব চঞ্চল হয়ে উঠল।

নাম বলতে চেঁচিয়ে উঠলো— মোরে চিনলি না? মুই দেলোয়ার, কদম আলি দফাদারের পোলা। গাদাকালে মোরা রোজ দুফইরডার বেলা চট্‌কি বাড়ির ছাড়াভিডার জঙ্গলে কতো নইরখোল খাইতাম মনে নাই?

বিগত পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ বছরে কি এভাবে আর পরিচয়ের স্মৃতি হাতড়েছি! না কেউ অবাক বিস্ময়ে বলে উঠেছে, তুই বড়োবাড়ির ননী? সত্যই? দেলোয়ার হঠাৎ চিৎকার করে তার ছেলে বা কাউকে ডাকতে শুরু করলো। আমি বুঝতে পারছিলাম না, এই নির্জন নদীপারে যেখানের আশপাশে কোনো বাড়িঘর দেখতে পাচ্ছি না, সেখানে এই ডাক কার কাছে, কীভাবে পৌঁছোবে। কিন্তু এভাবেই তো গ্রাম গাঁয়ে তখনকার দিনে একে অন্যকে ডাকতো। সে এ গ্রাম থেকে সে গ্রামে ডাক পৌঁছোতে হলেও। দরকার হতো একটু উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে, মুখের দুপাশে হাত আড়াল করে জোর আওয়াজ করা। কারুর বা তারও দরকার হতো না, গলার আওয়াজেই কাজ হতো।

জায়গাটা অসম্ভব ফাঁকা। দূরে গ্রামের প্রান্ত গাছগুলোর আড়ালে বাড়িঘর। আমরা দুজনে যেখানে এখন আছি, তার বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে মাঝে মাঝে মাটির ঢিবি। মনে হয় সরকারি তরফে কোনো বড়ো সড়ো কাজ হবে, তাই আশপাশের জমির মাটি কেটে ঢিবিগুলো হয়েছিল। আপাতত কাজ হচ্ছে না। কোনো কারণে বন্ধ আছে। ঢিবিগুলোর উপরে এবং আশেপাশে ঝোপঝাড়। কথায় কথায় জানলাম জমির মালিকেরা জমির ক্ষতিপূরণ ঠিকমতো পায়নি, তাই সরকারের সঙ্গে মামলা চলছে। দেলোয়ার বললো।

BanglaBook.org

—এহানে করবে কি?

—রাস্তা। ওপারের রাজাপুর অবদি কাম অইয়া গেছে। এহন নদীর উপার বিরিজ বানাইয়া এই তামাইত আনবে।

—রাস্তাডা বাইর অইয়া যাইবে কই?

—বরিশাল হইয়া ঢাকা তামাইত। এই হান দিয়া রাস্তা যাইয়া মেশফে ইছানীল, হ্যার পর বাসন্ডার খালের লোয়ার বিরিজ পার অইয়া ঝালকাডি-বরিশালের রাস্তাডা ধরবে।

—ওপারের কোন্ হান দিয়া ওড্বে বিরিজডা?

—ল' যাই, এটটু আউগ্ গাইলেই ওপারের খুডাডা দেহন যাইবে হ্যানে।

দেলোয়ার নদীর একেবারে কিনারে নিয়ে গিয়ে ওপারের একটা পিলার আমাকে দেখায়। জিজ্ঞেস করে, ইস্টিমার ঘাটটার কথা মনে আছে?

—ওইহানেই তো আছেলে। ইস্টিমার চলে এহন?

—না, এহন যেগুলা চলে হেয়ারে রকেট কয়। আসলে বড়ো দুইতলা, তিনতলা লঞ্চ। ঘাটটা এহন আর ওহানে নাই। আগে যেহানে রুহিনীগঞ্জের হাটটা আছেলে ঐ পূবের দিগে, হেইহানে তক্তা ফেলাইয়া লঞ্চের যাত্রী চরন্দারেগো ওডোন লামোন অয়।

—দিলু, মনে আছে এটটা মারাত্মক ঘড্নার কথা? দেহি তোর মনে আছে কীনা। অনেক ছোডকালের কথা।

—কি ঘডনা, এট্টু ধরাইয়া দিলে হয়তো মনে পড়বে। আসলে বয়স তো তিনকুড়ি পার অইলে আমাগো দুইজনেরই না, কীও এহন পোলারা বড়ো অইছে। চাষবাসের কাম হ্যারাই দেহে। মুই খালি গরুগুলা সামলাই। এইরহম জাগায় একলা একলা গরুগুলারে ছাড়ইয়া দিয়া মনে করি সব ছোডোকালের আচাইল কুচাইলের কতা। দুইজোনে আকাম তো কোম করি নাই।

—না, হেসব না। হেইযে তুই আর আমি সুবারি গাছের ডোঙায় করইয়া বাবারে ইস্টিমারে উডাইতে আইলাম।

দেলোয়ারের সেকথা মুহূর্তে মনে পড়ে গেল। কিন্তু সে গল্পে তক্ষুনি সে গেল না। যাকে হাঁক দিয়েছিল, সে ততক্ষণে ঢিবিটার কাছে এসে গেছে এবং অবাক হয়ে দেলোয়ারের সঙ্গে একজন অচেনা লোককে দেখছে। দিলু বললো, মোর ছোডো পোলা। চাইরডা পোলা। মাইয়া নাই। হাউস আছেলে, কিন্তু বিবি

BanglaBook.org

রাজি অইলে না। যাউক হেকতা। সাজইয়া আর ছোডোডা চাষবাস দ্যাহে। বড়ো দুইডার এট্টা খুলনা, আর এটটা ফরিদপুরে চাকরি করে। সরকারি চাকরি। বৌ পোলাপান লইয়া যে যার কামের জাগায় থাহে। সোমায় অসোমায় পয়সা-কড়িও পাডায়।

ছোট ছেলের বয়স বছর পনেরো ষোলো। ওকে দেখে, ঐ বয়সের দেলোয়ারের চেহারা মনে পড়লো, যা এখন তাকে দেখে আদৌ মনে হয় না, যে একই লোক। অসম্ভব ফরসা, একমাথা কোঁকড়া চুল, দাড়ি গোঁফ সবে উঠছে। অসামান্য বলিষ্ঠ গড়ন, যা ছোটবেলায় এ অঞ্চলের খুব কম মুসলমান ছেলেদের মধ্যেই দেখেছি। দেলোয়ার এই বয়সে এরকমই দেখতে ছিল। ওর বড়োভাই যাকে লতিফদা বলে ডাকতাম, তারও চেহারা খুব সুন্দর ছিল। ভালো ফুটবল খেলতো সে। কত খবর যে নেওয়ার আছে দিলুর কাছ থেকে আমার। কিন্তু ঐ সময়কার সবার খবর নেবার, বা যারা বেঁচে বর্তে আছে তাদের ভালমন্দ জানবার ইচ্ছের আকুলতা যত তীব্রই হোক, তার সময় কই। এসেছি বাড়িটা দেখতে একবারের জন্য। সাকুল্যে কয়েকঘণ্টা হয়তো সময় পাব। তাওতো এখনো পৌঁছাতেই পারলাম না। দিলুর সঙ্গেই না জানি আরো কতক্ষণ কাটাতে হবে। এখন বেলা নটা। যদি এক্ষুণি রওনা হই আবার, পৌঁছোতে কম করে সাড়ে নটা বাজবে। দুপুরে কোথায় আহার বিশ্রাম হবে তার ঠিক নেই।

ছোটবেলা, যতদিন বাড়িতে ছিলাম, কোনোদিন প্রশ্ন ওঠেনি মনে, বাড়িটাকে সবাই কেন বড়োবাড়ি বলতো। মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা, এখন যে অবস্থায় বাড়িটা আছে, তা দেখে খানিক আন্দাজ করা যাবে।

—'আববু, ইনি কেডা?'—ছেলে, যার নাম জানলাম হালিম বলে, তার বাপকে জিজ্ঞেস করে। দেলোয়ার একটু হেসে উত্তর দেয়, মোর ছোডো কালের দোস্তো। হিন্দুস্থানে থাকে। আগে এখানেই বাড়ি আছেলে।

—তয়, হিন্দুস্থান গ্যালে ক্যা? বাড়িডা গ্যালে কই?

দিলুকে বললাম, একথার জবাব পোলারে কি দেওন যাইবে? দিলু বললো—না, কারণ, তুই বা মুই এয়ার জবাব পুরা জানি নাতো। জানো, তুই যাওয়ার পর মুই একমাস চট্‌কি বাড়ি যাই নাই। তোর আববারে ইস্টিমারে চড়াইতে যাইয়া হেইযে দুইজোনে ঢেউয়ে টাল খাইয়া ডোবতে বইছিলাম, হেই যে মোগো বন্ধুস্থা পোক্ত অইছেলে, হেয়াতো আছেলে শ্যাষদিন পজ্জন্ত। তুই

BanglaBook.org

তহন জিগাইলি হেকতা মোর মনে আছে কিনা। হেকতা কেউ ভোলে? হেদিনই না মোগো বন্ধুস্থা খাড়ি অইলে।

হালিম বোধহয় তার আব্বুকে কখনো এমন ভাবালু দেখেনি। সে খুব আগ্রহী হয়ে, কিশোর সুলভ আবদারে ঘটনাটা শুনতে চাইলো। দিলু এবং আমরা দুজন আবার ঝোপের ছায়ায় সেই ঢিবিটার ঢালে বসলাম। দিলু খুব খুশি মনে ছেলেকে নিজের ছেলেবেলার গল্প বলতে লাগল। ব্যাপারটা রোমন্থন করতে আমারও ভাল লাগছিল। সে যে কতোকালের কথা, কী যে মাদকতা তার! অধুনাকার জনেরা হয়তো একে অতীত স্মৃতি রোমন্থনের বিলাস বলবেন, নস্টালজিয়া বলবেন, কিন্তু দিলুর ছোট ছেলের এই সরল প্রশ্নটি "হিন্দুস্থান গ্যালে ক্যা" এর সঙ্গে এই রোমন্থনের একটা যোগ আছে। যাহোক আগে গল্প বা ঘটনাটা দিলুর বর্ণনামতো বলি।

—"তখন মোগো দুই জনারই বয়স কতো, এই বছর এগারো বারো কী তেরো। ঐ হেবারইতো মোগো তারুলি ইস্কুলডা অইলে বোধহয়, নাকি কও?" আমি থামিয়ে বললাম, —না। তহন আমরা ইস্কুলে পড়ি না। বয়সও অতো না। হেসময় আমরা রোজ ঐ চট্‌কি বাড়ির বাগানে তিন চাইর জোন মিলইয়া দুরমা নাইরখোল পাড়ি আর খাই। বয়স আমাগো তহন দশ-এগারো। 'এড়ু' আর 'তপ্‌না'র তেরো চৌদ্দ অইবে। তপ্‌নাই খালি ইস্কুলে যায়। আমরা আল্লার ষাঁড়।

—" তো ঐ অইলে। সোনা কাকাবাবু যাইবেন কইলকাতা, মাইনে ওর বাবায়। ওর বড়ো ভাই-বুইনেরা, বুড়ি পিসি ঠারইন, ছোটঠারইন বেয়াকে আগেই দ্যাশ ছাড়াইয়া কইলকাতার হিন্দুস্থানে। হ্যারা যহন গ্যালে মোরা একছের গ্যাদা। কাণ্ডডা কী বোজলামই না। এ্যার আগে আগ গেরাম, পাশ-গেরামের অনেকেই, যেমন চটকিরা, বক্‌সিরা সব গেরাম ছাড়ইয়া গেছে।"

হালিম আবার জিজ্ঞেস করে, ক্যা বেয়াকে হিন্দুস্থান গ্যালে ক্যা?

তো সোনা কাকাবাবুরে মোরা ইস্টিমারে উডাইতে আইলাম এই হানে। ঐ যে নতুন বিরিজের খুডা পোতছে ওপারে, ঐহানে আছেলে ঘাট। সুবারি গাছের ডোঙায় ওরগো এক ব্যাডা চাহর, ও আর মুই হেনারে উডাইয়া দেতে আইছেলাম। তো তহন জোয়ার। মোগো বাড়ির সামনের বড়ো খাল ধরইয়া মোরা আইথে আছিলাম এই নদীর দিগে; ওপারে সোনাকাকাবাবুরে লামাইয়া মোরা ফিরইয়া আমু, ইস্টিমার ছাড়ইয়া গেলে, এই রহম মনস্থ।

BanglaBook.org

তহনতো আর খালডা এহনকার ল্যাহান কাদাপেরির ব্যাড়ের ল্যাহান আছেলে না। হেডা নিজেই তখন একটা ছোডো খাডো গাঙ। আর নদীরতো কথাই নাই। জোয়ারের পানি যহন ঢোকতে, দুই তিন জোন জুয়ান মদ্দও বইডা টান্‌ইয়া আউগ্‌গাইতে পারতে না। হে কারণ, যুদিও মুই আর হেই চাহর ব্যাডা আগায় হোগায় দুই জোনেই বৈডা টানলাম সাইদ্যের, তমোও দেরি অইয়া গ্যালে। তোর এই কাকায় নাওয়ের পানি হেচে। যহন খালের মুহে পোছলাম তহন দেহি ইস্টিমার লঙ্গর ফ্যালাইলে। সারেং ব্যাডার নজর না জানি ক্যামনে পড়ছেলে মোরগো দিগে, ইশারায় হে কইলে উল্ডা দিক্ দিয়া ওডথে। তো মোরাও হেইমতো সোনা কাকাবাবুরে দেলাম উডাইয়া। মোগো ভুল অইছেলে ফেরনের কালে। মোরা যুদি সোনা কাকাবাবুরে উডাইয়া দিয়াই এটটু জলদি মাজ গাঙ্গে যাই, সোমস্যা থাহে না। মোরা অপেক্ষা করলাম কহন ইস্টিমার ছাড়ইয়া যায় হেই তামাইত।

ইস্টিমার ছাড়ইয়া যাইতেই লাগলে ঢেউয়ের ধাক্কা, ওরে ছোবাহান্! এক ধাক্কায় মাজ গাঙ্গে, তো দুসরা ধাক্কায় নাও কাইত, মোরা তিনজোনেই গাঙ্গে। নাও কহনও কাইত, কহনও উব্বুত, ভাসইয়া যায়। কেডা তহন ছাতা নাওয়ের কথা ভাবে, তহনতো জান বাচান ফরজ।

তিন জোনেই হাতড়াইয়া ওপারে ওডলাম, কারণ ওপারডাই আছেলে সন্নিকট। নাও হান দেহি ভাসইয়া যায়। চাহর ব্যাডা কইলে, নাও হান তো ধরণ লাগে। মুই কই, ধরন লাগে তো ধর। ভাসইয়া গেলে তো ফেরনডাই অইবে না। ওপারে যামু ক্যামনে? হে কইলে, মোর ড্যানায় তাকদ নাই। মোর উড্‌ইয়া গ্যালে রাগ। এক লাফ দিয়া পানিতে পড়ইয়া হাতরাইয়া নাও হান্ টানতে টানতে কুলে লইয়া আইলাম। চাহরডারে কইলাম, হালার পো হালা, নাওতো আনছি, এখন বৈডা পাবি কই? বৈডা তো গাছে তলাইয়া, নাওহান আছেলে গুয়া গাছের, হে কারণ ডোবে নায়। এহন বৈডা ছাড়া নাও লইয়া যাই কী করইয়া? ওঃ তোর কি মনে আছে। মোরা তিনজনে হাত বৈডা বাইয়া বাইয়া নদী পার অইয়া খালে ঢোকলাম। হেহানে আছেলে এক মাঝি, কেরায়ার। কইলাম, এই অবস্থা, মুই এই হামনের দফাদার বাড়ির পোলা, কদম আলি দফাদারে মোর বাপ। তোমার একখান বৈডা ধার দেও, এ্যারগো বড়োবাড়ির ঘাডে পৌঁছাইয়া তোমারে ফেরৎ দিয়া যামু। তো মাঝি কয়, তুমি তোমাগো ঘাডে লামইয়া

BanglaBook.org

যাও। মুই এ্যারগো পৌঁছাইয়া দি। মুই ঐ দিকেই যামু। হ্যারপর চাহর ব্যাডা মাজির নাও হানের হোগা ধরইয়া বইলে। মোগো ঘাডে পোছার পর ও আর চাহর ব্যাডা গ্যালে নাওয়ে উড়্ইয়া মুই ডোঙ্গা ঘাডে বানধইয়া বাড়ি। ডোঙাহান মোগোই আছেলে। তো বোঝ মোগো বন্ধুস্থা ক্যামন পোক্ত।"

হালিম আবার প্রশ্ন করল, তয় হ্যারা হিন্দুস্তান গ্যালে ক্যা?

দেলোয়ার বলে, আল্লার কুদ্‌রতে এ্যাদ্দিন পর যহন তোরে পাইছি, তহন হাউস মিডাইয়া গপ্পো করুম। আগে মোর বাড়ি যাওন লাগবে। ওঠছো কোন্ হানে?

—আবদুল হাইর বাসায়, ঝালোকাডিথে। হেতো এহন ব্যাংকে চাকরি করে। কইয়া আইছি, দুপরের মধ্যে ফিরইয়া হ্যার ওহানে খামু।

—না, ছোডো মেঞারে পাডাইয়া খবর দিমু হ্যানে তুই আইজ ফিরবিই না। এহন বাজে নয়ডা সাড়ে নয়ডা মতোন। দুফইরে খাওয়া লওয়া সারইয়া যামু বড়ো বাড়ি। ফেরতে ফেরতে আন্দার, গেরামডায় তো ঘুরবি এ্যাট্টু না কী?

—হেয়াতো ঘোরতেই অয়। আছে কেডা গেরামে? কয় ঘর?

—তোগো গেরামে সাত আটঘর আছে মোন লয়। আরতো বেয়াক বাড়ি এহন চওয়া (চষা) কোলা, ধানখ্যাত্।

—চটকি বাড়ির জঙ্গলডা, আর নাইরখোল বাগানডা আছে?

—না, তোর জেডায় যে অংশ খাইতে, হেয়া অনেক ক্যাচালের পর মোরা কিনইয়া নিছি। এহন পুরাডাই ধানখ্যাত। এহন আর দেখলে কিছু চেনথেই পারবি না।

—হাইর বাসায় না গেলে, হে তো রাগ অইবে হ্যানে সাইদ্যের।

—না, হ্যারে খবর দিমু হ্যানে, আইজ গেরামের বাড়িথে আউক হে বৌরে লইয়া। অর বৌডা এহনো দ্যাখথে হোনতে বেশ পোক্ত।

হাই এর বাড়ি এই গ্রামেই। এখানে ইস্কুলেই ক্লাশ এইট পর্যন্ত আমরা পড়েছি। পরে আমি অন্য ইস্কুলে চলে গিয়েছিলাম। দেলোয়ার ইস্কুলের গণ্ডি পেরোতে পারেনি। হাই গ্র্যাজুয়েশন করে একটা ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়ে গ্রাম ছেড়ে ছিল। কাল রাতে অনেক খবরই ওর কাছে পেয়েছি। গ্রামের বাড়িটা এখনো আছে। ছোট ভাই দেখাশোনা করে। ছুটি ছাটায় বউ ছেলে মেয়েদের নিয়ে বাড়ি আসে কখনো সখনো। গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগটা আছে। ওর চাচা, আমাদের ছোটবেলার ভাড়ুচাচা গ্রামের বাড়িতে আছেন।

BanglaBook.org

এ অঞ্চলে এই তারুলি গ্রামটা মস্তো বড়ো গ্রাম। কিন্তু ছোটবেলা এ গ্রামে একঘরও ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ দেখিনি। তথাপি, দেলোয়ারের কথায় জানলাম যে, শিক্ষিত, চাকরিওলা কেউই বিশেষত গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না বলে, এ গ্রামটাও নাকি 'হিন্দু গেরামগুলার ল্যাহানই লক্ষ্মীছাড়া। কিন্তু মুসলমান প্রধান গ্রাম হিসাবে বড়ো খালটার এপার ওপারে তারুলি এবং নৈকাঠি চাষি গেরস্থদের গ্রামই ছিল। দু-একটি পরিবারই যা ছিল কিছু বড়ো গোছের চাষি পরিবার, যারা স্বঘোষিত তালুকদার। সেইসব বাড়ির ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে, চাকরি বাকরি নিয়ে সব শহরবাসী হয়েছে পরবর্তীকালে। এখনতো প্রায় সবাই শহরমুখী। তার কারণ অবশ্য ভিন্ন। কালের ধর্মে সবই পরিবর্তনের গতি ধরে। আমি যখন গ্রাম ছাড়ি, তখনি দেখেছি, যারাই একটু অবস্থাপন্ন, পড়াশোনার সুযোগ পেয়ে ইসকুল ডিঙিয়ে কলেজে দু-এক বছর পড়েছে, তারা মোটামুটি একটা চাকরি সহজেই পেয়ে যেত। গোটা পঞ্চাশের দশক জুড়ে ব্যাপক হিন্দুরা দেশ ছাড়লে, একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং, মেট্রিক, আই. এ. বা বি.এ টা কোনোরকমে পাশ করতে পারলেই মুসলমান ছেলেদের চাকরি জোগাড় হয়ে যেত। তবে এরকম শিক্ষিতদের সংখ্যাও ছিল খুবই কম। তাই যারা অল্প শিক্ষিত এবং চাকরি বাকরির সুযোগ পায়নি, তারা গ্রামেই থাকতো। তাই গ্রামকে ভরাভর্তি, কর্মচঞ্চল মনে হতো তখন। সে অনেক কথা। সংক্ষেপে শুধু বলি যে অতিদ্রুত নগরায়ণ গ্রামকে আস্তে আস্তে যেন নির্জীব করে ফেলেছে। চাকরি প্রসবী শিক্ষায় গ্রামগুলো নষ্ট হলো।

দিলু ছেলেকে বললো, ছোডো মেঞা, আপনে গরু গুলারে এট্টু 'ঘাসাল' জাগা দেইখ্যা খুডা আটকাইয়া রাহেন, য্যান দুফইর তামাইত খাওনের দিক্‌কত্ না অয়। হ্যাষে বাড়ি যাইয়া আম্মুজানরে কয়েন যে বাড়িথে মেহমান আছে আইজ। মস্তো মেহমান। হিন্দুর পোলা, এট্টু শুকতানি, মুসুরির ডাইল, কচুর হাগ আর এ্যাট্‌টা বড়ো দেইখ্যা রাওয়া জবাই করইয়া দিয়েন, জুইত করইয়া য্যান একখান ছালুন পাহায়।

—কেডা আইছেন কমু, যদি জিগায়?

—কইবেন যে মোর একছের ছোডো কালইয়া ল্যাংডাকালের দোস্তো, বড়ো বাড়ির পোলা। পাক য্যান্ ভালো অয়। আর হোনেন একবার, কাম সারইয়া এট্টু ঝালোকাডি হাই চাচার বাসায় যাইয়া কইবেন যে মোর আব্বুজানে কাকারে

BanglaBook.org

আটকাইয়া ফালাইছে। আইজতো ছাড়বেই না, কবে ছাড়বে আল্লায় জানে। হ্যারা য্যান্ মেয়া-বিবি সয়ন্দ্যার মইদ্যেই এহানে আইয়া পোছেন, নাইলে অবস্তা খারাপ করইয়া দিমু।

—জে। তয় মুই আউগ্‌গাই?

—আউগ্‌গায়েন। (দেলোয়ার ছেলেকে কখনো 'তুই' কখনো 'আপনি' সম্বোধন করে।) তয় হোনেন, আম্মুজানরে কইবেন যে 'বাপ' হালার পো হালার ট্যাক খালি। হেনার কাফুরের ভাজটাজের মইদ্যে যে নোট ফোট থাহে হেহান দিয়া যুদি গোডা তিনেক শইত্‌কা নোটের ব্যবস্থা করেন ভালো অয়। কইবেন, এয়া ধার।

—মোর ধারে পাশশো আছে।

—পাইলি কই? এই হালার পো হালা, তুই ট্যাহা পাইলি কই? চাইর আঙ্গুল পোলা পকোডে পাশশো ট্যাহার নোট? এয়াকি ইয়ারকি?

ছোট ছেলে খুবই শান্ত স্বভাবের। বাপের বেমক্কা গালমন্দ এবং ধমক খেয়েও রাগে না। শুধু বলে, আপনে খালি খালি মোরে কাকার সামনায় 'খাম্‌ড়াইতে আছেন। পরশুদিন না নানাজানে আইছেলেন? হেনায়ই তো দেলেন।

—ক্যা? খমাহা পাশ্‌শো ট্যাহা দেওয়ার কারণ?

—দেবে না ক্যা? মুই না টেস্ট পরীক্ষায় ফার্স্ট অইছি? ফাইনালে ফার্স্ট ডিভিসন পাইলে হাজার টাহা দেবেন, কইছেন।

—তয়তো আপনারে হালার পো হালা কওনডা মোর তিরুডি অইয়া গ্যালে। মুই ভাবলাম, আপনে আবার ঝালকাড়িরে ছামড়াগো ল্যাহান জুয়া টুয়া খেলা ধরছেন নাহি। নেন্। বদলা হিসাবে আবার না অয় মোরেও এট্‌টা খামার দেন।

—না, মুই হেরহম দিনা। যাউক টাহা দিয়া কী আনথে অইবে কয়েন। ইলশা মাছ?

—আপনের হাচাইও বুদ্ধি আছে। বড়ো বাড়ির পোলায় দ্যাশে আইছে, হ্যার উপার মোর ল্যাংডা বয়সের দোস্তো, এটটু ইলশা মাছও খাওয়ামু না? কই বোলে মরিতো নায় এহনো।

—তয় যাই।

BanglaBook.org

—আয়েন যাইয়া বাপ। আম্মুরে কইবেন, মোরা এটটু গেরাম গতিক দেইখ্যা আইতে আছি, কিছু নাশ্‌তা পাতির ব্যবস্থা হরে য্যান্‌.

—'আয়চ্ছা।'—বলে আদাব জানিয়ে ছেলেটি প্রথমে গরুগুলিকে একে একে এনে উপযুক্ত জায়গায় বেঁধে রাখলো। দেলোয়ার যথারীতি তাকে একের পর এক ফরমায়েস করতে থাকলো এবং 'বাধ্য বালক' জী হাঁ, জী না বলে উত্তর দিতে দিতে তার কাজ একসময় শেষ করে, আরেকবার আদাব জানিয়ে বাড়ির পথ ধরলো।

ছেলেটিকে আমার দারুণ লাগলো। দেলোয়ারের কাছে জানলাম ও নাকি এবার ইসকুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। টেস্টে যে সে ফার্স্ট হয়েছে তাতো তার কথায়ই জেনেছি। নিশ্চয়ই ভাল ছাত্রই হবে। প্রশংসা করতে দেলোয়ার বললো, হ, বাপের ল্যাহান না। বাপের তো ইস্কুলে যাওয়া হারাম আছিলো, খালি আগান বাগানে আকাম করইয়া বেড়াইয়া ইস্কুলের দিনগুলা কাডাইয়া দেলাম। যাউক, পোলারা যে মানুষ অইছে, হেইডা এ্যাট্‌টা মস্তো ব্যাপার। তয় হেয়ার বেয়াকটুক ক্যারামতি মোর বৌর। যাউক হেসব কতা, এহন ল। দুই চাইর জোন পুরান ধুরান য্যারা এহনও আছে, হ্যারগো লগে এটুকু দ্যাহা সাক্ষাৎ করইয়া আই।

এসেছিলাম এক উদ্দেশ্য নিয়ে, বাড়িটা একবার দেখব। ঘণ্টা দুয়েক থেকে গঞ্জের শহরের হাইএর বাসায় চলে যাব। ব্যাপারটা যে এরকম হবে, তা আদৌ ভাবিনি। মাথায় দেলোয়ারের স্মৃতি ছিলই না। সেই কোন্‌ শৈশবকালের থেকে যৌবনের শুরু অবদি কখনো একটানা, কখনো মাঝে মাঝে দিন কাটিয়েছি তার সঙ্গে। আজ প্রায় অর্ধশতক পর সেসব স্মৃতি মনে থাকার কথা নয়। এমনতো আরো কতো আছে, যাদের কারুর কথা দেলোয়ার বলছে বলে মনে করতে পারছি কতক, কতক স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। কিছুতেই আর মনে আনতে পারছি না তাদের নাম। কিন্তু সেতো গেল একদার পরিচিত বাল্য সঙ্গীদের কথা। নিত্য নতুন অবস্থায় পথ চলতে চলতে স্থান বদল হয়েছে, সঙ্গী বদল হয়েছে, সুতরাং পুরোনোরা স্মৃতি থেকে কেউ মুছে গিয়েছে, কেউ রয়ে গেছে। কিন্তু যা মনে রয়ে গেছে, তা এই গ্রামে এখন যেমন দেখছি, দারিদ্রপীড়িত অবস্থা। তখন এই অবস্থার চাইতে উন্নত মানের কোনো অবস্থার বিষয়ে কোনো ধারণা ছিল না বলে, এটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে। তখন এখানে দুচারটে বাড়ি দেখেছি, যারা মোটামুটি সম্পন্ন গৃহস্থ, বাকি সবাই ভাঙা, আধভাঙা টিনের

BanglaBook.org

ঘর, দুচারটা হাঁস মুরগি, গোটাকয় সুপুরি গাছ, পাঁঠা, ছাগল, গরু, এক ঝাড় বাঁশ, এইসব নিয়েই কায়ক্লেশে দিন কাটাত। এতদিন পরে এসেও তার কোনো বিশেষ পরিবর্তন দেখছি না, বরং আরো যেন খারাপ হয়েছে। এইরকম একটা পরিমণ্ডলে আমাদের বাড়িটা যে তাদের কাছে একটা রাজকীয় মর্যাদা বা সম্ভ্রম পাবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেসব দিনে তা বুঝিনি। তবে বাড়িটা যতো বড়োই তখন দেখাক না কেন এবং এইসব ভাঙা ঘর নিবাসীরা যতোই বিস্ময়ে বাইরের থেকে একে দেখুক না কেন, অভ্যন্তরস্থ ক্ষুন্নিবারণের আয়োজন উভয় ক্ষেত্রেই একসময় সমতুল্যই ছিল। তার কারণ ছিল দেশব্যাপি চরম অবব্যস্থা।

মনে আছে একবার আমার এক শুভানুধ্যায়ী গুরুমশায়ের সঙ্গে এখানকার নতুন সবে প্রতিষ্ঠিত ইস্কুলে ভর্তি হবার আকাঙ্ক্ষায়, সেখানে যাবার পথে দিলুদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেইই প্রথম ওদের বাড়িতে আসা। ওর বাবাকে চিনতাম। আমাদের কদমালি চাচা। চাচা আমাদের বাড়িতে একসময় দুধ দিতেন রোজে। বুড়ি পিসিমা তাঁকে প্রত্যেকদিনই বলতেন, তুমি বাপু দুধে বড় জল মিশাও। লম্বা জিভ কেটে চাচা বলতেন, পানি? দুদে? এয়া আপনে কয়েন কী পিসি ঠারইন? মুই মোছলমানের পোলা। মুই দুদে পানি মিশামু?

এর উত্তরে বুড়ি পিসিমা তাকে এবং মুসলমান সমাজের চোদ্দগুষ্টিকে যা বলতেন, তাকে আর যাই বলা যাক সাম্প্রদায়িক সৌভ্রাতৃত্বের নিদর্শন বলা যায় না। কদমালি চাচা শুধু বলতেন, কি যে কয়েন পিসি ঠারইন, কি যে কয়েন— এই স্মৃতি আমার অত্যন্ত শিশু বয়সের, কিন্তু কোনোদিনই ভুলিনি। না ভোলার কারণ, কদমালি চাচা আমাকে খুবই ভালবাসতেন। আশ্চর্য, বুড়ি পিসিমা বাড়ি ছাড়ার সময় কদম চাচা বড্ডো কেঁদেছিলেন।

তো সেদিন ইস্কুলে ভর্তি হতে যাওয়ার পথে দিলুদের বাড়ি গিয়েছিলাম। দিলু বাড়ি ছিল না। আমাকে মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দেখে কদমালি চাচার সে কি উল্লাস! বাড়ির সবাইকে ডেকে তিনি আমাকে দেখাচ্ছিলেন। আমি তাঁর বাড়িতে গিয়েছি সে যে তাঁর কতোবড়ো সম্মান, কতো বড়ো বাড়ির ছেলে আমি! এইসব কথা বার বার বলছিলেন কদমালি চাচা, আর অমাকে কী খাওয়াবেন, কোথায় বসাবেন, সে এক বিশাল হৈ চৈ কাণ্ড শুরু করেছিলেন তিনি। আমি কী সঙ্কুচিত যে হচ্ছিলাম, তা আর বলার মতো নয়। যদিও বুড়ি পিসিমার দুর্ব্যবহার গুলো অনেক আগের কথা। তবু তখন সেইসব

BanglaBook.org

মনে পড়ে আমার ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছিল নিজেকে। কিন্তু আমি বড়োবাড়ির অমুক বাবুর পোলা, এসব সামান্য ব্যাপার আমাকে কেন বিদ্ধ করবে? কিন্তু বিদ্ধ করছিল। কারণ কদমালি চাচার স্ত্রী, যাকে আমি চাচি ডাকতাম, তিনি একটা কলাই করা প্লেটে আমাকে চার-জোড়া চিনির সন্দেশ দিয়ে বলেছিলেন। খাও বাজান, খাও। এইসব ছাইছাতা কি তোমাগো দেওন যায়?—কদমালি চাচা বলছিলেন, ভাল কিছু খাওয়ামু এমন নসিব করইয়াতো জন্মাই নাই। কতোবড়ো বাড়ির পোলা তুমি, কতো বড়ো পরিবার তোমাগো, তোমরা কি এইসব খাইতে পারো। তমো এটটু মুহে দেও বাজান। হাচা কই, মোর পেরানডা হেলে এট্টু ঠাণ্ডা অইবে। মোগো কত্তো বড়ো নসিব যে তুমি মোর এই ভাঙ্গা বাড়িতে আইয়া বইছো। আল্লায় তোমার ভাল করবে।

ঐ বয়সেও আমি অনুভব করেছিলাম যে, কদম চাচার ঐ বিনয়ী আচরণ আমার প্রাপ্য ছিল না। কারণ যে বড়োবাড়ির প্রতি সম্ভ্রমবশত তিনি আমাকে সমীহের আসনখানা দিয়েছিলেন, সেই বড়োবাড়ি আর কোনো অর্থেই বড়োবাড়ি তখন ছিল না। দারিদ্র তাদের সদ্‌গুণগুলো নষ্ট করে দিয়েছিল। আর সদাচার বলতে কিছুই কী তাদের ছিল?

চলতে চলতে এইসব কথা মনে পড়ছিল। আসলে কদম চাচাতো কোনোদিন বড়োবাড়ির অন্দরমহলে ঢোকেননি, তাই বড়ো বাড়ির বড়োত্ব বিষয়ে তাঁর শৈশবকাল থেকে শোনা কিংবদন্তির গল্প এবং বড়োলোক সম্পর্কে গরিব মানুষদের কল্পনা দিয়ে এর বড়োত্বের মাপটা তৈরি করে নিয়েছিলেন। তাঁর মতোই অন্যান্য আশপাশ সাধারণ জনেদেরও ধারণা ছিল, মরা হাতিও লক্ষ টাকা। চাচার ধারণাও ছিল না যে ঐ সময়টায় যদি তাঁর দেওয়া চারজোড়া চিনির চাব্‌ড়া, যাকে ঐ অঞ্চলে সন্দেশ বলা হোত, সেগুলো না দিয়ে তার দামটা ধরে দিতেন, বড়োবাড়ির আমাদের অংশের সেদিন অন্তত চালের ব্যবস্থা হতো। কিন্তু কদমালি চাচা তা কী জানতেন? জানবেন কী করে? তিনি বড়োবাড়ির বিষয় বৈভবের প্রাচুর্য দেখেছেন, অহংকারী দানধ্যান, দীয়তাং ভূজ্যতাং, সাধারণের বিনোদনের জন্য বিশেষ বিশেষ সময়ে যাত্রা, থিয়েটার, জারি সারির গান, পুতুল নাচ, লাঠিখেলা, ছোরা খেলার অনুষ্ঠান ইত্যাদির দিনগুলো দেখেছেন। তখন দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠানের সময় এইসব হত। কর্তারা অনেককাল আগে থেকেই এর প্রচলন করেছিলেন। কারণ, দুর্গাপুজোটা হিন্দুদের সার্বজনীন উৎসব হলেও,

BanglaBook.org

সেই সর্বজনে মুসলমান সমাজের সর্বজন অংশগ্রহণ করতে পারতো না। সুতরাং তাদের আনন্দের কথাটা চিন্তায় থাকতো কর্তাদের এটা একটা সদ্‌চিন্তা অবশ্য। কদমালি চাচা বলতেন, এই বিবেচনা না থাকলে বড়োবাড়ির কত্তা কিসের? খালি বিষয় সম্পত্তি, জমিদারি তালুক মুলুক থাকলেই অয়? দিল্ থাহন দরকার। বড়ো দিল্। বড়োবাড়িতো কই হেইয়ার লইগ্যা। বড়ো বাড়্ইয়াগো বেয়াক কিছুই বড়ো।

সেসব রইসি ব্যাপার না দেখলেও, একেবারে পড়ন্ত বেলায়ও এইসব অনুষ্ঠানের সামান্য ছিঁটেফোঁটা আমি দেখেছি। কিন্তু দুর্দিন খুব দ্রুত এগিয়ে এসেছিল। পঞ্চাশ/একান্নর দাঙ্গা শেষ হতে না হতে তালুকদারি, জমিদারি এবং মধ্যস্বত্ব প্রথা সরকার বাজেয়াপ্ত করলে, বড়োবাড়ির বাহ্যিক বড়োত্ব অবলুপ্ত হয়। কিন্তু অন্দরের অন্তঃসারশূণ্যতা প্রতিবেশীদের বিশ্বাসে আসতে সময় লাগে প্রচুর।

কদমালি চাচার বাড়ি যাওয়ার পর থেকে তিনি আমার বিষয়ে বেশ মনোযোগী হয়ে পড়েছিলেন। আমি যে বড়োবাড়ির ছেলে হয়েও দিলুর মতো এক হতদরিদ্র হালিয়া-চাষার ছেলের বন্ধু, এটা চাচার কাছে অসাধারণ গৌরবের ব্যাপার ছিল। রাস্তাঘাটে দেখা হলে, তাঁর প্রথম জিজ্ঞাসাই থাকতো কী খাওয়া দাওয়া হলো, বাজার থেকে ফিরতে দেখলে জানতে চাইতেন আমি বাজারে কেন গেছি, চাকরেরা কেউ যায়নি কেন, এইসব। তখন আমি চাচার গ্রামের ইস্কুলের ছাত্র। আমার পোষাক আসাক, খাওয়া দাওয়ার খবরাখবর দেখে শুনে তাঁর বোধহয় আমাদের তৎকালীন দুঃস্থ অবস্থার বিষয়ে কিছু আন্দাজ হয়ে থাকবে। ঐ সময়টায় তিনি আর আমাদের বাড়িতে দুধ দিতেন না। বাড়ির বেশিরভাগ লোক তখন হিন্দুস্থানবাসী।

একদিন দুপুরে, সেদিন ইস্কুল ছুটি ছিল, ছোট ভাইবোনদের নিয়ে দিঘির পারের নারকোল গাছ থেকে ডাব পাড়ছিলাম। কারণ, সেদিন বাড়িতে অন্নসংস্থান ছিল না। এরকম তখন প্রায়ই হতো। সেদিন কদমালি চাচার কাছে ধরা পড়ে গেলাম যে, সখ করে নয়, নিতান্ত পেটের জ্বালায়ই আমাকে গাছে উঠে ডাব পাড়তে হচ্ছে। চাচা বোধহয় শুকনো কাঠকুটো সংগ্রহ, কী বেত বা ঐ জাতীয় কিছু জোগাড় করতে পাশের জঙ্গলে ছিলেন। ডাব পাড়ার শব্দে তিনি বেরিয়ে এলেন দেখতে, কোনো চোর ছ্যাঁচোড় বা পাড়ার বদমাশ ছেলেপুলেরা কেউ ডাব চুরি করছে কিনা। ছোটদের ওখানে দেখে, বোধহয় ভেবেছিলেন যে

BanglaBook.org

বাড়ির কোনো চাকরবাকর কেউ তাদের ডাব খাওয়াবার জন্য ওখানে বসিয়ে রেখে, গাছে উঠেছে। বস্তুত, সেই সময়ে বাড়িতে সেরকম চাকর বলতে কেউই ছিল না। আমি এবং অমার পরের ভাইটাই গাছেটাছে উঠে এটা ওটা সংগ্রহ করতাম। গাছের দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখে তিনি প্রায় আর্তনাদ করে উঠে আমাকে নামতে বললেন। আমি নামতে কদমালি চাচা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাগো আইজ কাইল নিজেগোই গাছে উড়্ইয়া ডাব পাড়তে অয়? হায় আল্লা, হায় মাবুদ।—বাধ্য হয়েই তখন আমাদের অবস্থার কথা তাঁকে বলতে হলো। বাইরের কাউকে নিজেদের এই দৈন্যের কথা যে বলতে হয় না, সেরকম বুদ্ধি বা বয়সও আমাদের হয়নি। চাচা সব শুনে আরো বেশ খানিকক্ষণ কাঁদলেন। শেষে বললেন, তোমরা এই হানে বইয়া ডাব খাও। মুই আইতাছি। না আওন পজ্জন্ত যাও বোচোন? মুই এই গেলাম আর আইলাম বুল্ইয়া।

চাচার এই বাড়ি আমাদের বড়ো-বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে প্রায় বিশ মিনিটের পথ। তিনি আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এলেন। বোঝা গেল, তিনি প্রায় দৌড়ে গেছেন, আর এসেছেন। হাতে একটা থলে, তাতে সের পাঁচেক চাল। সেটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, বাজান, এই থল্ইয়ডা নিয়া সোনা বৌঠারইনরে দিয়া কবা, কদমালি চাচায় দিছে। হেনায় য্যান্ মোর বেয়াদপি মাফ করেন। মুই পেরজা হিসাবে দেলাম। বলে চাচা কাঁদতে কাঁদতে খানিক দূর ছুটে গিয়ে, আবার ফিরে এসে বললেন, তোমরা কৈলোম পিছাড়ার দিক দিয়া যাবা। বাবুরা য্যান দ্যাখথে না পায়েন। মজার কথা এই কদমালি চাচা কোনোকালেই আমাদের প্রজা ছিলেন না।

কদমালি চাচার সেই কান্না আমি কোনোদিন ভুলিনি। আজ দিলু আর আমি জীবনের পথ প্রায় শেষ করে এনেছি। কদমালি চাচা আর নেই। চাচি নাকি আছেন। দিলু বললো, বুড়ি এহনো বেশ টর্‌টর্‌ইয়া। তোরে বোধহয় চেনথে অসোবিদা অইবে না। বরং ভাইজানে (লতিফদা) হ্যারথিহা বেব্‌ভুলা বেশি। মায়ের বয়স অষ্টআশি, ভাইজানের বাহাত্তের।

BanglaBook.org

।। দুই ।।

হালিম আগেই বাড়িতে খবর পৌঁছে দিয়েছিল। আমরা এদিক সেদিক ঘুরপাক খেয়ে, দুচারজন বয়স্ক পরিচিত, আধা পরিচিত, লোকের সঙ্গে দেখা এবং বার্তালাপ করে যখন দেলোয়াদের বাড়িতে এলাম তখন বেলা প্রায় এগারোটা। বাড়িতে ঢোকার আগে দিলু বললো, আইছ যহন, আব্বাজানের কব্বরে এক মুইট মাডি দিয়া যা। তোরে তো হেনায় খুব ভালো পাইতেন। কবরস্থানে ঢুকে দিলুকে বললাম, এহানে তো ফুল বা ধুপ-আগরবাতির ব্যবস্থা নাই। খালি মাডিই দিমু? দিলু বলল, তয় ল'যাই এটু আউগগাইয়া মসজিদে যাই। খাদেমের ধারে হয়তো পামু। কিন্তু ফুল পাওন যাইবে না। আগরবাতি থাকতে পারে।

সত্যিই ফুল পাওয়া গেল না। আমাদের এই অঞ্চলে মুসলমান বাড়িতে ফুলবাগান আদৌ দেখা যায় না, যদিও সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানেরা খুবই ফুলের অনুরক্ত। আগরবাতি পাওয়া গেল। আমার মন চাইছিল কবরে কিছু ফুল বিছিয়ে দিই। এর আনুষ্ঠানিকতার উপর যে আমার খুব দুর্বলতা বা বিশ্বাস ভক্তি আছে এমন নয়। শুধু মানুষটার স্মৃতি এই মুহূর্তে আমার কাছে খুব উজ্জ্বল হওয়ায় আমার এরকম ইচ্ছে হয়েছিল। রাস্তার পাশে শটিবনের ঝোপের মধ্য থেকে বেশ কয়েকটা শটিফুলের আভাস পেলাম। দিলুকে বললাম, শডি ফুল দিলে দোষ আছে?

—দোষ? ওয়াতো তোগো থাহে। তোগো পূজায় এফুল না ও ফুল এইসব নছল্লা আছে ছোডোকালে দেখছি। ফুল এটটা সুন্দর জিনিস। হেয়ার আবার এডার দোষ, ওডায় গুণ কি?—দিলু ঠিক ছোটবেলা আমরা যেমন সোজা সরলভাবে দুই সম্প্রদায়ের দোষ গুণ নিয়ে কথা বলতাম, সেইভাবেই কথাটা বললো দেখে প্রাণে আরাম পেলাম। ভাবলাম, আমাদের মধ্যে এখনো কিছু সহজতা আছে, সব নষ্ট হয়ে যায়নি। যেমন কাল রাতে হাইয়ের বাসায়, তাদের অবাক করে দিয়ে যখন হাজির হয়েছিলাম, ওকে হা করে তাকিয়ে থাকতে দেখে আমি বলে উঠেছিলাম, কিরে হালার যবন, চেনথে পারলি, না পারলি না 'ক'। না যদি পারইয়া থাহ, মুই অন্য কোনো মেঞার আথালে হান্দি। আল্লার কুদরতে মোর শ্যাক্ দোস্তো কোম নাই।—আমাদের এই যবন মালাউন সম্বোধন

BanglaBook.org

ছোটবেলা থেকেই চালু হয়েছিল একসময়। তথাপি ভিন্নতা ছিল। তবে সে ভিন্নতায় আমাদের মধ্যে কোনো নীচতা আশ্রয় করেনি। কিন্তু আমাদের আগের প্রজন্মের একটা বড়ো অংশের মধ্যে সেই নীচতা কার্যকরী ছিল। আর তার কিছুটাতো আমাদের মধ্যে ছিল। তবে আমরা ব্যাপারটা ঠাট্টার মধ্যেই এনে ফেলেছিলাম।

কদমালি চাচার কবরে শটিফুল গুলো বিছিয়ে দিয়ে ধূপ-কাঠি জ্বেলে মনে মনে তাঁর সেই পাঁচ সের চাল আর কান্নার ঋণের কথা স্মরণ করলাম। এর আগে দুমুঠো মাটি বিছিয়ে দিয়েছিলাম। দিলু কিছু নিয়মের কথা বলছিল, আমি বললাম, আমার নিয়মের দরকার নাই। আমার দেল্ যা চাইল, হেইডাই করলাম। চল্লিশ কদমের কথা আমি জানি, মুসলমানেরা কবর দেয়ার পর চল্লিশ কদম গিয়ে একবার পিছনে তাকান, এরকম নিয়ম।

কদমালি চাচা আমাদের গ্রামের চট্‌কি বাড়ির অংশবিশেষ ভোগ দখল করার অধিকার চট্‌কিদের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। বাকি অংশ ছিল আমার জেঠামশায়ের অধিকারে। জেঠামশাই বড়োবাড়ির বড়োবাবু। কদমালি চাচা তাঁর সঙ্গে স্পর্ধা করে চটকি বাড়ির বাগান বা জমি ভোগ করবেন এটা জেঠামশাই-এর অভিপ্রেত ছিল না। স্পর্ধা করার মতো মানুষ কদমালি চাচা ছিলেন না। অত্যন্ত শান্ত, নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। আমাদের বাড়ির প্রতি তাঁর সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। কিন্তু চট্‌কি বাড়ির অংশ তিনি অতিকষ্টে সংগ্রহ করা পয়সা দিয়েই কিনে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র একজন চাষি। আগেই বলেছি তিনি আমাদের বাড়িতে একসময় রোজে দুধ দিতেন, আমাদেরই ঝোপঝাড় থেকে সংগ্রহ করতেন জ্বালানির কাঠকুটো। পঞ্চাশের শুরু থেকে যখন হিন্দু গ্রামগুলো থেকে বনেদি পরিবারগুলো তাদের ভিটেবাড়ি বিক্রি করে অথবা ফেলে রেখে চলে যাচ্ছিল, তখন ফেলে রেখে যাওয়া ভিটেবাড়ি জমি অনেক মুসলমান ক্ষমতাশালী ব্যক্তি দখল করেছিল। কিন্তু কদমালি চাচার মতো মানুষেরা সেই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তাঁরা বস্তুত, আমাদের মতো পরিবারগুলোর জন্য চাষবাস এবং অন্যান্য ধরনের নানা কার্যকলাপ করে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করতেন। নিঃসন্দেহে এই সম্পর্ক শোষক শোষিতেরই সম্পর্ক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শোষিতরা নিজেদের রুজি রোজগারের জন্যই হোক, অথবা তাঁদের উপায়হীনতার জন্যই হোক, পরম্পরাগত পারস্পরিক সুসম্পর্কটা বজায় রাখতেন। সেই সম্পর্কটাকে

BanglaBook.org

আমাদের বড়োবাড়ির মতো পরিবারেরা তাঁদের সুদিনে খুব কম মূল্য দিতেন না। এইসব মানুষেরা তখন যথেষ্ট আদর পেতেন। পেতেন সহায়তাও। দীর্ঘকাল ধরে আমাদের বড়োবাড়ির মতো বাড়িগুলো যতকাল স্বচ্ছল ছিল ততদিনের এই পারস্পরিক সম্পর্কে আদর এবং অবহেলা এবং উচ্চনীচের ভেদাভেদ থাকা সত্ত্বেও একটা মানবিক ভিন্ন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে। মধ্যস্বত্ব লোপ পেলে যে অগৃহস্থতার অভিশাপ স্বাভাবিকভাবে এইসব মধ্যস্বত্বভোগীদের জীবনে নেমে আসে, তার আঘাত কদমালি চাচাদের মতো পরিবারগুলিকেও স্পর্শ করে। প্রাক্তন মধ্যস্বত্বীয় স্থিতাবস্থা অবশ্যই সমাজ প্রগতির সপক্ষে ছিল না। কিন্তু সেটা তো দীর্ঘদিনের একটা ভূমি ব্যবস্থাই। তার বদলে নতুন কোনো উন্নত ভূমিব্যবস্থা বা রোজগারের উপায় তাদের জন্য তদানীন্তন সরকার করেনি। বস্তুত, মধ্যস্বত্বভোগীদের জমিদার, তালুকদার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে আর-সরলীকৃত বিচার করার মধ্যে প্রচুর ভ্রান্তি থেকে গিয়েছিল। তাতে মধ্যস্বত্বভোগীরা যেমন অন্নহীন হয়ে পড়ে, তাদের আওতার মধ্যে যেসব কৃষক পরিবার ছিল তাদের অবস্থায়ও অনুরূপই হয় বরং আরো করুণই হয়। কারণ, বাজেয়াপ্ত মধ্যস্বত্বীয় ভূমি এইসব কৃষকদের মধ্যে আজও সঠিকভাবে বণ্টিত হয়নি। এক্ষেত্রে শোষণের সরকারি করণ ঘটেছিল এবং একের স্থানে দশ শোষকের খপ্পরে পড়েছিল চাষিরা।

কদমালি চাচার যে আনুগত্যের মানসিকতার চিত্র আমি ইতিপূর্বে দেখেছি তার প্রধান কারণ এই ভূমিব্যবস্থার বিশৃঙ্খলার মধ্যেই নিহিত। কিন্তু সেসব অনেক ব্যাপক কথা। সুতারাং বড়ো মিঞাদের অপছন্দের কথাও।

কদমালি চাচা চটকি বাড়ির গোটাটাই বড়োবাড়ির বড়োবাবুর কাছে চেয়েছিলেন। এই নিয়ে বেশ কিছুকাল চাচার নাজেহাল হতে হল। চটকি বাড়ির সংলগ্ন ধানিজমির চাষ অবশ্য সবটাই চাচার হাতে হতো। কিন্তু ধানের ভাগ নিয়ে অশান্তি চলতো নিয়মিত। বড়োবাবু যখন জমিদার অর্থাৎ মধ্যস্বত্বভোগী ছিলেন, তখন তিনি অকাতরে এইটুকুন জমি চাচাকে এমনি ছেড়েদিয়ে (অবশ্য সেজন্য তাঁকে তাবে থাকতে হতো বাবুর) বলতেন, নেও কদম তুমি এর আবাদ করো, তুমিই খাও। কিন্তু এখন তাঁর মধ্যে ভিন্ন চিন্তা। দিলদরিয়া হওয়ার দিন আর নেই। যাইহোক, কিছুকাল এই নিয়ে রগড়ে শেষতক কদম চাচাকে তিনি পুরো মালিকানায় স্থায়িত্ব দিলেন। অবশ্য এতে তাঁর অর্থাৎ বড়োবাবুর খুব একটা ক্ষতি হলো তা নয়। চটকি বাড়ির ঐ অংশতো তিনি নগদে কেনেননি, দখল

BanglaBook.org

করেছিলেন মুখের কথায়। পক্ষান্তরে কদম চাচার অংশ তিনি নগদেই কিনেছিলেন। কিন্তু বাজারে, অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের যাঁরা তখনো ওখানে ছিলেন তাঁদের বাজারে প্রচার ছিল যে কদমালি চট্‌কি বাড়ি জবরদখলে খায়। যাই হোক আমি অন্তত জানতাম যে কদমালি চাচা কোনো হিন্দুর ভিটে মুফতে বা জবরদখলিতে খাওয়ার মানসিকতায় ছিলেন না। তবে নিঃসন্দেহে চট্‌কিবাড়ির ভিটে এবং ধানি জমি লাভ করে তাঁর পারিবারিক আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এসেছিল এবং আমাদের বড়ো বাড়িও সেকারণে কম উপকৃত হয়নি।

হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম চাচির কাছে গিয়ে বসে। এই গ্রামেই আমার একজন পড়ে-পাওয়া আঠেরো আনা দাদি আম্মা ছিলেন। তাঁর স্নেহাশ্রয়ের কথা আমার বিষাদবৃক্ষ নামক গ্রন্থে লিখেছি। জীবনে দুইজন স্নেহময়ী মুসলমান রমণী আমাকে জড়িয়ে ধরে গায় মাথায় হাত বুলিয়ে 'দোয়া' করেছেন। তাঁরা হলেন দাদিআম্মা এবং এই চাচি। এখন যখন চাচির কাছে বসে আছি, আমার বয়সের তখন প্রৌঢ়ান্ত কাল। আশি বছরের বৃদ্ধা আমাকে এখনও তাঁর বাহুবন্দি করে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন এবং এতদিনের পরেও তাঁদের চট্‌কি বাড়ি প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন। ব্যাপারটাকে এঁরা অভ্যস্ত পরম্পরার দৃষ্টিতেই দেখতেন, যেন জমিদারবাবু জমি প্রজাপত্তনি দিয়েছেন এবং তাঁদের সম্পর্কও প্রজা ও মালিকের। মনে পড়ে যাচ্ছিল, কদমালি চাচার চালের থলে দিয়ে শিখিয়ে দেওয়া সেই কথাটি "হেনায় য্যান্ মোর বেয়াদপি মাফ্ করেন। মুই পেন্নজা হিসাবে দেলাম।" এখন ভাবি, হায়, কে কার প্রজা! আর কেই বা কার মালিক।

চাচির আদর খেতে খেতে মনে পড়লো আরেকটি কথা। সেই প্রথম দিনের চিনির জোড়া সন্দেশের লোভেই হোক, চাচির আদরের জন্যই হোক বা দিলুর সঙ্গে বন্ধুত্বের সুবাদে হোক, এ বাড়িতে যখন আসতাম চাচি একদিন কদমালি চাচার সামনেই আমাকে বলেছিলেন, বাজানে, তুমি মোরে চাচি আর ওনারে চাচা বোলাও ক্যা? ওথে মনে অয় মোরা য্যান্ তোমার পর। তোমরা নিজেরা বাড়িথে বা গেরামে নিজেগো সমাজে যেমন কাকা, কাকি কও মোরে হেইরকম বোলাবা। মোর খুব হাউস, মোরে তুমি কাকি বোলাও। কদমালি চাচা বলেছিলেন লতিফের আম্মা, ও হাউসে কাম নাই। এই গেরামডার মাতবরেগো এইসব ডাকে আপইত্য আছে। মোছলমানের পোলাপানেরা হিন্দু মুরুব্বিগো কাকা, জেডা কইবে, আর হিন্দু পোলাপানেরা চাচা, চাচি কইবে এইডাই এহানে

BanglaBook.org

ফতোয়া।—অন্যত্র কাকা, জেডা ইত্যাদি চালু ছিল একসময়, কিন্তু ক্রমশ তা পাল্টে যাচ্ছিল। তখন সেইসময়, যখন অক্ষর জ্ঞানের জন্য নতুন কিতাব চালু হয়নি, কিন্তু পুরোনো বর্ণপরিচয় পড়াতে মুসলমান গৃহ শিক্ষকদের দেখেছি যে তাঁরা পড়াচ্ছেন, ক'এ আকারে কা, ক' এ আকারে কা—চাচা। ব'এ আকারে বা, ব' এ-আকারে বা—আব্বা। এইভাবে তখন নতুন পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ মানুষদের গড়ার যুগ। বাংলা ভাষাটাকেও মুসলমানি বাংলা ভাষা তৈরি করার কসরৎ চলছে। কিন্তু এনিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে, তর্ক-বিতর্ক, হিন্দু ও মুসলমান বিদ্বৎ সমাজে ঢের আছে আজও। আমার অবশ্য ধারণা নেই 'বিদ্বৎ সমাজ' বা 'ভাষার' হিন্দু মুসলমান বলে কোনো ভাগ থাকতে পারে কিনা। এনিয়ে এস্থলে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

—তুমি যে মোগো ভোলো নায়, এতোদিন পরে আইয়া তালাশ লইলা, এথে মোর দেল্‌ডা বড়ো শান্তি পাইলে। আইজ তোমার চাচায় থাকলে হ্যানে কতো খুশি অইতে। কতো দুঃখ করতেন তোমরা চলইয়া গেছ হ্যার লইগ্যা। থাকপাতো কয়েকটা দিন?

—থাকমু দিন পোনারো।

—ভালো। তয় যেহানে যেহানেই যাও, রাত্তিরডা মোর ধারে থাকতে অইবে। নাকি বাড়ি থাকপা?

—বাড়ি থাহনের পইদ্য নাই। খবর নিছিলাম, বাড়িডায় এহন থাহনের কোনো উপায় নাই। ভাইঙ্গা চুড়ইয়া গেছে বেয়াক। দরজা, জানলা সব বেচ্‌ইয়া দেছে যে ঘরে আমরা থাকতাম।

—বড়ো বাড়ির এই অবস্থা? তুই কও কী?

চাচির স্মৃতি বড়ো সতেজ। একসময় লতিফদা, দিলুকে যেমন, আমাকেও তুই করে বলতেন। সেটা ভোলেননি দেখে বড়ো তৃপ্তি লাগলো। কাল সকালেই চলে যাব, একথা বলতেই হাঁইমাই করে উঠবেন নিশ্চয়। কিন্তু আমারতো উপায় নেই। যা দুচারজন আত্মীয় কুটুম্ব আছে গ্রামে এবং শহরে, প্রত্যেকের কাছেইতো যেতে হবে। সেকথা আমতা আমতা করে বলতে, চাচি অভিমান করেন। বলেন হ, মোরাতো আত্মীয় কুটুম্ব না, মোগো বাড়ি থাকপা ক্যালায়?—বললাম, চাচি তোমাগো যদি আত্মীয় কুটুম্ব না জানতাম, তয় দিলুর লগে আচমকা দ্যাহা হওনের লগে লগেই কি এহানে চলইয়া আইথাম? তুমি এহন অনেক কথাই

BanglaBook.org

কবা, আমি জানি। কারণ, তোমার এহন রাগ চড়ছে। যাউক হে কথা, এহন বৌগো কও, যা পাক টাক অইছে হেয়া দিয়াই দুগ্‌গা খাইতে দিউক। আগে বাড়িডা এটটু দেইখ্যা আই। আর হ। কথা দিলাম, এই এলাকায় যদ্দিন থাহি, বেশিরভাগ দিনই রাইতে তোমার ধারে থাকমু।

বাইরে থেকে দিলু সাড়া দেয়, কি বুড়ির প্যাচাল খামার হোনা শ্যাষ অইছে?—দিলুর বচন শুনে চাচি তার উদ্দেশ্যে কিছু এমন 'খামার' ব্যবহার করেন যাতে তাঁর নিজের বা মরহুম কদমালি দফাদারের সম্মানও খুব একটা বাঁচে না। তবে এক্ষেত্রে নিয়ম এই যে, আমরা বইশ্‌শালইয়ারা প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে, ক্রোধে বা ভালবাসায় খামার দিলে 'রাইখ্যা ঢাইক্যা দি না'। পুরোটাই দিই। এক্ষেত্রে বুড়ি ছোট ছেলের উপর খুশির আতিশয্যে খামারটি দিলেন। খুশির হেতু সে আমাকে 'আচুক্‌কা' এনে তাঁর সকাশে উপস্থিত করেছে। তাই তিনি তাকে আদর করে 'শয়তানের আওলাদ্', 'ইবলিসের বেজন্মা' ইত্যাদি বলছেন। দিলুও এই আদরে সাতিশয় বিগলিত হয়ে তার আম্মাকে প্রায় কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "বাকি দুই হান কইলেন না?" বাইরে এসে 'বাকি দুই হান কী জানতে চাইলে, দিলু নির্বিকার জানালো, 'বলদার পো' এবং 'নিপিতইয়া মাগির ছাওয়াল।' আমি বরিশাল বিষয়ে নিজেকে তত্ত্বজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, প্রাজ্ঞ-জ্যেষ্ঠ বলে মনে করি, কিন্তু আমিও এই খামার দুটি জানতাম না।

।। তিন ।।

ভোরে বেরোবার সময় স্নান সেরেই বেরিয়েছিলাম। দিলুর বৌ জানালো, খাবার তৈরি। সে একটা হোগলার চাটাই এর উপর সাদা পরিষ্কার চাদর অর্থাৎ দস্তরখান পেতে খাবারের প্লেট সাজিয়ে দিয়ে বললো, এতো জলদি পাক অয়? খালি ডাইল, কচুর হাগ আর মুড়হার ছালুন হরছি। এহন হেইয়া দিয়া খায়েন। রাত্তিরে দেহি কী জোডে। আর বাড়ি থিহা ঘুরইয়া আয়েন, হ্যার পর আলাপ হরমু হ্যানে। তারাতারি আইয়েন।

পশ্চিমবঙ্গীয় অনেক মানুষের ধারনা যে বাংলাদেশের মেয়েরা নাকি প্রায় সবাই বোরখার আড়ালে থাকে, বাইরের পুরুষদের সামনে বেরোয় না, বা সহজভাবে কথাবার্তাও বলে না তাদের সঙ্গে। আমার এক্ষুণি তাঁদের ডেকে

BanglaBook.org

দেখাতে ইচ্ছে করছে, প্রায় অশিক্ষিতা, আমার এই অজতম পাড়াগাঁয়ের বন্ধুপত্নীটি কত সহজ এবং সাবলীল এবং তাঁর কোনো বোরখা টোরখার বালাইও নেই এবং আলাপে রসিকাও।

খাওয়ার মধ্যেই লতিফদা এসে যান। চাষের কাজ দেখাশোনা করতে গিয়েছিলেন। দুইভাই-এর যৌথ সংসার। এখানেও এটা খুব কমই দেখা যায় এবং তা ছোটবেলা থেকেই দেখছি। বিশেষ করে মুসলমান সমাজে। ভাই ভাই একত্রে থাকা প্রায় নেই। হিন্দু সমাজে এককালে ছিল। কিন্তু যেভাবে ছিল, তাকে থাকা বলে না। অধিকাংশ স্থলেই তা ছিল একগাদা ইতরের পিণ্ড পাকিয়ে সহাবস্থান। কিন্তু তাই নিয়েই বাইরে জাঁক কত ছিল তাদের, যেন যৌথ পরিবারের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ব্যাপারটা আমাদের বড়োবাড়ির ক্ষেত্রেও দেখেছি। বাড়ির বসন্তকালের দিনের কথা বলতে পারবো না। তখনো জন্ম হয়নি। তবে পরে গাল গল্পে যা শুনেছি এবং তালুক মুলুকের যতগুলো ভাগ দেখেছি, তাতে ব্যাপারটা যে তেমন নির্বিষ সম্পর্কের ছিল, তা মনে হয়নি।

লতিফদা আমাকে প্রথমে চিনতে পারেননি। আমিও না। দিলুই বললো, ভাইজানে। পরিচয়ের পর দুজনেরই ঘর ফাটিয়ে সেকি অট্টহাসি। দুজনেরই চেহারায় এক অসামান্য পরিবর্তন, যা দীর্ঘকাল পরে পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে একমাত্র নিজেরাই বুঝতে পারে এবং অবাক হয়। তারপর খানিক বাদে যখন বয়সের ভোজবাজির কাণ্ডটা উপলব্ধিতে আসে, তখন হাসি ছাড়া আর কীই বা করার থাকে? কিন্তু সে হাসি যতই অট্ট হোক এবং যৌবনগন্ধী হোক ক্রমশই তা প্রৌঢ়ত্বের, বার্ধক্যের বিষণ্ণতায় বিলীন হতে থাকে। অর্ধশতক প্রায় সময়কাল, খুব কথার কথাতো নয়। আমি ভাবছি, সেদিনের বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জ্বল বর্ণ, সুদর্শন সেই যুবক কী এই থুত্‌নিতে স্বল্প দাড়িওলা, প্রায় তাম্রবর্ণ, অত্যন্ত কৃশকায় এই বৃদ্ধ!

চাচিও গুটি গুটি এসে বসেছেন খাওয়ার কাছে। আমি আর দিলুই শুধু বসেছি, বেরোবো বলে। অন্যদের খাবার সময় হয়নি এখনো। লতিফদা বললেন, তুই যে শ্যাহের বাড়ি ভাত খাইতে বইলি, তোর জাত ভাইরা দ্যাখলে কইবে হ্যানে কী? হিন্দুস্থানে তো তোর আত্মীয় স্বজনের ধারে খবর পাডাইয়া দেবে।— চাচি বললেন, ব, ও আইজ শ্যাহের বাড়ি পেরথম খাইলে? হেই কোন্ ছোডকাল থিহা ও জোর করইয়া মুরহার ছালুন খাইতে না, দিলুর লগে?

BanglaBook.org

আমি বললাম, হেয়া বোধায় লতিফদায় ভুলইয়া গেছে। আর, এহানে আমার জাতভাই আছে কয়জোন?

—ক্যান্ তোরগো শরিক এক গুষ্টি আছে না?

—হ. কিন্তু হিন্দুস্থানে যাইয়া আর কিছু হউক আর না হউক এট্টা ভাল জিনিস শিখছি। এহানের হিন্দুরা এহনো যেরহম হিন্দুয়ালি ফুডায়, হেরহম ভাব আমার আর নাই। ও দ্যাশে যারা বেশি হিন্দুয়ালি ফুডায় হ্যারগো মাইনসে দাঙ্গাবাজ ঠাওরায়।

চাচি বললেন, ওইসব কতা থাউক।

আমিও বললাম—থাউক।

রাস্তায় বেরিয়ে দিলু বললো, মোরা এহন হেলে বড়োবাড়ি যামু? অনেক দিন ওদিগে যাওয়া অয় না।

ক্যান্, চট্‌কি বাড়ির ভিডার দিকে যাওয়ার দরকার অয় না?

—না, হেহানে তো আর নাইরখোল, সুবারি বা ফল পাকড়ার গাছ-গাছালি নাই। এমনকি আন্দারইয়া পুহইরডা তামাইত কোলা। ল, দেখফি হ্যানে, হেহানে যে কোনোদিন বাড়ি ঘর, আগান বাগান, পুহইর ব্যাড় কিছু আছেলে, হেয়ার চিন্নও রাহি নাই। বেয়াকই ধানের জমি বানাইয়া ফালাইছি। গাছগাছালি বগ্‌গেও কিছু নাই। ওদিগে গ্যালে এহন ডর লাগে।

দিলু যেন কোনো এক থম্‌থমে দুপুরের দমবন্ধ করা ভয়ঙ্কর ভীতিজনক গল্পকথা বলতে শুরু করলো এবং বলতে বলতে ক্রমশ বিষণ্ণ হয়ে যেতে থাকলো। বুঝতে পারছিলাম, সকাল থেকে, আমাকে পেয়ে তার যে উজ্জীবন হয়েছিল, তা ওদের বাড়ি থেকে বড়ো খাল পারের উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত রাস্তাটায় এসে পৌছোতে পৌছোতে যেন মিলিয়ে যাচ্ছিল। তার কণ্ঠস্বরে বিষণ্ণতা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছিল এবং সে যেন অপরাধীর মতো কৈফিয়ৎ দিয়ে যাচ্ছিল। যেন এই শূন্যতার জন্য তারও দায় আছে। আমিও ছোট বয়সে ভাবতাম, আছেইতো। আর এখন ভাবছি, আছে কী?

খালটা আর বহতায় ছিল না। সেদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দিলু কিরকম যেন একটা ফাঁস্‌ফ্যাঁসে গলায় বললো, দ্যাখছো, খালডারেও মোরা ক্যামন খাইয়া ফালাইছি।

এই খালে শুধু ছোট বড়ো নৌকো নয়, মোটামুটি মাপের মোটরলঞ্চ পর্যন্ত

BanglaBook.org

চলতো। ছোটবেলা, আমাদের বড়ো বাড়ির সামনের ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে আমরা এপার ওপারের ছেলেরা শুশুকদের তালবিদ্যার কসরৎ দেখতাম। জেলেদের মাছ মারতে দেখতাম বড়ো বড়ো। আগেকার দিনে, শুনেছি নাকী বাইচ খেলাও হতো। নৌকো বাইচ্।

—নৈকাডির হাড়্টা আছে তো? রবিবারের হাড়্টা?

—না।

—মানুষ হাড বাজার করে কোথায়?

—কীর্তিপাশার বাজারডা আছে কোনো মতন, নাইলে ঝালকাডির গোঞ্জে যায়।

—গেরামে তয় আছে কী?

—কোলা।

—ধান পান, তয়-তরকারি, ফসলাদি কেমন অয়?

—বাল্ অয়। দিলু যেন কেমন বিরক্তি সহকারে আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল। আমি যা যা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করছিলাম, তার কিছুই যেন ঐ রিক্ত, পরিত্যক্ত আমার প্রাক্তন বিশ্বে আর অস্তিত্ববান ছিল এবং এজন্য দিলু যেন কৈফিয়ৎ দিতে চাইছিল, কিন্তু কোনো কৈফিয়ৎ খুঁজে না পেয়ে বিরক্ত আর বিষণ্ণ হয়ে পড়ছিল। একসময় সে বলেই ফেললো, তুই মোর ধারে কিছু আর জিগাইস না, মোর কোনো উত্তর জানা নাই। অ্যাদ্দিন খেয়াল অয় নায়, তয় আইজ তোর লগে বাইর অইয়া বেয়াক কিছু য্যান্ বিরাণ ঠাহর অইতে আছে।

খালের পূব পার দিয়ে আমরা উত্তরমুখি চলছিলাম। সকাল থেকে বড়োবাড়ি পুনর্দর্শনের উত্তেজনাটা আমার মধ্যে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছিল। এই পথঘাট, খাল, খালপারের বাড়িঘর, পরিচিত কোনো বৃক্ষ, এমনকি কোনোকিছুই আমাকে দিলু দেখাতে পারছিল না। যা যা একদিন ছিল, তা ঠিক সেইরকম আজ আর না থাকতে পারে, কিন্তু সেসবের পরিবর্তিত রূপ কী থাকবে না? এটা ওমন কেমন ধারা পরিবর্তন? যেমন এই যে এখন আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছি, ঠিক তার পশ্চিমপারের ঝোরাখাল আর বড়ো খালটার কোণে যেখানে ললিত ঋষির বাড়িটার কুটিরখানা ছিল, সে জায়গাটা চেনার কোনো উপায়ই নেই! ললিতের যে বয়সে আমি শেষ তাকে দেখে গিয়েছি, তাতে তার এতদিন বেঁচে থাকার কথা নয়। কিন্তু তার ছেলে পুলে, নাতি নাতনি ভরা সংসারটা তো ছিল। সেই বহতাটা থাকবে না কেন? দিলুকে জিজ্ঞেস করতে সে বললো, ঋষি মুচিরা

BanglaBook.org

থাহে যেহানে মরা, গাই, বলদ, বক্‌রি-ছাগলের লাশ ভাসইয়া আইয়া আটকায় হেইহানে। নদী খালের দুইডা র‍্যাত যেহানে এট্‌টা আরেটটার লগে ঘোজা বানাইয়া থাহে, মরা গুলা হেইহানে আটকায় ঋষইয়ারাও চামড়ার লালসে হেইহানে ঘরবসতি বানায়। লইল্‌তারাও হেইরহম, যদ্দিন খালের র‍্যাত্‌, তদ্দিন হ্যারগো বসত। খালও এহন নাই, হ্যারাও নাই। এ অবস্থায়, আখেরে বেয়াক মাইনসেরই এরহমই অয়।

ললিতের বাড়ির খানিক দক্ষিণে, খালপার ধরে হেঁটে গেলে যে জায়গাটা, সেটাকে ছোটবেলা আমরা চৌধুরী বাড়ির ঘাট বলতাম, যদিও সেখানে কোনো ঘাট কোনোদিন আমরা দেখিনি। তবে খালের পশ্চিম কিনারে দাঁড়িয়ে সরাসরি পশ্চিমদিকে চৌধুরীদের ভগ্ন প্রাসাদের সিংহ দরজা দেখা যেতো। খালপারের খানিক তফাতেই ছিল একটি সুউচ্চ পঞ্চরত্ন সমাধিমন্দির। এই জমিদার বংশ নবাবি প্রসাদপুষ্ট জমিদার। অতি শৈশবে আমরা তাঁদের শেষ অবস্থা দেখেছি। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হবার বহু আগেই চৌধুরিরা মোটামুটি তাঁদের জমিদারি জ্ঞাতি-কলহ এবং সামন্ত সুলভ বদগুণের জন্য নিঃশেষ করে দিতে পেরেছিলেন। আমরা বাল্যে, এই পরিবারের সামান্য এক আধটি ভগ্নাংশই তাঁদের এই বাড়ির চৌহদ্দির ছোটখাটো দুএকটি বাড়িতে দেখেছি। তাঁরা এদিক ওদিকের ছিটেফোঁটা জমি জায়গা বিক্রিবাটা করেই দিন গুজরান করতেন। প্রাসাদটি নিতান্তই ভগ্ন ছিল এবং এক আধটি ঘর ছাড়া আদৌ বাসোপযোগ্য ছিল না। সর্বশেষ যিনি ওখানে মারা যান, তাঁকে একেবারেই ভিখিরি জীবন কাটাতে দেখেছি। তিনি ঐ ভাঙা অট্টালিকার একটি ঘরে থাকতেন, একথা মনে আছে।

পারিবারিক সূত্রে এঁরা আমার পরিবারের জ্ঞাতি। অর্থাৎ আমার পরিবারের বংশপুরুষ তাঁদের পরিবারের এই অঞ্চলে বংশপুরুষের সহোদর ভাই। সে অনেককাল আগের কথা। বঙ্গে তখন মুসলিমকুলির শাসনকাল। সে কাহিনী বলার এখানে প্রয়োজন নেই, শুধু এইটুকু বলি যে, তাঁদের প্রাসাদ, অট্টালিকা, বাড়িঘর, সমাধিমন্দির, পুকুর, বাগান কোনোকিছুর চিহ্নমাত্র আর নজরে পড়ল না। যেন এইসব তৈরি হবার আগে যে অবস্থায় স্থানটি ছিল, তখন যেমন ফসল চাষের ক্ষেত্র হিসাবে এর অবস্থিতি ছিল, অথবা শূণ্যমাঠ সেই অবস্থায় ফিরে গেছে। শুধু আশেপাশে গ্রাম প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব ধোপা, নাপিত, ভুঁইমালি, যুগি, নট্ট, মালাকার, কামার, কুমোর, ঋষি বা মুচি জাতীয় বিভিন্ন পেশাভিত্তিক জাতিরা চৌধুরিদের পূর্বজ বসতকারীদের কাছ থেকে ভূমি লাভ করে প্রতিষ্ঠিত

BanglaBook.org

হয়েছিল, তাদের এক আধঘর আছে। বেশিরা চলে গেছে পাকিস্তান হাসেল হবার পর, অথবা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়, এমনকী তার পরেও।

এই আঞ্চলিক আবাদ ভূমির ভূস্বামি হিসাবে চৌধুরি বাড়িরই 'বড়ো বাড়ি' হিসাবে আখ্যা পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা যে কেন হলো না, সে প্রশ্নটা আমার কাছে খুব পরিষ্কার না। এক অর্থে, অর্থাৎ পারিবারিক দৃষ্টিকোণ থেকে চৌধুরিরা আমার পরিবারের বড়ো তরফ। কিন্তু তা শুধুমাত্র বংশের ব্যাপারে। জমিদারির ভাগ বাঁটোয়ারার জন্য নয়। আমাদের 'এস্টেট' তাঁদের এস্টেটের অংশ কোনোদিন ছিল, এমন গল্পকথা কখনো শুনিনি। তাছাড়া আমাদের এস্টেটের জন্ম চৌধুরিদের এস্টেটের অনেক অনেক পরের ব্যাপার। তাঁদের ব্যাপারটা মুর্শিদকুলির বন্দোবস্তের ফল, আমাদেরটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ের। যদিও আমাদের এস্টেটভুক্ত অঞ্চলগুলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনেক পরে ঐ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়।

দিলুর সঙ্গে বাড়ির দিকে চলতে চলতে এইসব নানান কথাবার্তা চলছিল। চৌধুরি বা আমাদের এস্টেট লোপ পাওয়ার বা জমিদারি, তালুকদারি প্রথা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে দিলুকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম আমি। আমার ধারণা ছিল দিলু জমিদারিতন্ত্র বা মধ্যস্বত্বের প্রথার বিরোধিতাই করবে। শ্রেণীগত অবস্থানে সে একেবারেই সাধারণ চাষি পরিবার থেকে আসা একজন মানুষ। জমিদারি, তালুকদারি, অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং শোষণ সম্পর্কে তার বা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রায় নেই। আমার তবুও খানিক পুঁথিগত ধারণা আছে, তার তাও নেই। কিন্তু তার মধ্যে সেরকম কোনো নজির আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। কদমালি চাচা বা গ্রেচ যেরকম বড়োবাড়ির ছেলে হিসাবে আমাকে খাতিরদারি বা সমীহ করতেন, এমনকী যখন আমাদের দুঃস্থতম অবস্থা তখনও, দিলু ঠিক সেরকমভাবে না হলেও, বড়োবাড়ির একটা মর্যাদা যে রক্ষা করে চলছে, তাতে সন্দেহ নেই। সেটা আমি উপলব্ধি করছি। যেটুকু সমভাবাপন্নতা তার আচরণে দেখা যাচ্ছে, তার কারণ বাল্যবন্ধুত্ব, অন্য কিছু নয়।

তার বিচারে আমাদের বাড়িটার বড়োবাড়ি সুলভ সম্মান পাওয়ার একটা ভিন্ন কারণ আছে। সেটা বোঝা গেলো যখন বাড়ির পূব সীমানা দিয়ে আমাদের অনেক স্মৃতি-বিজড়িত লোহার ব্রিজটি পেরিয়ে বাড়ির দিকে চলতে চলতে, আমার কিছুটা দেখা এবং অনেক শোনা গোটা চৌহদ্দির আয়োজনের কথা

বলতে বলতে যাচ্ছিলাম তখন। ছোটবেলার দেখাটা ছিল অভ্যস্ততার এটা পূণদর্শন। সুতরাং ভিন্নতা ছিলই।

প্রথম বাড়ির এলাকাটার বিশালত্বের ব্যাপারে দিলুই বলতে শুরু করেছিল। তারপর আমি। ব্রিজটা থেকে নেমে, ঠিক বাঁহাতে একটা ঘাট ছিল এবং সেখান থেকেই এবাড়ির কিংবদন্তির শুরু যেন। আমি তাকে ছোটবেলার দিনগুলোতে যে গল্প শোনাতাম, আজও সেই একই গল্প বলতে লাগলাম এবং আশ্চর্য, আজও সে একইভাবে মুগ্ধ হয়ে সেই ঘাটের কথা শুনতে লাগলো। সেই কবে এক বিরাট মাপের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা, আমাদের না দেখা এই খালের ঘাটে অগুণতি মানুষ নিয়ে লঞ্চ থেকে অবতরণ করেছিলেন, যে ঘাটের নাম বাড়ির বাবুরা রেখেছিলেন তাঁদের পিতামহীর নামে, 'বিধুমুখী ল্যাণ্ডিং ঘাট'। শিশুকাল থেকে সেই মানুষটির কথা, আমার মায়ের কাছে, গ্রামবাসীর কাছে হাজারবার শোনা, দিলুকে তা হাজারবার শুনিয়েওছি, তবু আজও তার ছানিপড়া চোখে একই অবাক বিস্ময়। সেই খালটা আজ তার বহতা হারিয়ে একটা কাদার দড়ির মতো পড়ে আছে। ভরা কোটালেও সেখানে একটা স্রোতের রেখা পড়ে না। তার পারের অতি প্রাচীন শিরিষ বৃক্ষ দুটিকে কতোকাল হয়েছে যেন কেটে ফেলা হয়েছে। ব্রিজটিতে ওঠার সিঁড়িগুলো ভেঙ্গে ইঁটগুলো হয় বিক্রি করা হয়েছে অথবা কারুর প্রয়োজনে নিয়ে গেছে কেউ। ব্রিজটা অসম্ভব রকমের ছোট দেখাচ্ছে। এইসব অসঙ্গতি সত্ত্বেও দিলুর বিস্ময় অক্ষয়। এই বিস্ময়ের ঘোর, এই নির্বাক-মুগ্ধতা শুধু গ্রামীণ মানুষদেরই সম্পদ। শহর নগরের মানুষেরা তার অনুভবে কখনো কী থাকে?

আমি এই বড়ো বাড়ির ছেলে। বাড়ির যেসব বনেদিয়ানার গল্প শিশু-কিশোর বয়সে শুনেছি এবং তার সামান্যতমটুকুও দেখেছি, সেকথা মনে করে আমার কিছু নস্ট্যালজিক ভাবালুতা অবশ্য হচ্ছে, কিন্তু বাড়িটার জন্য বিশেষ গৌরব বোধ হচ্ছে না। মনের মধ্যে শ্রেণী ইতিহাসের পরবর্তীকালীন পাঠের সংস্কার আছে আমার। দিলুর তা নেই। তার বেদনা বোধটা অন্যরকম। আমার কাছ থেকেই শোনা একদার নানান গল্প সে এখন আমাকেই শোনাচ্ছে। আশ্চর্য আজও সে তাতে আপ্লুত, কিন্তু আমি নই!

"বিরিজের ওপার দিয়ে হোজাহুজি রাস্তাডা গেছে গোঞ্জ তামাইত। এই দিগে আওনের লইগ্যা হাডাপথ এই এট্টাই। এইডার বয়স একশো বছরের উফার।

BanglaBook.org

ডিস্টিক বোডের মেম্বর আছেলেন এই বাড়ির রায়-বাহাদুর। হেনার দৌলতে রাস্তাডা, বাজানের ধারে হুনছি। এহন কোনো হালার পো হালায় এক চাহা মাডিও দেনা।" রাস্তায় হাঁটার লোকই নেই, দেবে কে? দিলুদের গ্রামের লোকেরা এই রাস্তা ব্যবহার করে না। নদীর পার ধরে যে রাস্তা, বা গ্রামের ভেতর দিয়ে যেসব পথ আছে, সেই পথে গঞ্জের শহরে যায় সবাই। অথচ ব্রিজ থেকে নেমে, উত্তর দক্ষিণ এবং পশ্চিমে যতগুলো গ্রাম আছে, তার জন্য প্রধান রাস্তা এটাই। এইসব গ্রামে এখন হিন্দু বলো, মুসলমান বলো বসতিই নামমাত্র। দিলুর প্রশ্ন, "বড়োবাড়িডা যদি ঠিকঠাক থাকতে হেলে কি এমন অইতে? বড়োর লগে বাজইয়া ছোডোরা থাহে। শহর গোঞ্জে যে বেয়াক বড়ো বড়ো, হ্যার লইগ্যা হেহানে যাইয়া বেয়াকে দলা মোচা অইয়া রইছে। গেরামগুলা ফাহা। খালি ধান চয়। আর দ্যাখ্। খালডাই নাই। হেডাও খ্যাত।

বাড়িটার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে এটাই এই গ্রামের প্রথম বাড়ি। গ্রামে ঢুকেই প্রথম। তখনকার দিনে ব্রিজের উপর থেকে গোটা বাড়িটা নজরে না এলেও দোতলার অংশের মাঝখান থেকে ছাতের আলিস তক্ দেখা যেতো। গোটা বাড়িটার গড়ন ইংরাজি L অক্ষরের মতো (ক্যাপিটাল L)। এল অক্ষরের ডানদিকের অংশটি একতলা এবং বাঁদিকের প্রলম্বটি দোতলা। ব্রিজ থেকে তাকালে একতলাটি দেখা যায় না। বিধুমুখি ল্যাণ্ডিং ঘাটে নেমে পশ্চিমমুখী সোজা চলতে থাকলে, বাড়িটির আয়োজন তখনকার দিনে, যেমন শুনেছি এবং যতটা আমাদের বাল্যকাল অবধি মোটামুটিও বজায় ছিল তার একটা বর্ণনা দিই। রাস্তার পার্শ্ববর্তী ক্ষেতজমি থেকে রাস্তাটা বেশ খানিকটা উঁচু এবং একটানা। বাড়ির প্রথম টিনের আটচালা, সুন্দরী কাঠের ফ্রেম ও থামের তৈরি বৈঠকখানা অবধি বেশ দীর্ঘপথ। এই পর্যন্ত যেতে পথের দুপাশে প্রথমে উত্তর, অর্থাৎ ডানদিকে পাঠশালা বাড়ি এবং তার আড়ালে ঢাকা পড়া দুটি ধোপা বাড়ি। পাঠশালা পেরিয়েই একটি ছোট খেলার মাঠ। পাঠশালা শেষ হতেই পোস্ট অফিসের বাড়ি এবং তার খানিক তফাতে এস্টেটের নায়েব মশাই-এর গেরস্থালি। তাঁর বাড়ির এলাকাটিও বেশ বিস্তৃত। পোস্টাফিসের বাড়িটি শেষ হলে একটি প্রশস্ত শান্-বাঁধানো চত্বর এবং বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়িওলা বড়োসড়ো এক দিঘি। রাস্তার দক্ষিণে, অর্থাৎ বাঁদিকের ঢাল বেয়ে নেমে কুমোরদের গেরস্থালি। তারা বেশ কয়েকঘর নিজের জাত ব্যবসা করে আর

BanglaBook.org

বড়োবাড়ির পুজোর প্রতিমা গড়ে। পারিবারিক নাপিতদের গেরস্থালি শুরু এরই পর থেকে।

দিঘির পশ্চিমপারে তিনটি মন্দির। প্রথমটি পঞ্চরত্ন। দুটি সমাধি মন্দির, দক্ষিণে ও উত্তরে, এর মাঝেরটি সাধারণ মণ্ডপ। পঞ্চরত্নটি এস্টেটের প্রতিষ্ঠাতা দুই সহোদর এবং তাঁদের পিসতুতো এক ভ্রাতার সমাধির উপর, দ্বিতীয়টি আমার এক পিতামহীর। মন্দির সংলগ্ন পুরো এলাকাটি নানান ফুল ও ফলের গাছে সাজানো। সবরকম ফুল আর ফলই দেশ-জাত। তাদের সজ্জার ব্যাপারে যে বিশেষতা রয়েছে, সেটা এতই গৃহস্থ সুলভ যে হঠাৎ করে মনে হতে পারে যে, গাছগুলো অযত্ন বর্ধিত। কিন্তু তা নয়। সেই ফুল আর ফল যতটা গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনের, ততটা শোভা সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য আদৌ নয়। এ বাগানটি ছোটোবেলা, বিশেষ করে গরমের দিনগুলিতে আমাদের বড়ো প্রিয় আশ্রয় ছিল। বৈশাখ জৈষ্ঠ্যের প্রচণ্ড তাপে যারা গন্ধরাজ ফুলের ঘন ডালপাতার মধ্যে শরীর বিছিয়ে থেকেছে, তারা জানে সেই শীতলতার মাহাত্ম্য কতোটা। এসব অনুভবের জন্য একটা প্রাকৃত-শরীর এবং তদনু সারি মন চাই।

পঞ্চরত্নটির তিনদিকের অনেকটা অঙ্গন ছিল শান বাঁধানো। আমরা যখন দেখেছি, তখন এখানে ওখানে ফাঁটল। সেইসব ফাঁটলের মধ্য দিয়ে উঠেছে সূর্যমুখির চারা। খুবই ছোট আকৃতির ফুল এগুলো, প্রায় বুনো। মন্দিরটায় থাকতেন পতাকি সাধু, পতাকিচরণ দাস, তাঁর গুরুর ফটো, ধর্মপুস্তক, এইসব সাজিয়ে। পতাকিচরণ তাঁর বাল্যে আমার বাবার ফাই ফরমাস খাটার সঙ্গী হিসাবে এবাড়িতে এসেছিলেন, তারপর আমৃত্যু এ বাড়িতে রয়ে গেছেন। আমরা তাঁকে জেঠা ডাকতাম। বাড়িতে তাঁর একটি বিশেষ সম্মান এবং সমাদরের আসন ছিল। সন্ধ্যেবেলা মন্দিরে করতাল বাজিয়ে গোস্বামি বন্দনা গাইতেন মনে আছে, শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-শ্রী অদ্বৈত সীতা ইত্যাদি।

সূর্যমুখি ফুলের বীজগুলো মন্দির এলাকার যত্রতত্র পড়ে প্রচুর চারা হতো এবং সারাবছরই ফুল ফুটতো তাতে। মন্দিরের দুই দিকে দরজা ছিলো, ফলে এটিকে একটি ঘর বলেই মনে হতো। জেঠা সেই ঘর এবং গোটা অঙ্গনটিকে বড়ো পরিচ্ছন্ন রাখতেন। দিঘির পারের এই এলাকাটি যদিও পারিবারিক শ্মশানের কাজে ব্যবহৃত হতো, কিন্তু তা হিন্দু শ্মশানের মতো অসংস্কৃত, ভয়ঙ্কর

BanglaBook.org

বা কুৎসিৎ মনে হতো না, বরং মুসলমানদের কবরস্থানের মতো পরিচ্ছন্ন এবং শান্ত ছিল স্থানটি।

দিঘির ঘাট, চাতালের চারদিকে বসার পৈঠা, পশ্চিমদিকে পৈঠার পাশের একটি বকুল গাছ—এইসব নিয়ে স্থানটি বৈকালিক বিহারের জন্য ভারি মনোরম ছিল।

বাড়িমুখো আরেকটু এগিয়ে, ডানে বাঁয়ে দুটি পুকুর। মাঝখান দিয়ে প্রশস্ত পথ। পুকুর দুটিই যথেষ্ট বড়ো। ডানদিকেরটি পানীয় জলের জন্য সংরক্ষিত। এখানে হাত-পা ধোওয়া, চান করা, কাপড় কাচা ইত্যাদি চলতো না। যতদিন দেশে টিউব-অয়েল আসেনি, ততদিন এই ব্যবস্থাই ছিল। এই পুকুরটির পশ্চিমপারে আমার ঠাকুরদা মশাই-এর আশ্রমবাড়ি। নানা জাতীয় ফলের গাছের মধ্যে, আম, জাম, বিলিতি গাব, কুল, জামরুল, গোলাপজামই প্রধান। কমলালেবুর গাছও একটি দেখেছি, কিন্তু তার ফল অনবদ্য টক। এছাড়া আমলকি, হর্তুকি, বহেড়া এবং অন্যান্য, আমাদের অচেনা ভেষজ গাছতো ছিলই। টগর, করবী, শিউলি, গন্ধরাজ, ঝুমকো ইত্যাদি ফুলের গাছের সমারোহ ছিল। আশ পাশে ছিল অঢেল লালচিতির ঝোপ। আমরা বলতাম বিশল্যকরণী। আশ্রমের ঘরটি ছিল শনের ছাউনি আর সুন্দরী কাঠের ফ্রেমের। আশ্রমে ঢোকার গেটটি পেরিয়ে খোয়া-বিছানো রাস্তা, একেবারে আশ্রম গৃহ পর্যন্ত। সিঁড়িটি শুধু পাকা ধাপের। রাস্তাটির দুপাশে এবং বাগানের এখানে ওখানে ইতস্তত রঙিন আর সাদা নয়নতারার মতো দেখতে ফুলের সজ্জা, আর চন্দনের ছিঁটেওলা পাতার ছোট ছোট কচুগাছের ঝোপে জায়গাটি আমাদের শৈশবকাল পর্যন্ত বড়ো চমৎকার শোভন ছিল। ঠাকুরদা মশাইকে আমরা দাদু বলে উল্লেখ করতাম। বাগানের ঠিক মাঝখানটিতে মৃত্যুর পর তাঁর ও ঠাকুমার সৎকার করা হয়। পাশাপাশি চিতা দুটি, এখনো যেন চোখ বুজলেই দেখতে পাই।

আশ্রমের বাইরের সামনের বিস্তৃত জমিতে, পুকুরের পশ্চিম তীরেও ফুলের বাগান। বস্তুত এই পুকুরটির তিনদিকেই ফলফুলের বর্ণাঢ্য উপস্থিতি। বাঁদিকের পুকুরটিতে মাছ। তার পশ্চিমতীরের জমিটিতে একদা গোলাপবাগান ছিল শুনেছি। কিছু ইতস্তত অবশেষ দেখেছিও। গোলাপের বাগান বোধহয় দাদুর

BanglaBook.org

বাগানের গেটের বাইরের প্রশস্ত জমিটিতেও ছিল। এই দুই বাগানের মাঝের বিস্তৃত রাস্তা এবং দুই পুকুরের মাঝের স্থানটিতে জারি গানের আসর বসতো এরকম অতি ক্ষীণ স্মৃতি আছে। অবশ্য জারি শোনা আমাদের কপালে ঘটতো না। আমরা বালখিল্যরা অনুষ্ঠানের পরদিন স্রোতা দর্শকদের বসার জায়গায় চিনেবাদামের খোসা, ছোলাভাজা ছড়ানো, কারুর পকেট থেকে পড়ে যাওয়া পয়সা দেখে বুঝতাম গত রাতে জোর গান বাজনা হয়েছে। আর একটা ব্যাপারেও তা বোঝা যেত বেশ। বাড়ির চাকরবাকরদের গলায় যখন তখন শোনা যেত 'গুণার' গান, 'ওহই না দিগির পচ্ছিম পাড়ে মাহ্ মাহ্ বোইলে ক্রেন্দন ফাড়ে, ঘরে আমার মনে লাগে না ...''। অথবা,

'ওহ মোহ্র চাহ্চা জান্, চাহ্চা জান্
আফ্নে কুহুরের ল্যাহান্।
ভাইর ব্যাডারে জেহ্লে দিয়া চাহ্চা
নিহা হরতে চাহ্ন।' সেসব অনেক কথা। তার স্মৃতি এখন অতি ধূসর।

এরপর বহির্বাটি বা বৈঠকখানা, টিনের ছাউনিওলা আটচালা কাষ্ঠ মণ্ডপটি। তাতে প্রবেশের জন্য তিন চারটি সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হবে। প্রথমে দুপাশে দুটি আলিসওয়ালা, বসার বেদি। সাধারণ পলেস্তারার স্বাভবিক রঙ, গাঢ় লাল বর্ডার দেওয়া। তারপর চারদিক খোলা মণ্ডপটি। ঢুকেই বাঁহাতি পূব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত কাঠের নাট্যমঞ্চ, তার সামনে একখানা বড়ো মাপের তক্তোপোষ, উপরে শীতল পাটি বিছানো। তার সামনে একটি মানানসই মাপের টেবিল, উল্টোদিকে চেয়ার, টুল ইত্যাদি এবং দুইপাশে আলিসওয়ালা দুইটি বৃহৎ বেঞ্চি। এইসব আয়োজন মণ্ডপটির আধা অংশ জুড়ে। বাকি আধা অংশ, অর্থাৎ উত্তর দিকের ভাগটি ফাঁকা। সাধারণত নাট্যাভিনয়ের সময়, পুজোর ধুনুচি নাচ উপলক্ষ্যে অথবা সাংস্কৃতিক কোনো অনুষ্ঠানে শ্রোতা দর্শকদের বসার জন্য ব্যবহৃত হতো। এটির নাম বড়ো বৈঠকখানা। এর পশ্চিমপ্রান্ত অতিক্রম করলে, দুই সিঁড়ি নেমে, চার পাঁচ পা এগিয়ে, আবার দুই সিঁড়ি উঠে ছোট বৈঠকখানা, যেটির সামনে পেছনে প্রবেশ নির্গমনের দুইটি দরজা আছে। এঘরটিও সুন্দরী কাঠের ফ্রেমে শনের ছাউনিওলা এবং কাঠের দেয়ালে ঘেরা। ঘরটিতে চেয়ার, টেবিল, তক্তোপোষ সাজানো। মূলত একটি যাদুঘরের মতোই এই বৈঠকখানাটি এবং বাড়ির যুবজনদের জন্য ডরমিটরি হিসাবেও ব্যবহৃত।

BanglaBook.org

বড়ো বৈঠকখানার উত্তরদিকের ঠিক সামনাসামনি দূর্গামণ্ডপ, তার পশ্চিম পাশে সামান্য সাধারণ রোগব্যাধির জন্য একটি ডাক্তারখানা, তার পর দোলমঞ্চ এবং সর্বশেষ ঘরটি নিত্য পূজার মন্দির। এখানের অনুষ্ঠেয় পূজা রকমারি, যেমন শালগ্রাম শিলা, মনসা, সরস্বতী পূজা, শনি সত্যনারায়ণের 'বারের' পূজা এবং দেবিপক্ষে চণ্ডীপাঠ ও দোল ইত্যাদি। একমাত্র দোলমঞ্চটি পাকা এবং লাল রঙের সুন্দর একটি মঞ্চ। অন্য মন্দিরটি কাঠের ফ্রেম এবং টিনের ছাউনি শুধু সিঁড়ি কটি পাকা।

ছোট বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে বেশ খানিকটা হেঁটে অন্দরমহলে পৌঁছোনোর ঠিক আগেই একটি প্রকাণ্ড উঠোন, যেখানে ছোটবেলা আমরা বল খেলতাম। এই উঠোনটিকে মাঝখানে রেখে, প্রধান অন্দরমহল হলো আমাদের 'এল' আকৃতির বাড়িটি। একসময় একান্নবর্তী থাকলেও পরবর্তীকালে প্রধানত দুটি পরিবারে বিভক্ত হয়। এরা হলো সেই মামাতো পিসতুতো ভ্রাতৃদ্বয়ের বংশাবলি। এস্টেটির বিস্তৃতি এই তিন 'তুতো' ভাইদের আমলেই ঘটে এবং তৎসহ বাড়ির বিন্যাস, তথা জিলা সদরে একটি সুবৃহৎ বাংলো, যেখানে পরিবারের বড়ো ভাইয়ের পরিবারই কার্যত দখলদারি নেয়। এস্টেটের দ্বিতীয় পুরুষেই গোটা পরিবারটি মোটামুটি বিভাজিত এবং স্বার্থ কলহের সূত্রপাত।

উঠোনের দক্ষিণ এবং পশ্চিম পাশে আর একটি পরিবারও ছিল। তাঁরা থাকতেন একটি টিনের চালাওলা কাঠের ফ্রেমের বড়োসড়ো ঘরে এবং একতলা একটি পাকা বাড়িতে। এই তিন পরিবারের মৌলিক উপাধি যথাক্রমে, সেনগুপ্ত, গুপ্ত এবং দাশগুপ্ত। সঠিক জানা নেই, তবে দাশগুপ্তরাও সম্ভবত মূল পরিবারের আত্মীয়গোষ্ঠী। তাঁরা বহুকাল আগেই দেশত্যাগ করেছিলেন।

মূল বাড়িটির দোতলা অংশ পূবমুখী এবং একতলাটি দক্ষিণ। সব মিলিয়ে মোট ষোলটি ঘর, একটি সামনে তো দ্বিতীয়টি পেছনে। একতলা এবং দোতলায় মোট তিনটি দরদালান। প্রত্যেকটি ঘরে যথেষ্ট আলো হাওয়া ঢোকার সুব্যবস্থা রয়েছে। দরদালান এবং ঘরগুলি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রত্যেকটিই বিশালাকৃতির। সাধারণত, প্রাচীন কোঠা বাড়ির রীতি অনুযায়ী লোহার বিম এবং বর্মী সেগুনের কড়ি বর্গার উপর পেটানো সুড়কির ছাত দিয়ে তৈরি।

গঠনশৈলিতে মনে হয় বাড়ির একতলা অংশ আগে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেদিকের সিঁড়ির ধাপগুলি ছিল পাতলা ইঁটের এবং কোনোদিন যে তার উপর কোনো পলেস্তারা হয়েছিল এমন মনে হয়নি। গোটা বাড়ির বাইরের এবং

BanglaBook.org

ভেতরের পলেস্তারা (আমরা 'বাজু' বলতাম) ছিল শামুক, চুন, বালি, শঙ্খ চূর্ণ ইত্যাদির। দোতলার দিকে প্রবেশ পথটিই ছিল অন্দর বাড়ির প্রধান পথ। উঠোন থেকে অতি প্রশস্ত সিঁড়িগুলি উপরের ধাপে পর পর উঠে গেছে প্রায় প্রাসাদীয় অহংকারে যেন। একতলা দোতলা উভয় অংশের সিঁড়ির তলা দিয়ে পুরো সামনের অংশ বেষ্টন করে চওড়া প্রণালী। বর্ষাকালে সেখানে ছোটবেলা আমরা চ্যাং মাছ ধরতাম ছিপ দিয়ে। বাড়ির পিছনের দিকে যাবার পথ ছিল একতলা ও দোতলার সন্ধিস্থলের যেখান থেকে দোতলার সিঁড়ি উঠে গেছে, সেই স্থানটির পশ্চিম এবং উত্তরদিকের দুটি দরজা দিয়ে। পশ্চিম দরজা দিয়ে বেরিয়ে ডানদিকে গোলাঘর। সেই একই রকম টিনের ছাউনি, টিনের বেড়া এবং সুন্দরী কাঠের খুঁটি। গোলাঘরের মাটির মেজের মধ্যে বিশালকায় সব কালো ভুষো রঙের মটকি। সাম্বৎসরিক চাল রাখার জন্য। মট্‌কি হলো পোড়া মাটির মস্তো বড়োবড়ো সব জালা। খাবার চাল ডাল রাখার জন্য আগেকার দিনে ব্যবহার করা হত। এছাড়া গোলাঘরে থাকতো নানারকম সামগ্রী। এতোবড়ো সংসার, পরিবার এবং গোটাবাড়ি সচল রাখার জন্য অগুনতি আমলা-কর্মচারী, চাকর বাকর, দাসদাসী, রাঁধুনি-বামুন, এদের প্রয়োজনের নানান সামগ্রী, ভোজ্যবস্তু, কী থাকতো না সেখানে? গোলাঘরের পিছনে দিকেই এক পাশে একটি ঢেঁকিঘরও ছিল, আর ছিল তার সামনের দিকে একটি নিরিমিষ্যি রান্নার ঘর, বিধবা মহিলাদের পাকশালা। ঢেঁকি ঘরটি বাড়ির বধুদের প্রসূতি গৃহ উপলক্ষেও ব্যবহৃত হতো।

গোলাঘরের পিছনের থেকে বাড়ির সীমান্তচিহ্নের খালটির গভীরতা শুরু। সেই গভীরতা অনেকটা পথ অতিক্রম করে বড়ো খালে গিয়ে শেষ হয়েছে। এখান থেকে খালটির পথ অনেকটাই আঁকাবাঁকা। এই খালটিরই পথ ধরে গোলাঘর থেকে খানিক এগিয়ে গোয়ালঘর। সেখানে বেশ কয়েকটি গরুর থাকা খাওয়ার বেশ পাকা বন্দোবস্ত। ঘরটির মেজে পাকা এবং জাবনা দেবার নাদাগুলিও কংক্রিটের ছিল। আরও একটু আগে হাঁসের খোঁয়াড়।

গোলাঘরের বিপরীত দিকে যেখানে দোতলা অংশের শেষ অর্থাৎ বাড়ির পিছন দিক, সেখানে ছিল টানা টিনের ছাউনি দেয়া রান্নাঘর। ছাউনিটা নেমে এসেছে একতলার উচ্চতা থেকে। তার এক পাশে একটি ভিত ছিল সুড়কির এবং তৎসহ একটি সিঁড়ি। সেখানে কী ছিল শুনিনি, জানিও না। এরপর আম, কাঁঠাল, লিচু, নারকোল, সুপারি, নানারকম লেবু ইত্যাদির বাগান একেবারে

BanglaBook.org

পিছারার খাল অবধি। তার এক প্রান্তে বাড়ির মহিলা মহলের শৌচালয়। পুরুষদের জন্য সে ব্যবস্থা বড়ো বৈঠকখানা পেরিয়ে দক্ষিণদিকের পুকুরটি ছাড়িয়ে।

পিছারার খালটি বাড়ির দক্ষিণ পশ্চিম কোণের যেখানটাতে মোড় নিয়ে আরেকটি খালে পড়েছে, সেখানে দুইটি ভূঁইমালি বাড়ি। এদের বাসস্থান দেওয়া হয়েছিল এই বড়ো বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য। এরাও আমার অত্যন্ত ছোটবেলাতে দেশ ছেড়েছিল। তাদের আমি দেখেছি।

এতক্ষণ যা যা বললাম, তার অনেক কিছুই আমি দেখিনি, আবার অনেক কিছুই দেখেছিও। নাও যদি দেখি, হাজারবার গল্প শুনে তা দেখার বাড়া হয়েছে। এই সমুদয় ব্যাপারস্যাপার নিয়ে এই বাড়িটা ছিল এ অঞ্চলের বড়ো বাড়ি। দেলোয়ারকে নিয়ে তাই এতক্ষণ ঘুরে দেখাচ্ছিলাম। আসলে এর কিছুই না আমি দেখছিলাম, না দেলোয়ারকে দেখাচ্ছিলাম। দেখবো বা দেখাবো কী করে? বড়ো খাল থেকে শুরু করে পিছারার খাল পর্যন্ততো এখন আর কিছুই নেই, একমাত্র এই জীর্ণ বাড়িটা ছাড়া, বাকিটা সব ধানক্ষেত। ব্রিজের ওপর দাঁড়ালে সবটাই এক নজরে দেখা যায়। শুধু বড়োবাড়ি নয়, গোটা অঞ্চলটাই যেন সৃষ্টিপূর্ব কালের মহাশূন্যতায় লীন হয়ে যাচ্ছে।

গোটা দিন আমি 'বিধুমুখি' ল্যান্ডিং ঘাটের সম্ভাব্য অবস্থানটি থেকে আমাদের একুশ বিঘা খানাবাড়ির প্রায় প্রতিটি অঞ্চল ঘুরে দিলুকে এই বিশাল গৃহস্থালির কোথায় কী ছিল সব কিছুর বর্ণনা দিচ্ছিলাম। একুশ বিঘার ব্যাপারটার রশি ধরে মাপ জানা নেই। তবে সামগ্রিক আয়োজনের মধ্যে যা যা উল্লেখ করেছি এবং যা যা বাকি পড়ে গেছে, তার সংকুলানের জন্য জমির মাপ দু'এক বিঘা বেশী বই কম হবে না। কারণ, এর মধ্যে বেশ কিছু এলাকা জলাভূমি, কিছু সবজি ক্ষেত, আরো গোটা দুয়েক বড়োসড়ো পুকুর, ডোবা, নালা, আম, কাঁঠাল, নারকোল, সুপারির বাগান, এইসব বলতে তো ভুলেই গেছি। কিন্তু গোটা এলাকাটা এখন দেখাচ্ছে ছোট্ট একটা ধান ক্ষেতের মতো।

সব শুনে দিলু বললো, এ্যার লইগ্যাই বাড়িডার নাম বড়োবাড়ি, নাকি কও?

—না, আরও অনেক কথা আছে। এহন সয়ন্দ্যা লামছে, এবার ফেরন লাগে। সব কথা কইয়া শ্যাষ করন যাইবে না। এট্টা বাড়ির 'বড়ো বাড়ি' হইয়া ওডোনের পিছে কতো মানুষ আর কতোরকমের যে কাণ্ড থাহে হেয়ার কি শ্যাষ

BanglaBook.org

—চোধ্‌রি বাড়ির কতায়ও তুই এই সব কইছিলি। দ্যাখ, মুই হাল্‌ইয়া চাষার পো হালইয়া চাষা। অইত্যাচার অন্যায় কী হেয়া একছের জানি না হেয়া তো না। দেখছিও কিছু কিছু, বয়সতো কোম অয় নায়। তয় এট্‌টা কতা মোর তমোও মনে অয়। বড়ো এট্‌টা কিছু হওনের লইগ্যা অন্যায় অইত্যাচারেরও কিছু দরকার আছে মোন লয়। তয় হেয়ার বিরুদ্ধে ফৈজত-লড়াই করনের বুদ্দিডা, সাহসটাও কিন্তু শেহায়, এইসব বড়ো বাড়িগুলার মাইনসেরাই কেউ কেউ।—কথাটা তার চিন্তার দিক দিয়ে একটু অভিনবই, তথাপি দিলুর কথার মধ্যে হয়তো কিছু যুক্তি আছে, কিন্তু তাতো সামাজিক দিক দিয়ে সুবিধেজনক অবস্থায় থেকে শিক্ষা দীক্ষা লাভের বা চিন্তাচিন্তনের কল্যাণেই তাঁদের মধ্যে স্ফুরিত হয়। অত্যাচারিতের সেই সময় বা সুযোগ কোথায়? বড়ো চিন্তা তাদের মধ্যে জন্ম নেবার উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি করার প্রচেষ্টা হয়তো এই উচ্চবর্গের কেউ কেউ করেন, সার্থক ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার দৃষ্টান্তও তাঁরা তৈরি করেন, কিন্তু তামসতো থেকেই যায়। শুধু আশাবাদের বাণীতেই কী তা দূর হয়? না কোনো নির্দিষ্ট অবস্থাকে পুরোপুরি বদলাতে পারে?

অন্যায় অত্যাচারীরাই শুধু পরিণামে ধ্বংস হয় এবং অত্যাচারিতরাই বিজয়ী হয়, এরকম নীতিবাক্য শ্রবণসুখকর হলেও, বাস্তবে এর কোনো সত্যতা নেই। আমরা দুজনে এরকম সব বড়ো বড়ো দার্শনিক কথা বলতে বলতে ব্রিজটা পেরিয়ে এক বুক কাদাভর্তি জল স্রোতহীন খালটার পার ধরে দিলুদের গ্রামের দিকে ফিরতে লাগলাম। একুশ বিঘার বড়ো বাড়িতে বা ঐ গ্রামটিতে আমার জন্য কেউ অপেক্ষা করে ছিল না। দিলুদের বাড়িতে চাচি-আম্মা এবং অন্য সবাই আমার অপেক্ষায় আছে। এতক্ষণে চাচি নিশ্চয় চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছেন। হাই এবং তার স্ত্রীও এতক্ষণে এসেছে হয়তো।

BanglaBook.org

।। চার।।

খানিক এগোতে আবছা অন্ধকারে 'ছোডো মেঞা' অর্থাৎ হালিমকে দেখা গেল উল্টো দিক দিয়ে আসছে। বোধহয় আমাদের দেরি দেখে খোঁজ নিতেই আসছে সে। তার হাতে একটা বড়োসড়ো টর্চ, যদিও তখনো সেটার ব্যবহার করার মতো অন্ধকার নামেনি। কাছে পৌঁছোতে বলল, দাদিজানে আইথে কইলেন। খুব গোসা করতে আছেন। কয়েন যে তুই টর্চটা লইয়া এট্টু আউগ্‌গাইয়া দ্যাখ্‌ছেন পাডা দুইডা আছে,র আছে না কী? আন্দারে গত্তে পড়ে, না ব্যাড়ে পড়ে হেয়ার দিশা পাইবে হ্যানে ক্যামনে?

দিলু একটু হেসে ছেলের মাথায় একটু হালকা চাপড় মেরে বলল, তো হেইতালে আপনেও মোগো এট্টু 'পাডা' কইয়া লইলেন, ক্যামন?

—বঅঅ, মুই কইলাম নাহি, দাদিজানে তো—

— বোজলাম, তয় মোরাতো পাডা ঐ।

—থামেন দেহি, আপনে য্যান্ কী।—ছেলে আমার উপস্থিতির জন্যই লজ্জা পাচ্ছে বুঝলাম। তবে এই মাধুর্যটুকু বেশ লাগলো এবং সারাদিনের পরিক্রমা তার স্মৃতি রোমন্থনজনিত ক্লান্তি এবং ভারাতুর অবস্থাটা হাল্কা হয়ে এলো অনেকটাই।

চলতে চলতে দুএকটা কথায় বুঝলাম হালিম আমাদের আলাপ আলোচনায় কৌতূহলি। ওর মনের মধ্যে আমার বিষয়ে নিশ্চয় একরাশ প্রশ্ন আছে। তার মধ্যে একটা প্রশ্ন বার দুয়েক সে করেছে, "তয় হ্যারা হিন্দুস্থানে গ্যালে ক্যা" জাতীয়। প্রশ্নটার উত্তর পরিষ্কারভাবে তখনকার দিনে জানতাম না। আজও তৎনগদ সন্তানকে দেওয়ার মতো উত্তর দিলুর বা আমার কারো কাছেই নেই। দিলুর কথা জানি না, তবে প্রশ্নটা মাথার মধ্যে সারাদিন ধরেই ঘুরপাক খেয়েছে। সত্যিইতো, আমরা হিন্দুস্থান গেলাম কেন? এপ্রশ্নের উত্তর যারা এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে তাদের কাছে নানাভাবে শুনেছি, নিজের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নানাসময় নানা উত্তর মাথার মধ্যে ভিড় করেছে। কখনো দাঙ্গা, কখনো দেশভাগ, কখনো অর্থনৈতিক সমস্যাকে এর কারণ হিসাবে ব্যক্ত করেছি। এই সবই হয়তো স্থান বিশেষে হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ, অথবা এগুলোকে ঠিক কারণ না বলে কন্‌ডিশন্‌স বা কারণাংশ বলাই শ্রেয়। এর সবগুলো মিলিয়ে কী কারণটা সৃষ্টি হয়েছিল? তার পিছনে কী একটা বীজ কারণ ছিল না? যদি না থাকে তাহলে গোটা দেশের

BanglaBook.org

হিন্দুরা এখনও পা-তুলেই বা আছে কেন? সর্বত্রই তো খুন উচ্ছেদ হয়নি। এই পশ্চিমমুখী পা-তুলে থাকার পিছনে কি দেশভাগের বীজ কারণটি আত্মগোপন করে আছে, যা হিন্দুদের প্রকাশ করে বলার মানসিকতায় কখনোই স্বচ্ছ থাকে না? যে স্বচ্ছতা থাকলে হিন্দু স্বীকার করতো যে সে ঐতিহাসিক কাল ধরেই একটা আর্য পিতৃভূমির প্রতিষ্ঠা চেয়েছে এবং তার সমাজদেহে মাত্রাতিরিক্ত সাম্প্রদায়িকতার উপদংশ সেই কারণেই ব্যাপক, সেই স্বচ্ছতা তার মানসিকতা থেকে যেন নির্বাসিত। আর মুসলমান সমাজওতো স্বচ্ছভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না, বা বলতে পারছে না যে পাপ সেও করেছে। ইতিহাসের কোন্ পর্বে ব্যক্তি হিসাবে বা সম্প্রদায় হিসাবে, গোষ্ঠী বা জাতি হিসাবে কে কী পাপ' করেছে। তার নির্ণয় বড়ো সহজ নয়।

মুসলমান সমাজ উপমহাদেশের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম বা আন্দোলনের সময় অস্বচ্ছতার এই মানসিকতাটি হিন্দুর কাছ থেকে রপ্ত করেছে. তবে সৌভাগ্যবশত উভয় সমাজেই এই নিয়ে দ্বন্দ্ব এখনো বিদ্যমান। সে দ্বন্দ্ব স্বচ্ছতা, অস্বচ্ছতা বিষয়ক। আশা, দ্বন্দ্ব-বিরোধ যখন আছে তখন সমন্বয় একদিন ঘটবে।

সুতরাং হালিমের প্রশ্নের সহজ সরল উত্তর আজও পর্যন্ত আমার কাছে নেই। এনিয়ে বিতর্ক তুলতে গেলে আমরা সাধারণত, একে অন্যকে দায়ী করি মাত্র, সত্য উদ্ঘাটন হয় না। তার চাইতে এই আমার বেশ বা আমাদের মতো মানুষদের পক্ষে ভাল, এরকমই ভাবছি এখন। অতো ইতিহাস ঘাঁটতে এখন মন চাইছে না।

ছেলেটাকে আমার বড় ভাল লেগে গেছে। নিজের ঐ বয়সের দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। ও যখন শুনল আমি ওদের গ্রামের ইস্কুলেরই ছাত্র ছিলাম একসময়, ওর দাদা আমাকে কিশোরকাল থেকে জানতেন, ভীষণ আপন হয়ে গেল সে খানিকক্ষণের মধ্যেই। আমি তার কাছে কাকা থেকে চাচা নয়, চাচু হয়ে গেলাম। একানকার লোকদের আত্মীয় হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটা অভিনব। সে ব্যাপারে সব বয়সী মানুষই সমান স্বভাবের। শিশুরা যেমন খুব সামান্য কারণেই কাউকে আপন বলে গণ্য করে, বা সহজেই অভিমানে কিম্বা রাগে বিরূপ হয় এখানের সব বয়সী মানুষেরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তেমনই। এ আমি ছোটবেলা যেমন দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম, এখনও কোনো তারতম্য তেমন দেখছি না।

BanglaBook.org

হালিম রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎই আমার ডান হাতখানা ধরে বললো, চাচু, টর্চটা আপনে হাতে লয়েন, আন্দার অইছে। নাইলে অসোবিদা অইতে পারে।

বললাম, তোমার আববুও মোর ল্যাহান আদ্‌বুড়া। হ্যার অসোবিদা অইবে না?

—না, মোগো তো এ পোথ মুহুস্থ। মোগো কোনো সোমোস্যা অইবে না। আসলে পানি না থাকলেও খালডার দিগটা নীচা তো, বেখেয়ালি পড়ইয়া যায়েন যুদি?

দিলু বলে, তোর চাচুরও এই পোথ মুহুস্থ।

এই পথ আমারও যে মুখস্থ সে কথা কি আজ আর দিলুর মতো জোর দিয়ে আমি বলতে পারি? সে একদিন ছিল যখন এইখালের দুই পারের যত গ্রাম আছে সব গ্রামের পথ বেপথ আমার মুখস্থ ছিল। আজতো সেইসব পথই আর নেই। দিলুকে বললাম, যে পথটা আমার মনে আছেলে, এডা কি হেই পথ যে মুহুস্থ থাকপে? এই খাল পারডা কতহানি উচা আছেলে আইজতো আর হেমন দেহিনা। এহনতো বাও দিগের খ্যাতের লগে পেরায় সোমান। মইদ্যে মইদ্যে জমিতে জল ঢোকোনোর জান আছেলে, হেয়ার এটটাও নাই। আওনের সোমায় তো দ্যাখলাম যে ছোডো খালডা তোগো তারুলি গেরামের এমাথা থিকা শুরু অইয়া মাজা ব্যাহাইতে ব্যাহাইতে, একবার এদিক, একবার ওদিক করতে করতে শ্যাষতক গাবখানের গাঙ্গে পড়ছে, হেই খালডার কোনো চিন্নই নাই। অথচ ঐ খালডা ধরইয়া ডোঙায় হেসব দিনে আমরা হারা তারুলি গেরাম, রামনগর, আনন্দকাডি বেয়াক জাগা ঘুরইয়া আইথে পারতাম।

দিলু নির্বিকারভাবে বললো— হেসব হুগাইয়া গ্যাছে কঅবে, হেয়া মনেও নাই। তুই কইলি হে কারণ মোনে পড়লো।

—আচ্ছা, এই যে খালগুলা বেয়াক শুকাইয়া গেছে, মাইনসের হেতে কতোডা অসোবিদা হেয়া কেউ ভাবে না?

—না। য্যারা ভাবতে, হ্যারগো মইদ্যের হিন্দুরা দ্যাশ ছাড়ইয়া চলইয়া গ্যালে হিন্দুস্থান, আর মোগো মোছলমানেগো মইদ্যের য্যারা এইসব খাল, খালের পানি আর সোতা লইয়া বাচতে, হ্যারা মরইয়া শ্যাষ অইয়া গেলে। এহন এসব লইয়া ভাবোনের মানুই আর নাই। হালিম জিজ্ঞেস করলো, ক্যা? এরহম অইলে ক্যালায়?

BanglaBook.org

—তুই থাম দেহি বলদার পো আবাল। খালি তালাস, হ্যারা হিন্দুস্থান গ্যালে ক্যা? এডা এরহম অইল ক্যা? ওডা ওইরহম অইল ক্যালায়?

আমি বললাম, দিলু, পোলার কথার জবাব দিতে না পারলে দিস না, তয়, অরে গাইল, খামার, ধাবার দিয়া লাভ নাই। এইসব কথার জবাব দেওয়ার লইগ্যা আমাগো দায় আছে, ওর আছে জানতে চাওয়ার ষোলআনা হক।

—বুজি, তয় জবাব জানি না যে। তুইতো ল্যাহাপড়া জানা মানু, কয়দিন থাকপিও, আম্মারে তহন যেমন কইলি। তুই যদি এডারে এই কয়দিন এট্টু বুজইয়া দিয়া যাইতে পারো দ্যাখ। মুই বুজি অনেক কিছুই তয় গুছাইয়া কইথে পারি না। এডা অইছে আবার পড়উয়া চাষা। খালি জিগাইতেই থাহে।

— হেতো ভাল কথা। তয় বাজান, তোমার কী পড়থে ভাল লাগে? আমি জিগাই, কোন্ বিষয়ের বইপত্তর পড়ো তুমি?

—বাড়ি লয়েন দেহামু হ্যানে মোর বই পত্তর।

পনেরো ষোল বছর বয়সের এই প্রান্তিকতম জনপদের ছেলেটি আমাকে তার ভাললাগার, আকর্ষণের বইপুস্তক দেখাবে। কথাটা শুনেই আমার ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে ইচ্ছে হল। গোটা দিন শুধু নেই, নেই, নেই এর মথিত বেদনার মধ্যে হালিম তার টর্চটার মতোই যেন আলোকবিন্দু হয়ে এই ভূমির ভবিষ্যৎ উত্থানের আশার বাণী শোনাবে আমাকে, এরকম এক স্বপ্নের দোলায় দুলতে দুলতে ওদের সঙ্গে চলতে থাকলাম।

।। পাঁচ ।।

চাচি আম্মার বয়স যাই হোক শরীর গতিক বেশ ভালো। একটু বেশি ভালো তাঁর অনবদ্য জাড্যপহারিণী 'খামার'। অবশ্য সে খামারে ব্যাডাগো খামারের প্যাহান আইষ্ঠা (আমিষ জাতীয়) গোন্দো নাই। মজার ব্যাপার চাচি কদাপি মা-বাপ তুলে খামার দেন না, অন্তত আমার ক্ষেত্রে। ব্যাপারটা জানা ছিল, তবে দীর্ঘ অসাক্ষাৎজনিত কারণে ভুলে গিয়েছিলাম। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে তাঁর সালংকারা গাইল খামারে বড়ো তৃপ্তি পেলাম বহুদিন পর। এ জিনিসের সোয়াদই আলাদা। আমাদের সব ঘরের পরের বাড়ির 'বিডিরা' অবশ্য কারণে অকারণে সদা সর্বদা আমাদের কথার আগুনে বেগুনপোড়া করে ছাড়েন, তাতেও যথেষ্ট না মনে হলে নুন লঙ্কা দিয়ে জাড়িয়ে নেন। সে বস্তু ভিন্নাচার। কিন্তু আহা, চাচিদের এবস্তু যে কতোকাল পরে প্রাণ জুড়িয়ে দিল, তা আর কারে কই?

BanglaBook.org

একটা পুকুরের পাশ দিয়ে বাড়িতে ঢোকার পথ। বুড়ি সেখানে ঘাটের পৈঠায় হাতে একটি কুপি নিয়ে বসে প্রাণ খুলে তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করে চলেছেন। হালিম বললো, খাইছে।

দিলু গলা খাটো করে বললো, ফোকাচ্ মার। বুঝলাম দিলু এখনো তার মাকে বেশ ভয় পায়। ছোটবেলা একবার চাচি একখানি বাখারি দিয়ে ওকে এমন মার দিয়েছিলেন যে সারা পিঠে তার দাগ বোধহয় এখনো খুঁজলে পাওয়া যাবে। আমারই একটা নালিশের জন্য তাকে ঐ শাস্তি পেতে হয়েছিল। দিলু আমাকে মালাউনের পো মালাউন বলেছিল। সেই প্রহারের পর আর কোনোদিন দিলু আমাকে মালাউন তো ভালো কোনোরহমই গালই দেয়নি।

মুখে টর্চ পড়তে চাচির হাঁক, এ্যাই কোন্ 'রেজালার' বাচ্চা মোর মুহে টর্চ মারো, অ্যা? হালিম বললো, মুই হালু দাদিমা।

—ও, হালু দাদো, মুই ভাবি কোন্ ত্যান্দর বান্দর পোলাপান বুজি মোরে টালায়। তো হেই বলদা দুইডারে পাইছো? কি করতে আছেলে দ্যাখলা?

—প্যাচাল পড়তে আছেলে আর কী? এখনো থামে নায়।

—কীয়ের প্যাচাল? গ্যাদা বয়সের কেরউয়ামি বুজি এহনও যায় নায়?

—হ। হুন্ইয়াতো হেইরহমই বাসি। ওরে প্যাচাল বের প্যাচাল।

—তো হ্যারা আইলে না আইলে না?

—আইছে তো, তোমার খামারও হোনছে। তুমি এ্যারগো অ্যাতো খামরাও ক্যা?

—হেয়া কী আইজ নয়া কিছু? হেয়াতো হ্যারাগো গ্যাদাকাল থিক্যা খামরাইতে আছি। তয় হেথে কোনো লাভ অইলে না।

—তয়, বেহুদা খামরানের দরকারডা কী?

—ওয়া অইব্যাস। মোরও খামার দেওন অইব্যাস, হ্যারগোও খামার খাওন অইব্যাস। নাইলে হ্যারাও ভাল ঠেহে না, মুইও না।

—হেলে খামরাও। এই যে হ্যারা আইয়া পড়ছেন।

বুড়ি আবার মনের আনন্দে খামার বৃষ্টি করে চললেন। মা মধ্য আশি, ছেলেরা ষাটোর্ধ। বড়ো অপূর্ব এই শাসনলীলা। তবে একথা হলপ পড়ে বলতে পারি এমন তৃপ্তি বহুকাল পর।

আমার একুশ বিঘার বসতে গোটাদিন যা পাইনি এখন চাচির কাছে বসতে তা পেলাম। অন্ধকারে, সামান্য কুপির আলো অন্ধকারকে যেন আরও প্রকট করে তুলেছে। চাচি হাতড়ে হাতড়ে মাথাটার নাগাল পেয়ে যান। হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, টাক পড়ছে মোন্ লয়, বাপের ল্যাহান?

BanglaBook.org

—হ। তয় বাপের থিহা মাপে কিছু ছোডো।

—হেয়া কও কী? বয়স কত অইছে যে টাক পড়লে?

—ঘাইট ছাড়াইছে। এহন আর গ্যাদা কইথে পারবা না।

—ঝাঃ। কও কী? হেয়া অয় ক্যামনে?

দিলু বলে, অয়। অইবে না ক্যান? জ্যান্ত যারা হ্যারগো বয়স কেরমে কেরমে তো বাড়বেই। খালি য্যারা মরইয়া ভূত, হ্যারগো বয়সের বাড়ন নাই।

এসব সংলাপ, হাসি ঠাট্টা, শুধু ভাষায় নয় ভাবে ভঙ্গীতেও আঞ্চলিক রসপুষ্ট। নাগরিক পরিমণ্ডলে এর কদর বা চল নেই বলে আমি সদা মুখিয়ে থাকি, কতদিনে এরকম পরিবেশে একবার অন্তত এসে স্নিগ্ধতায় সিক্ত হতে পারি। এনিয়ে ঘরে পরে আমার অনেক জবাব, অনেক কৈফিয়তের ফৈজত পোহাতে হয়। কিন্তু এর জন্যই সদাসর্বদা আমার প্রাণ করে হায় হায়। এখানের এই আবাল্য পরিচিত, মাঠ, মাটি, ঘাস, লতাগুল্ম, পাখ-পাখালি, কীটপতঙ্গ সব কিছুই রক্তের মধ্যে নিজের মত নিঃসাড়ে বহমান থাকে। এর রহস্যময়তা ছেড়ে, শারীরিকভাবে দূরে চলে গেলেও, মানসিকতায় তাদের উপস্থিতি যেন কখনোই নিঃশেষ হয় না। পৃথিবীর এই রূপ, এই রস খোঁজার অন্য ঠিকানা আমার জানা নেই। ঘাটের পৈঠায় বসে আমরা চারজন। পরশু লক্ষ্মীপুজো। চাচিকে বললে, বললেন, বাড়িথে এহন য্যারা আছে পুজা দে?

—ঐ কোনোরহম। অবস্থাদিতো ভালো না। এবারও করছে দ্যাখলাম। মোণ্ডপতো নাই, বাড়ির মইদ্যেই এট্টা ঘরে পিরতিমা রইছে একখান দ্যাখলাম। ঐ বোধহয় একবারই বানাইয়া থুইছিলে। বুরান-টুরানতো নাই আগের মতো।

—লক্ষ্মীপূজা করবে না?

—হ। যাইতে কইছে পরশু সয়ন্দ্যায়।

—যাবি?

—ভাবছি দিলু বা হালু যদি লগে যায়, একবার ঘুরইয়া আমু হ্যানে।

—যাইবে হ্যানে। আইছো যহন। বাপদাদার পোতা, দেইখ্যাই যা।

-ভাবছি। তয় মোনডা বড়ো খারাপ লাগে। কতো কথা যে মনে পড়ে।

-পড়বে না? মোরা য্যারা বুড়াধুরা, হ্যারা শ্যাখ্ অইলেও মোন টাডায়। মোগো অবইশ্য টাডানডা ঠিক না।

—ক্যান্, ঠিক না ক্যান? মোন টাটাইবে পুরাণ দিনের লইগ্যা, হেয়ার আবার ঠিক বেঠিক কী?

—হ, হেই কই।

BanglaBook.org

দিলু, বলে উঠলো, মোরা শ্যাখনা তয়? মোগো কী বুত্‌পরস্তির লইগ্যা মোন টাডান উচিত? গুণা অয়না? বোঝা গেলো দিলু তার মাকে খেপাতে চাইছে। কিন্তু বুড়ি খেপলেন না। বললেন,— হে কতানা, মুই কই রহটের কতা। একবার তোগো দিঘির পারে পূজার পর গুণাবিবি অইবে, তো তোর চাচারে কইলাম, মোরে এটটু হুনাইয়া আনবেন? মোর বয়স তহন উঠতি। মোগো সোমাজে তো বেপরদা হওন গুনাহ্। হেয়াও আবার গুণাবিবির জারির আসরে, যাইয়া গান কেসসা শোনোন ব্যাডাগো লগে। ওরে সব্বোনাশ।

—তো গ্যালা?

—হঅঅ। অইছে কী—বৃদ্ধা কিশোরী বধূর লজ্জায় যেন ফিরে গেলেন। চাচার দৌলতে কীভাবে তিনি সেবার জীবন সার্থক করেছিলেন, সেই গল্প বলতে বলতে তাঁর কেমন যেন আত্মহারা দিশেহারা একটা ভাব হল। সেই ভাব আমার নস্ট্যালজিয়ার সঙ্গে মিশে একটা অদ্ভুত মোহ বিস্তার করল। হালিম তার দাদির গল্প শুনে যথেষ্ট আমোদ পাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলো, ব্যাডাগো মইদ্যেই বইছেলা?

—ধুরও জালিমের পো।

দিলু বললো, মোরে টানো ক্যা? ক্যারগো লগে বইছেলা হেয়া নাতিরে কও।

—মাথারিগো লগেই বইছি। য্যার লগে গেছেলাম হেনায়ই ব্যবস্থা করইয়া রাখছেলেন। বইছেলাম সোনা ঠাইরেনের লগেই।

—হেনায়তো জমিদার বাড়ির বৌ। তুমি অইলা কদম চাষার আওরত। তোমারে হেনারা বইতে লইলে?

—লইবে না ক্যান্? হেনার লইগ্যাইতো মুই সুযোগটা পাইলাম।

বুড়ি বাপবেটার ফিচকেমি বুঝতে পারলেও ফাঁদে পা দিচ্ছিলেন না। বলে চললেন তাঁর সেই অসম্ভব সৌভাগ্যের কথা। তখনো আমাদের মুসলমান সাধারণ চাষি গৃহস্থ মেয়ে বৌ এরা কট্টর পর্দায় থাকতেন না। একটু পয়সাওলা গৃহস্থ এবং শরিয়তি তালিবি যাঁরা, তাদের কথা স্বতন্ত্র। শরীয়তে পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে স্পষ্ট বিধিনিষেধ রয়েছে, তা যেমন পুরুষদের তেমনই মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। বলা হয়েছে পুরুষেরা পোষাক পরবেন নাভি থেকে জানু পর্যন্ত আবৃত করে। শীত ও গ্রীষ্মে কষ্ট না হয় এমন পোষাকই পরতে হবে। জাফরান্ জাতীয় দু'একটি রঙ পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ। নারী সবরকম রঙই ব্যবহার করতে পারবে। রেশমি বস্ত্র নারী ব্যবহার করতে পারবে, পুরুষদের জন্য তা হারাম। নারীর পোষাক

BanglaBook.org

ব্যবহার প্রধানত লজ্জাশরম রক্ষা সংক্রান্ত। মুসলমানী ধর্মীয় ঐতিহ্যে টুপি, পাগড়ি ইত্যাদি পরা বিধিসম্মত। লোক দেখানো, অপব্যয়মূলক, অকারণ সৌন্দর্য প্রকটনকারী বা গৌরব সূচক পোষাক ব্যবহার নিষেধের আওতায়।

নারী লজ্জা পরিত্যাগ করবে না। শরীরের গোপন অঙ্গ প্রদর্শন করবে না, শারীরিক এবং মানসিক পবিত্রতা রক্ষা করবে। এটাকেই প্রকৃত প্রস্তাবে পর্দা বলে অভিহিত করা হয়েছে বলে অনেক ইসলামি পণ্ডিত মনে করেন। এইসব বিধি পালন করে তারা যুদ্ধে পর্যন্ত অংশগ্রহণ করতে পারে।

দিলু দেখলাম এসব বেশ ভালই জানে। সে চাচির পর্দার প্রশ্নে বেশ একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেলে যেন। কিন্তু আখরি কথাটা বলেন চাচি, বলেন, হ জানিতো। কিন্তু হুজুর বুজুর্গেরা মিলাদ মাইফেলের সোমায় যে ফতোয়ার পর ফতোয়া দিয়া ডর দ্যাহায় হেয়ার কী? আর পোষাক আসাক? হেকালে মোগো জোটতে কী? হারা বছরে একখান ত্যানা জোডাইতে মেঞার যাইতে হোগা ফাডইয়া। এহন তুমি মোরে পর্দা শেহাও? যাদের পরণের সাধারণ পোষাকই জুটতো না, তাদের আর পর্দার কড়াকড়ি থাকবে কী করে?

হালিম দাদিকে ছাড়ে না। বলে, তয় কী তুমি বেপর্দা আওরতের ল্যাহান গ্যাছেলা?

—বেপর্দা যামু ক্যালায়? হিদ্‌নাইতো সোনা ঠারইনের ধার দিয়া একখান কাফুর তোমার দাদাজানে পাইছিলেন। একছের নয়া। হেইহান পরইয়াইতো গেলাম।

দিলু, দাদি, নাতির কথার গতি দেখে সেখানে থাকা আর সমীচিন বোধ করলো না, বললো, তয় তোরা এহানে হইয়াই কথা গপ্পো কর। মুই দেহি শাশুরির আল্লাদের ছোডো পুতের বৌ নি এট্টু চা-পানির ব্যবস্থা করেন।

বলে সে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। চাচি বললেন, যাইতে আছেন। এ হেন যাইয়া হ্যানে বৌডার মাথা খাইবে। ওডা আর মানু অইলে না।

বললাম, এটটু চা অইলে খারাপ অইতে না। দিলু ভাল কামেই তো গ্যাছে। নাকি তুমি খাবা না?

—মুই দুইবার চা খাই। এই অইব্যাসটা তোর চাচায় করইয়া দিয়া গেছে। হেনারে অইব্যাস ধরাইছেলে তোর বাপে। তয় হেকালে যে চা মোরা খাইতাম

BanglaBook.org

হেয়ার সোয়াদ আর বাস এহনও নাকে লাইগ্যা রইছে। হালিম বললো, তয় বুজি তুমি আউজগা তিনবার খাবা?

—হেয়া যুদি তোর মা বিড়ি দে, না কমুনা। এয়া অইলে খোশ্ মেজাজের বস্তু। অইজতো এটটু খাওন লাগে।

—আউজগা খোশ্টা কিয়ের?

—ক্যান্। এই যে মোর বাজানে আইছে?

কোলকাতা থেকে ভাল চা পাতা এনেছিলাম কুটুমবাড়ির জন্য। ঝোলাব্যাগে প্যাকেটটা ছিল। এদেশের চা খারাপ না, তবে গ্রামে তা জোটা ভার। তাছাড়া গ্রামে এখনো চা বস্তুটা তেমন নিত্য প্রয়োজনীয় নয়। আমি ভীষণভাবেই চা আসক্ত। সেই চা থেকে খানিকটা দিলুর বৌ-এর কাছে দিয়েছিলাম। অবশ্য নিজের গরজেই।

বুড়ির প্রায় প্রত্যেকটি কথার অনুষঙ্গেই পুরোনো কিছু গল্পের আভাস থাকছে। তার কিছু কিছু সবিস্তারে বলছেনও। হালিম তার প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে। সাগ্রহে সেইসব শুনছে। যেমন গুণার গানে যাওয়া, শাড়ি এবং সোনা ঠাইরেন বৃত্তান্ত। ছেলেটার কৌতূহল অপার। বাপ কাকাদের বাল্যকালের শোনার আগ্রহ কাহিনী আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিশেষ থাকে না। তারা বাইরের জগত এবং বন্ধুবান্ধবদের ব্যাপারেই পুরো কৌতূহলটা রেখে দিয়েছে। হালিম এখনও গ্রামীণ জীবনের মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন আছে। সে তার দাদিকে অসম্ভব ভালবাসে দেখলাম। কাপড় সংক্রান্ত কিসসাটা শোনার তাগিদ যে তার রয়ে গেছে, সেটা বুঝলাম তার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসায়। জিজ্ঞেস করলো, তয় কী দাদাজানে তোমারে খয়রাতইয়া কাপুর পিন্দাইয়া গুণা হোনাইতে নেলে?

—খয়রাতইয়া অইবে ক্যা? সোনাঠাইরেন মোরে ভাল বাসইয়া আগে দেছেন কতো। পরে যহন অবস্তা পড়ইয়া গ্যালো, তহনতো হেনার নিজেরও জোটতে না। আসলে মোরগো হেনারাতো খুবই ভাল পাইতেন। সোম্পোক্কোডাই আছেলে অইন্য কেছেমের।

—মোর দাদায়তো আছেলেন একছের গরীবের গরীব হালইয়া চাষা। আর হেনারা আছেলেন বড়লোক জমিদার, সোম্পোক্কডা অইলে ক্যামনে? হ্যারা কী মোগো লগে ও ডোন, বওন, খাওন এসব করতেন?

—না। হেয়া করে ক্যামনে? দ্যাশাচার, লোকাচার যতডুক মানার হ্যারা মানতে

BanglaBook.org

ঠিকোই, হে বাড়িথেও নানান কেছেমের মানুষ আল্হে। তয় বেয়াকেতো সোমান না। হিন্দু সোমাজের অনেক কিছুই খারাপ, হেয়া ঠিকোই। কিন্তু হেয়ার মইদ্যেও তো ভালোমোন্দো আছে। শ্যাহে গো য্যাতো নিয়মকানুন হেয়ার বেয়াক কী ভালো?

আমি হালিমকে বললাম, হালিম এসব আলোচনা যাউক। তুমি বরং গল্প শোনো দাদিমার ধারে। আমি দুএকখানা বইএর নাম তোমারে দিমু হ্যানে। ঝালকাডির বইয়ের দোকানে পাবা হ্যানে। হেগুলা পড়লে তোমার অনেক অনেক কথার জবাব পাবা। এহন দাদি কী কয় হেয়া শোনো। তয় একটা কথা তোমারে কই, আগের দিনে যেসব কু-আচার আছিলো এহন কিন্তু হেয়ার অনেকটাই বদলাইয়া গ্যাছে। মানুষ যতো বদলাইবে নিয়মও বদলাইবে।

—কিন্তু মুই কৈলোম এট্টু ভিন্নভাবও ঠেহি।

— হেয়া ক্যামন?

—হিন্দুগো যেসব ছোয়া-ছানা, জাইত পাইত, মাইনসের লগে অস্সুরিদ ভাব, যেয়া মোরা মুসলমান সোমাজে নাই কইয়া জানি, হেয়া কৈলোম মোরগো কেরমোশো হিন্দুগো ল্যাহানই অইতে আছে। অথচ মোরা ঐসব ব্যাফারগুলারেই হিন্দুগো স্বভাব কইয়া সোমালোচোনা করতাম, এহনো করি।

হালিম যে এতটাই গভীরভাবে সমাজকে পর্যবেক্ষণ করে, সেটা ওর বয়স এবং অবস্থান বিচার করলে অবাক হতেই হয়। আগেই বলেছি ছেলেটি বুদ্ধিমান এবং পড়াশোনা করে। তার বই-এর সংগ্রহ এখনো আমার দেখা হয়নি। সেটা সে দেখাবে বলেছে। বড়োই আনন্দ পাচ্ছি এই প্রায় উৎসন্নে যাওয়া অঞ্চলে ওর মতো চিন্তাশীল একটি কিশোরকে পেয়ে। যদি আমার এই সাহচর্য দীর্ঘকালের জন্য বরাদ্দ হতো!

হালিম কথা ঘোরায়, জিজ্ঞেস করে, চাচা, কাইল আপনের পেলান কী? কোথাও দূরে যাইবেন, না আশপাশ ঘোরবেন?

বলি, কাইল যদি দূরে যাই, তোর দাদি হ্যানে মোরে জ্যান্ত গোর দেওয়াইবে।

চাচি ধমকে ওঠেন, চুপ কর দামড়াডা। মুহে কোনো কতা আটকায় না, না? হাচাইও ক, কাইল করবি কী? লক্ষ্মীপূজা তো পরশু। হিদিন বড়োবাড়ি যাবি, না রুনসী।

—রুনসীতো একরাত্তির থাহন লাগে। হৌর বাড়ি বলইয়া কতা। হাউড়ি রইছেন, হালা, হালাবৌরা আছে। না কী কও, যামুনা?

BanglaBook.org

—যাবি না ক্যা? তয়, ঐ একরাইত। হ্যার পর আবার যাবা, কিন্তু দিনা দিনি। রাইতে মোর ধারে। কবুল?

—কবুল। কিন্তু চাচি, আমারতো অনেক জাগায়ই যাওন লাগবে। কামও আছে। এহানে চাইর পাচ দিনের বেশি তো থাহন যাইবে না।

—তয় যে কইলি, থাকপি দিন পোনারো?

—ঐ যে কইলাম, অনেক জাগায়ই যাওন লাগবে, বরিশাল, ঢাকা, ভাবছি এট্টু চট্টগেরামও যামু।

— হেহানে কেডা আছে তোর?

—এক দোস্তো আর দোস্তাইন। হ্যারা মাজে মাজে যায় ওদ্যাশে। অনেকবারই কইছে হ্যারগো ওহানে একবার যাওনের লইগ্যা।

—তয় তো মুই ঠিকই বুজজি। মোর ধারে আওনায়। আইছ পেলান করইয়া। বেশ, যাই রাইত অইতে আছে ঘরে যাই।—চাচি বেজার বুঝতে পারি। চাচির কথা পুরো সত্য নয়, আবার একেবারে যে মিথ্যে তাও বলতে পারি না। সত্যিই দিলুর সঙ্গে নদীর পারে ওভাবে হঠাৎ দেখা নাহলে হয়তো ফেরার পথে একবার চাচির খোঁজ করতাম। জানতাম নাতো চাচি এখনো বেঁচে আছেন। হয়তো আসতাম বলছি একারণে যে এবার আমার প্ল্যানই ছিল ফেলে চলে যাওয়া গ্রামগুলো পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখার। পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ বছর আগের ছেড়ে চলে যাওয়া জায়গাগুলো এখন কী অবস্থায় আছে, সেখানকার মানুষগুলোই বা কেমন আছে, এর মাঝে কয়েকবার এদেশে এলেও তো দেখা হয়নি। যতবারই আসি এইসব জায়গাগুলোর শূন্যতার কথা চিন্তা করে এদিকে আসার আর ইচ্ছেই হয় না। সুতরাং চাচির অনুযোগ একেবারে মিথ্যে, তা বলি কী করে?

চাচি বেজার হয়ে ওঠার উদ্যোগ করতেই আপটে ধরে বলি, ওরহম করলে কৈলো এই রাত্তিরেই হাডা দিমু। ঐ দিলু চা লইয়া আইথে আছে, খাবা না? ওয়া কিন্তু কইলকাতইয়া চা, দিলুর বৌর ধারে দুফইরে দিছিলাম।—চা পেয়ে বুড়ি একটু শান্ত। আয়েশ করে চুমুক দিয়ে বললেন, ভালো, তয় সোনা ঠাইরনের চায়ের ল্যাহান বাস পাইনা।

বলি, আচ্ছা চাচি, পোঞ্চাশ যাইড কী হেয়ার বেশি অইবে, মানে আমার তো স্মরণ নাই কবে তুমি আমার মায়ের ধারে যাইতা। বোধায় তহন আমার জন্মও অয়নায়, হেই কবে সোনা ঠাইরনের ধারে তুমি চা খাইছেলা, হেয়ার সোয়াদ, বাস

BanglaBook.org

এহনও তোমার মনে আছে?

—আছে না তয়? হেয়া কী ভোলোন যায়?

—হে বাস ক্যামন, এট্টু কবা?

—ফুর ফুরইয়া। হাউক্লা হাউক্লা, একছের নাহের মইদ্যে য্যান সুস্‌সুরাৎ, সু স্‌ সুরাৎ করতেই থাহে। হেয়া খাওনের অনেক দিন পর তামাইত ও থাহে। হ্যাষে মনের মইদ্যে আটকাইয়া বাসটুক থাইক্যা যায়।

চাচির বর্ণনাটি বেশ। হাউক্লা অর্থে হালকা। ফুরফুরে হালকা সুগন্ধ, যার স্থায়িত্ব জীবনভর বলে চাচি বর্ণনা করছেন। চাচিকে আমার কিশোরকালে কোনোদিন আমাদের বাড়িতে আসতে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। তখনও, যখন দিলুর সঙ্গে আমার আগান বাগানে ঘোরাঘুরি, ডাব, নারকোল, পানিতাল ইত্যাদি খাওয়ার 'দোস্তালি' ঘন হলে ওদের এই বাড়িতে যাতায়াত, চাচির কাছে শুনতাম তিনি আমাদের বাড়ি কয়েক বারই নাকি গিয়েছিলেন। 'সোনাঠাইরনের লগে' তাঁর নাকি 'সাইদ্যের ভাব ভালবাসা ছিল। সম্ভবত সেই সময়টায় আমাদের বাড়ির প্রাচুর্যের স্রোতে তেমন ভাটা পড়েনি। আমার মা সোনা ঠাইরেন ছিলেন গরীবস্য গরীব ঘরের মেয়ে। সে কারণে তাঁর সাধারণবর্গের হিন্দু মুসলমান মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কে বড়োবাড়ি সুলভ অহংকার ছিল না। তাঁর এই ব্যতিক্রমী স্বভাব আমিও দেখেছি, যদিও বড়োবাড়ির প্রাচুর্যের দিনের বিশেষ কোনো স্মৃতি আমার নেই। তবে মা যেরকম বরাবর সাধারণের ভালবাসা পেয়েছেন দেখেছি, তাতে প্রাচুর্যের দিনেও যে তিনি সেই স্রোতে গা ভাসাননি, তা অনুমান করা শক্ত নয়।

হালিম তার দাদি আম্মার স্মৃতিচারণ খুব মন দিয়েই শুনছিল। আকাশে ঝকমক্ করছে সোনার থালার মতো ত্রয়োদশীর চাঁদ। পরশু কোজাগরী পূর্ণিমা। আমাদের এই প্রাকৃত মণ্ডলে এইসময়ের দুধ-জ্যোৎস্নার রাতগুলি বড়ো মায়াময় হয়ে নামে। আমি বহু বহুকাল পরে এরকম একটা স্বপ্নসম্ভব রাত উপভোগ করছি। মনের মধ্যে অশেষ স্মৃতি ছায়াছবির মত দৃশ্যের পর দৃশ্য উন্মোচন করে চলেছে। হালিম বলল, চাচা, আপনে এবার চট্টগেরামের ব্যাফারডা ছ্যাক দেন। পরের বার যহন আইবেন, তহন যাইয়েন। চাচি তৎক্ষণাৎ নাতির পোঁ ধরে বলে উঠলেন, হেইডাই করো বাজান, অ্যাদ্দিন পর আইছোই যহন, মোগো লগেই কাডাইয়া যাও দিন কয়ডা। পেরানে তর পামু হ্যানে খানিক। আর এহনতো তুমি নাও কইথে পারবা না, পোলায় যহন ধরইয়া বইছে। বললাম, আচ্ছা, হালু তুইই তয় পেলানডা ঠিক

BanglaBook.org

করইয়া দে দেহি বাপ। আইজকের দিনডাতো গ্যালে। বাহি আছি গোনা গুণতি চোদ্দ দিন। এর মইদ্যে ঢাকা তো যাইতেই অইবে। চট্টগেরাম নাঅয় নাই গেলাম।

—তয় মুই কই, এ অঞ্চলে থাকপেন দশদিন, আর থাহে চাইরদিন। একদিন যাওনে, একদিন ওপারে ফেরা, তো ঢাকায় থাকপেন দুই দিন। হেথে অইবে না?

—হওয়াইতেই অইবে, মোর আব্বুজানে যহন ফতোয়া দেছেন।

—তয় ঐ কথাই পাহা। লয়েন কাইল মুই আপনারে মুল্লুক ঘুরাইয়া আনি।

—ক্যান তোর বাপে যাইবে না?

—গ্যালেও অয়, না গ্যালেও খেতি নাই। হেনার য্যামন ইচ্ছা। তো কোতায় কোতায় যাওনের ইচ্ছা আপনের?

—কাইল আর বড়ো বাড়ি না। কাইল নৈকাডি অইয়া কেওরার পচ্চিম মাথা ধরইয়া হাডা দিমু। নৈকাডি তালুকদার বাডিথে খুব সম্ভব হীরু আছে। হ্যার লগে দ্যাহা করমু। নান্নু মেয়ার পরিবারে কেউ তো বোধায় গেরামে থাহে না। হেনায় তো নাই। হেনার পোলারা তো কেউ কুমিল্লা, কেউ খুলনা, যে যেহানে চাকরি করে। আর যদি চেনাজানা কেউরে দেহি।

— কোন অব্দি যাইবেন?

— রোন্‌মইত গলুইয়া খোলা তামাইত। মইদ্যে যদি কেউ থাহে দ্যাহা করমু। নাইলে গেলুইয়া খোলার থিহাই ফিরুম, ভাত খামু বাড়ি আইয়া এট্টু বেলায়।

চাচি বললেন, তয় বেয়ান বেয়ান দুগ্‌গা খাইয়া বাইর অইস। বেলা অইলে পিত্ত পড়বে। দুফইরে খাবি হ্যানে হেই কহন।

—অত বেয়ানে খাওয়াবনা কী?

—কী খাবি, ক?

—আউশের ফ্যানা ভাত আর বোম্বাই মরিচ।

—বেশ।

এইসব কথা এখন লিখছি। এর মধ্যে কোনো সাহিত্য রস নেই, কাহিনী, গল্পকথা, কিচ্ছুটি নেই। তবু লিখছি কেন? আমার ভাল লাগছে বলে। চাচির কথাগুলো, তাঁর হৃদয়ের উত্তাপ মাখানো ব্যাকুলতার কথা 'বেলা অইলে পিত্ত পড়বে।' দেশ ছাড়ার পর আর তো শুনিনি এতগুলো বছরে। কেউ বলেনি। যে দেশে গিয়েছি, সেখানের গ্রাম গাঁয়েও কম ঘুরিনি। সেখানের বোল, বুলি আলাদা, তারা বলে, ঘুরে এলাম পাড়া পাড়া কেউ দিল না ভাতের কাড়া।

BanglaBook.org

তবে কী সেখানে চাচিরা নেই? আছেন। তাঁদের সঙ্গে নাড়ির যোগ নেই যে। কী করে থাকবে? আমি সেখানের কে?

।। ছয় ।।

ফেরার পথ থেকে আমাদের সঙ্গ নেবার সময় হালিম বলেছিল, হাইচাচা আর চাচির আইথে আটটা সাড়ে আটটা বাজবে।

তা এখন আটটা বাজলেও তাদের দেখা নেই। এখানে সময় খুব মন্থর। কারুরই কোনো তাড়া নেই। সময় মেপে এরা চলে না। যদিও এই বিজলী বিহীন অন্ধকার গ্রামে রাত নামে সন্ধ্যায়ই। কিন্তু আড্ডা গল্পের আয়োজন থাকলে রাত কোনো সমস্যাই নয়। এই সময়ই খেতে হবে, এই সময়ের মধ্যেই ঘুমোতে হবে, এরকম বাধ্যবাধকতায় এরা এখনও অভ্যস্ত নয়। সেরকম অভ্যাস দীর্ঘ নগর-প্রবাসে আমার স্বভাবে এসেছে বটে, তবে তার ব্যতায় হলে অথৈ জলে পড়ি না।

পুকুরের পৈঠা ছেড়ে দিলুদের বার বাড়ির বৈঠকখানায় এসে সবাই বসি। চাচি ঘরে চলে যান। যাবার আগে বলে যান, দূরের পোথ পার অইয়া আইছ। আইজ বেশি রাইত হরিস না। বিশ্রামাদি দরকার। মুই এহন আর রাইত জাগতে পারি না।

—না, তুমি এহন যাইয়া, খাওয়া লওয়া সারইয়া শুইয়া পড়েন।

— হেয়া পড়মু হ্যানে। তয় হুইয়া পড়লেই কী আর ঘুম অইবে? এমনেই অয় না। বয়স অইছেতো, ঘুম কোম। আইজতো আবার বেয়াক পুরাণ কতায় লাড়া লাগছে। হারা রাইত হেইয়াই ভাবমু হ্যানে।

বৈঠকখানায় জনা চার পাঁচেক স্থানীয় লোকজন এসেছে। কোনো ভাবে খবর রটে গেছে হয়তো। দেলোয়ার মেঞার বাড়ি কেডা যেনো আইছে হিন্দুস্তান থিহা। সুতরাং তারা এসেছে দেখা করতে। এরা সবাই চাষি গৃহস্থ মানুষ। গ্রামে শহর নগর থেকে কেউ এলে, তার সঙ্গে দেখা করা কর্তব্য মনে করে। হিন্দুস্তান থেকে আসলে, সে যদি আবার এখানকার প্রাক্তন অধিবাসী হয় তো কথাই নেই। নানানরকম কৌতূহল তখন। তার মধ্যে সাধারণ কুশলবার্তা থেকে সাম্প্রদায়িকতাগন্ধী সমাচার সবই থাকে। কেউ কেউ এসে উগ্র প্রশ্নাদিও করে। যেমন কথা প্রসঙ্গে গুজরাত দাঙ্গার কথা, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের খবর ইত্যাদি

BanglaBook.org

নিয়ে কথা উঠলে একজন জিজ্ঞেস করে, ওহানে নাকি মোছলমানেগো নামাজটাও আদায় হরতে দে'না? মসজিদ টসজিদ বেয়াক নাকি ভাইঙ্গা ফ্যালাইছে।

'ওহানে' বলতে হিন্দুস্তানে, মানে 'কইলকাতায়'। এরা কইলকাতা বলতে তামাম হিন্দুস্তান বোঝে। কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব আমি কী দেই, কীভাবেই বা দেই। হালিম আমাকে উদ্ধার করে। সে বলে, হেয়ার আগে আফ্‌নে কয়েন ছেন, এদ্যাশে মুক্তি যুইদ্দের পরও আফনেরা কতগুলা মন্দির ভাঙছেন? প্রশ্নকর্তা অসন্তুষ্ট হয়ে চুপ করে যান। দিলু বললো, ঐ সব কতা থাউক। পেয়ার মহব্বতের বাত করেন। ইনি বড়োবাড়ির পোলা।

'বড়োবাড়ির পোলা' কথাটায় সবার মধ্যে একটা সম্ভ্রমের বাতাবরণ তৈরি হলো। উপস্থিতদের মধ্যে একজন মরুব্বি গোছের, ভারি সারি চেহারার সত্তর পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধই বলবো, ছিলেন। তাঁর চেহারায় রক্তে উচ্চচাপজনিত ছাপ স্পষ্ট। চোখ দুটো বেশ রক্তাভ, মুখটা ফোলা ফোলা। বললেন, মোর নাম নাজিবুল্লা। ভালোই অইছে আপনে আইছেন। আপনের লগে মোর এট্টু কাম আছে।

—বলেন।

—কই বোলে আপনেগো বড়ো বাড়িডা কৈলোম এহন মোর। মুই হেডা কিনছি।

—যদ্দুর জানি, আমার বাবা জেডারা কেউই বাড়ি বিককিরি করেন নায়। আপনে কেনলেন কেমনতারা?

—না হ্যারা বেচেন নায়। বেচছেন আপনারা।

—আমরা মানে?

—আপনের বড়ো তিন ভাই আর একজন জেডাতো ভাই।

—ব্যাপারডা এট্টু বুজাইয়া কয়েন।

—খাড়া দলিলডা বোজেন?

—''খাড়া দলিলডা' কী?

—এই ধরেন আপনেরা বেয়াক ছাড়ইয়া কাড়ইয়া ওদ্যাশে গেছেন। বাড়িঘর জমিজমা যেমনডা হেমন পড়ইয়া রইছে। আপনেগো একঘর শরিক হেসব ভোগ দখল করে। কিন্তু আইনত তো হেই সম্পত্তিতে 'হ্যার স্বত্ব নাই। হেইসব জাগা জমি, মায় বাড়ি য্যারগো নামে আছেলে হ্যারাও বাচ্‌ইয়া নাই। তো হ্যারগো ওয়ারিশেগো নাম খুজইয়া পাতইয়া, হেই নামে এ্যারে ওরে দাড় করইয়া যে

BanglaBook.org

দলিল মারফৎ সম্পত্তির বিক্রি বাড়া অয়, হ্যার নাম খাড়া দলিল।

—বাপরে, কয়েন কী? কিন্তু হেডাতো বে-আইনি কাম। আমরা ছাড়ইয়া কাডইয়া গেছি যহন হেয়াতো গবরমেন্ট-এ খাস অইবে। অন্যে এরহম কেনে কোন আইনে?

—জমি ভোগ দখলে কোনো আইন লাগে না। তো আল্লার ইচ্ছায় মুই আপনের কয়েকজোন ভাইর নাম জোগার করইয়া, ঐ কী যেন নামগুলা? তপন স্যান, তরুণ স্যান, অরুণ স্যান আর বরুণ স্যান, ঠিক কইছি? হ্যারগো দাড় করাইয়া খাড়া দলিলে সব কিনছি। আইনত হেসব এহন মোর।

—দখল নেন নায় ক্যান?

— হেইডাই অইছে ঝামেলা। ঐ যে আপনেগো শরিক, কী যেন নাম? ঐ যে সীতারানী না কী যেন, হেতো ব্যাডাগো মাথায় হাগে। হে দখল দিতে আছে না। এহন আপনে যহন আইলেন আর একখান দলিল হ্যানে করমু। টাহা পয়সা ন্যায্যই দিমু। কয়েনতো বডার পার করইয়া দিমু হ্যানে। হেই দলিলের জোরে দখল নিমু আপনে এহানে থাকতে থাকতে। কয়েন, কবুল?

একথায় যে কবুল না যায়, সে বিষয়ী লোকের জগতে গাধা। কিন্তু লোকটি এমন নির্লজ্জ লোভীর মতো স্বাভাবিক উচ্চারণে কথাগুলো বলে তার প্রস্তাবটা পেশ করলো যে সকাল থেকে মনের মধ্যে জমে ওঠা পুরো খুশি আর উত্তেজনাটাই মুহূর্তে খান্ খান্ হয়ে গেল। জমি, বিষয় সম্পত্তি, তার অধিকার, দখল ইত্যাদির ইতিহাসগত পরম্পরা শুধু এদেশে কেন, সর্বত্রই অত্যন্ত জটিল। লোকে বলে যে এই অঞ্চলে ব্যাপারটা নাকি জটিলতম। এইদেশে একসময় হিন্দুরা অধিকাংশ জমি জিরেতের মালিক ছিল। তার ইতিহাসও খুব নির্মল অবশ্যই নয়। দেশভাগের ফলে সেই অবস্থার বদল হবে এরকম আশা করা হয়েছিল। বলা হয়, দেশভাগের ফলে হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, মুসলমান সমাজ লাভবান হয়েছে। কিন্তু তা কী এই?

দিলু, হালিমকে বললো, বাজান তুমি বেয়ানে জিগাইতে আছেলা না, এ্যারা বেয়াকে হিন্দুস্তান গ্যালে ক্যা? এহন বোজলা কিছু?

—কিছু তো বোজলামই।

—খালি হুনইয়া আর দেইখ্যা যাও। কইও না কিছু।

নাজিবুল্লা বা অন্য কেউ বাপ ব্যাটার কথায় কিছু বুঝলো না সম্ভবত। নাজিবুল্লা

BanglaBook.org

আবার বলল, ট্যাহার লইগ্যা ভাববেন না। ট্যাহা মোর ট্যাহে অনেক আছে। আপনে খালি একবার কইলেই অয়। আমি ব্যাপারটার অসম্ভাব্যতা, আমার অনধিকার বিষয়ে দু'এক কথা বলে তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা পাচ্ছিলাম। নৈতিকতার প্রশ্ন তোলা এক্ষেত্রে নিরর্থক ছিল। বিভিন্ন কথাই হচ্ছিল এপ্রসঙ্গে। তাতে বুঝলাম লোকটি শুধু লোভী নয়, এটা তার রোগে দাঁড়িয়ে গেছে। হালিম তাকে বললো, চাচা, এরহম দলিল আপনারতো ম্যালাই আছে, না?

—হ'বাজান হেয়া আল্লার কুদরতে মোর আছে কোম না।

—বয়সতো অইছে, এবার ছ্যাক্ দেওন যায় না?

—না যায় না। এয়া ছাড়ইয়া দেলেই মুই মরইয়া যামু। কোরানশরিফে আল্লাতালায় ফরমাইছেন, হে আমার বান্দা, সম্পত্তি রোজগার ফরজ। যে কোনো উপায়ে সম্পত্তি রোজগার তোমাগো লইগ্যা বৈধ করা অইলো। আর মুইতো ট্যাহা দিয়া কিনমু, ঠগামুতো না।

—আপনের বোজোন ডুক বেশ ভালো।

— হেয়া তুমি যাই কও, মুই ইমানদারির খেলাপ করি না। যদিও কও ইনি একলা লেইখ্যা দেলে বাহিগো সইসাবুদের মতামতের কী, তো মোর ধারে হেয়ারও জওয়াব আছে। ইনিই উপস্থিত হেনাগো পিরতিনিদি, মুই এনারে দিয়া এপিডওপিড করাইয়া রেজিস্টিরি অফিসে দাখিল করমু হ্যানে।

—তয় তো ব্যাপারডা পাক-ছাফ্ মতোই অইলে। একথা উপস্থিত জনৈকের মত। যাহোক, এনিয়ে আলোচনা যখন তুঙ্গে তখন বাইরে হাইয়ের গলা শোনা গেল, কই, মালাউনডা নাকি আইজ দিল্উয়া যবনের বাড়ি রাইত কাডাইবে? বলতে বলতে সে বৈঠকখানায় ঢুকে, প্রথাসম্মত সবাইকে আস্সালাম্ আলাইকুম করে। তার বৌ ভেতর বাড়িতে ঢুকে যায়।

ভিতরে নাজিবুল্লাকে সদলবলে দেখে সে বলে ওঠে, আইয়া পড়ছেন? সুবিদা কিছু অইলে?

—না হেনায়তো বোজতেই চাইতে আছেননা ব্যাফারডা। তুমি এট্টু বুজাইয়া দেহছেন দেহি। তয় অসোবিদা এট্টা আছে। সীতারানীর সাজইয়া পোলায় গেছেলে মোর ধারে আইজ বেয়ানে। হে কয়, নাজিবুল্লা সাইবে যদি স্যানেরে উল্ডা বুজাইয়া হাজির দখল নে, তয়তো হ্যারগোও দ্যাশ ছাড়তে অয়। মুই কই। এদ্যাশের

BanglaBook.org

হিন্দুরা এহন কী? —ছাড়তে অয় ছাড়বে। মুই হেয়ার কী হরমু? নাইলে হ্যারগো ভাগ লইয়া হ্যারা থাকপে। মানা হরছে কেডা?

হালিম এইসময় তার আব্বাকে বলে,বাজান, মুই মোর প্রেশ্নডার উত্তর পাইয়া গেছি মোন লয়। দিলু বললো, হুনইয়া যা, কইথে দে। কইথে দে, রাও কাড়িস না। হাই জিজ্ঞেস করলো ও ব্যাডা কী কয়?

দিলু বললো, অইন্য কতা, পরে কমু হ্যানে। নাজিবুল্লার দিকে তাকিয়ে বলে, ভাইজান, ইনি এহানে কয়েকদিন থাকপেন। এসব কতা জলদিবাজি করইয়া অয় না। আইজ মোরা এট্টু অন্য কতাবাত্রা কমু। অ্যাদ্দিন পর দ্যাহা, ছোডোকালের দোস্তো তো, আর হাই সায়েবও আইছেন। অবইশ্য আপনেরাও থাকতে পারেন, তয়, এ সব কতা আইজকার মতো থাউক।

—থাউক, তয় হাই ভাইডিরে যা কইলাম হেডা এট্টু খেয়াল রাখবা।

—রাখমু হ্যানে, তয় আয়েন যাইয়া, আল্লা-হাফেজ। আর হোনেন, রাইতে ঠিক মতো ঘুমাইয়েন।

—আল্লাহ হাফেজ।

আল্লা সত্যই হাফেজ। কী পর্যন্ত যে হাফেজ, তা এরা বাড়ির চৌহদ্দি ছাড়াবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাই আর দিলুর প্রবল অট্টহাস্যে বোঝা গেল। হাই বললো, এইসব জালিমগো সংখ্যা এদ্যাশে আবার বাড়থে শুরু অইছেরে ভাই।

—কিন্তু সকালবেলা হারা গেরাম ঘুরইয়াতো গোডা দুত্তিন হিন্দু বাড়ি খালি নজরে পড়লো। তো এসবের আর দরকারডা কী?

— হেয়া এতো তাড়াতাড়ি বোজোন যাইবে না। আর বুজইয়া তোর কোনো লাভও নাই। তয় যদি নাজিবুল্লার কতায় রাজি থাহো কিছু পয়সা কামাইতে পারো মর্জি অইলে। কিন্তু হেয়া তোরে দিয়া অইবে না।

—না হেয়া একছেরেই অইবে না। প্রথম কথা আমি কোনো অনৈতিক বা বে-আইনীভাবে সম্পত্তি হাতবদলের টাউটগিরি করতে পারমু না। তারপর যে শরিকেরা এহনো এহানে মাডি কামড়াইয়া পড়ইয়া আছে, হ্যারগো অনেক কিছুই হয়তো আমার পছন্দ না, কিন্তু হেয়ার অথ এডা না যে হ্যারগো অসুবিদায় ফ্যালামু। আরো এটটা বড়ো কথা অইলে যে এই সম্পত্তির অংশীদারেগো সংখ্যা কত হেয়া আমি নিজেও জানি না। হেয়া ছাড়া যারা এহন এহানে থাহে, হ্যারাতো বাপ দাদার পোতায় বাতিডা জ্বালাইতে আছে। হ্যারগো ফ্যাসাদে ফেলামু ক্যান্?

BanglaBook.org

হাই বললো, হিন্দুগো ফেলাইয়া যাওয়া সম্পত্তি পাকিস্তানি আমলে আছেলে 'এনিমি প্রপারটি' এই নামে। কিন্তু হেগুলা ঠিকমতো সরকারে খাস অয় নায়। বাংলাদেশ হওনের পর নামডা পাল্টাইয়া হেডা অইলো 'অর্পিত সম্পত্তি'। এহন তুই যদি জিগাও, ক্যার সম্পত্তি, কেডা কার ধারে অর্পণ করছে, মুই কইথে পারমু না। সেটেলমেন্টে ব্যাফারডা ঐ পুরাণ নামেই আছে। এয়া লইয়া মহা ক্যাচাল।

অর্থাৎ আমি অনুমান করতে পারি আমাদের একুশ বিঘার বসত বা তালুকদারী এলাকার অঞ্চলেও যেসব জমি খাসে ছিল বা নদীর ভাঙনে একদার লুপ্ত জমি, ক্ষেত, যা পরবর্তী দীর্ঘকাল পরে আবার জেগে উঠেছিল, সেসবই আগের নাম স্বত্বে রয়ে গেছে। জমির স্বত্ব বদল বড়ো জটিল ব্যাপার। এর মধ্যে খুব কম জমিরই স্বত্ব বদল হয়েছে। এটা শুধু আমাদের ক্ষেত্রেই না, হিন্দুদের পরিত্যক্ত প্রায় ব্যাপক সম্পত্তিরই এই অবস্থা এবং সেসব নিয়ে পাকিস্তানি আমল থেকেই টাউটগিরির ব্যবসা চলছে। হাই রঙ্গ করে বললো যে এদেশে এখন টাউটেরাই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়, সেক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান প্রকৃতই ভাই ভাই। রাষ্ট্র নেতারাও টাউট।

আসলে পাকিস্তানি আমলে মধ্যস্বত্ব, জমিদারি, তালুকদারি বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর থেকে ভূমিসংস্কার বলতে যা বোঝায় তার সামান্যতম কিছুও হয়নি। হাই মোটামুটি শহরবাসীই বলা যায়। কর্মসূত্রে বরিশাল, ঢাকা ইত্যাদি শহরে যাতায়াত এবং যোগাযোগ ভালো। শিক্ষিত লোক। খোঁজখবর ভালোই রাখে। বললো, গেরামের অবস্থা দুই একদিনেই বুজবি হ্যানে। শহরেতো অতো তাড়াতাড়ি বোজোন যায় না, এট্টু সোময় লাগে। কারণ, উপর চালাকির আর বোলচালের ব্যাপার আছে তো। ট্যার পাওন যায় কোনো লেনদেনের কাজকম্ম যদি ক্যারো লগে পড়ে তহন। বেয়াকখানেই টাউটগিরি আর ঠগানইয়া কারবার। সয়ত্যই দ্যাশটা যে কী অইয়া গেছে, আর কোথায় যে এয়ার শ্যাষ বুজইয়া ওঠথে পারি না।

জিজ্ঞেস করলাম, এয়ার কারণ কী? এরহম অইলে ক্যান?

হাই বললো, কারণতো আছেই। তয় মোর মনে অয়, অতি সহজে অনেক পাইয়া পেরথমে কিছু মাইনসের লালস বাড়ইয়া গেছিলো। হেয়ার দ্যাহা দেহি সাধারণ মানুষ য্যারা, হ্যারগো জেব্‌বা লম্বা অইয়া পড়ছে। এহন খালি ঠগাঠগির কারবার। বড়ো যে হে অন্য বড়োরে ঠগায়, ছোড ছোডোরে ঠগায়, আসলে তো বেয়াকেই নিজেরে ঠগায় শ্যাষ পর্যন্ত। এইতো চলতে আছে।

BanglaBook.org

দেশটায় জমি ছাড়াতো অন্য কিছু আর নেই। তার উপযুক্ত উপযোগ না পাকিস্তানি আমলে হয়েছিল, না হচ্ছে বাংলাদেশী আমলে। যেটুকু যা প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল, তাকে দোহন করে করে এখন একেবারে শেষ পর্যায়ে এনে ফেলা হয়েছে। খাল, বিল, পুকুর, নদীনালা, সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে। শুধু কাগজ পত্তরে পানি-সম্পদ, অমুক সম্পদ বলে চিৎকার চলছে। শহর নগরে ব্যবসা বাণিজ্যের নামে টাউটগিরি এবং ফাটকাবাজি, আর গ্রামগুলিতে জমি নিয়ে। আর আছে রাজনীতি। শিল্প, কলকারখানা বা উদ্যোগ বলতে কিছু নেই। দেশের কাঁচামাল যা উৎপন্ন হয় প্রায় সবটাই রপ্তানি হয় বিদেশে। মানবসম্পদের মধ্যে সস্তা শ্রমিক সরবরাহ করা হয় মধ্যপ্রাচ্যে এবং মেধাবিরা পা বাড়িয়েই আছে পাশ্চাত্যের ধনীদেশের দিকে। ব্রিটেন, আমেরিকা, কানাডা, বিশাল ভোগের হাতছানি।

দিলুকে বললাম, চাচিরে কথা দিছি সত্য, তয় রাখতে পারমু বলইয়া মনে অয়না। নাজিবুল্লারা জ্বালাইয়া মারবে। দিলু বললো, এয়া কও কী? মোরা নাই? তুই কী নাজিবুল্লাগো ধারে আইছো? হ্যারা মোগো কেডা?

হাই বললো, মালাউন, আইছো যহন দেইখ্যাই যা। হয়তো আর আইথেই পারবি না কোনোদিন। কয়েকদিন থাক। মোরাও তো আছি। মোরা না থাইক্যা যামু কই?

রাত্রে অনেক সুখদুঃখের স্মৃতি রোমন্থন, বিভিন্নজনের খোঁজখবর নিয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ করে শুতে শুতে অনেক রাত হলো। ঘুম আর আসছিল না। এক সময় আধো ঘোরে একুশ বিঘার বসতটাকে মনে হচ্ছিল একটা বড়োসড়ো ছাড়ানো চামড়া, কে বা কারা যেন বিশাল একটা মরুভূমির মধ্যে চারদিকে টানা দিয়ে শুকোতে দিয়েছে। অনেকগুলো কুকুর সেই চামড়াটাকে নিয়ে টানাটানি করছে। তাদের মুখগুলো নাজিবুল্লার মতো। তার মধ্যে কোনটা হিন্দু নাজিবুল্লা, কোন্‌টা মুসলমান, আলাদা করা যাচ্ছিল না। কখনো ভাবছিলাম স্বপ্ন দেখছি, কখনো মনে হলো, না জেগেই তো আছি। আসলে মনের খেদটা তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে ওরকম একটা ছবি সৃষ্টি করেছে। ঠিক এই সময়টাই ফজরের আজান ভেসে আসল, ওঠো নামাজ ঘুম হইতে ভালো। আমার শৈশবকালের ঘুম ভাঙার স্মৃতিটা মনে পড়ল। ধড়মড় করে উঠে বসে ভাবলাম, ধুর, নাজিবুল্লারা কী করবে? এদেশে হালিমরাও তো বড়ো হচ্ছে। আমি পাশে শোওয়া হালিমকে

BanglaBook.org

ডেকে তুলে বললাম, ল'বাজান, এই সোমাডায় এটটু নদীর পার থিহা চক্কর মারইয়া আই। ভাল লাগবে হ্যানে। হালিম বললো, লয়েন।

অন্ধকার কাটেনি। তবে পথ চলতে অসুবিধে হচ্ছিল না। ভোর রাতের জোয়ারের জল সামান্য হলেও কিছুটা ঢুকেছে খালটায় একদিন এটা কতই না সুন্দর এবং বড়ো ছিল। আজ দেখে বড় কষ্টবোধ হচ্ছে। নদী, খাল, জলাশয়, এসব শুকিয়ে গেলে কী জনস্বভাবে সেই দৈন্যের প্রভাব পড়ে? বোধহয় তাই। ওপারের হাটটা প্রতি রবিবার বসতো। কত মালবাহী নৌকো, ডিঙি এখানে ভিড় করতো। সেই জায়গাটা একটা শূন্য চাটানের মতো পড়ে আছে। এখানে ওখানে ঝোপ, জঙ্গল। শরতকালের সকাল। কাল কোজাগরি লক্ষ্মীপূজা। প্রকৃতিতে একদিন তার যে ছাপ পড়তো, নদী, খাল পারে, ধানক্ষেতে যে মেঠো পথ দিয়ে চলেছি, তার আশপাশের দূর্বাঘাসে যে সমারোহ শিশুমনে রহস্যময়তার সৃষ্টি করতো, আজ আর তার কোনো সাড়া পাচ্ছি না।

হালিমকে শৈশবের সেইসব আশ্চর্য খবর বলতে বলতে পথ চলছিলাম। তার অনুভবগুলিতো এখন নবীন। সেখানে কী আমার ঐ বয়সের অনুভবের উপস্থিতি আমি খুঁজে পাব? একথা তাকে যেমনভাবে বললে সে আমার মনোভাবটা বুঝতে পারবে, বলতে সে জানায়, সেরকম কোনো অনুভূতি তার নেই। তবে শহরের চাইতে এই গ্রামই তার পছন্দ এবং আরামের। বুঝতে পারি পরিবর্তিত এই প্রকৃতি এবং মানব স্বভাবেই সে অভ্যস্ত। এরই মধ্যে তার ভালমন্দ বিচার। আসলেই ব্যাপারটা তাই। তবে সে এও জানায় যে তার আব্বা এবং দাদির কাছে এইসব স্থানের পুরোনো দিনের বর্ণাঢ্যতার গল্প শুনতে তার ভাল লাগে এবং তার মনের মধ্যে সেসবের জন্য একটা অভাববোধ আছে। কথাটা জেনে প্রাণে বেশ আরাম পেলাম। তাহলে ওরা একদিন সে অভাব পূর্ণ করবে নতুন বর্ণাঢ্যতায়!

যে কদিন এখানে থাকবো, হিন্দু মুসলমান অনেকের মধ্যেই হয়তো নাজিবুল্লার মতো মানুষদের সাক্ষাৎ পাব। আমার শৈশব স্মৃতিতে এজাতীয় মানুষদের অস্তিত্ব এতকাল খুঁজিনি বলেই পাইনি। কিন্তু সর্বগ্রাসী লোভী মানুষ কী তখন গ্রামীণ এই পরিমণ্ডলে কম ছিল? ঐ বয়সে তাদের সংস্পর্শে আমার আসার প্রয়োজন ঘটেনি, তাই আজ নাজিবুল্লাদের দেখে আমার বিতৃষ্ণা বোধ হচ্ছে। নইলে, টাউট কোথায়

BanglaBook.org

নেই? যে দেশে এখন বসবাস, সেখানে কাদের মধ্যে থাকি? জমিজমার ব্যাপারে গ্রাম সমাজে রাজনীতিতে সর্বত্রইতো এই ব্যাপারটাই বাস্তব। কোথায় তা নেই? আর শুধু গ্রামেই তো নয়, শহর নগরও এই লোভের সংক্রমণ থেকে মুক্ত নয়। এইসব নিয়েই আমার একুশ বিঘার বড়োবাড়ি এবং দেশবোধ। স্মৃতি ব্যাপারটাই শুধু কল্পনার ইন্দ্রধনু রচনা করে বিষণ্ণতায় বিবশ করে।

হালিম বললো, আপনে বড় বেশি ভাবেন। ভাববেন না, একদিন বেয়াক ঠিক অইয়া যাইবে। লয়েন ঘরে যাই, দাদি আম্মায় বোধায় বিচ্‌রাইতে আছে। আইজতো আবার আপনেরে লইয়া হারা গেরাম ঘোরতে অইবে। অত হাটতে পারবেন তো? বললাম, পারমু হ্যানে, তুই লগে থাকলে।

—আব্বুরে নেবেন না লগে?

—না, হে হ্যার কাম করুক। আইজ থিকা তোর লগেই আমার দোস্থালি। পুরাণ কথা আর ভাবমু না খমাহা। তোর খোয়াবের কতাই শুনমু খালি। আর এট্‌টা কতা, কাইল রাত্তিরে তোর বাপে যে তোরে আমাগো হিন্দুস্থান যাওনের কারণডা কইতে আছেলে হেডা ঠিক না। খালি নাজিবুল্লারা না, যারা চলইয়া গেছি, হ্যারগো মতলব ও খুব যে সোজা আছেলে হেয়া না। আসলে দ্যাশটা যহন ভাগ অইল, তহন হেডা অইছেলে খাড়াখাড়ি হিন্দু-মুসলমানে। বাঙালির কথাডা কেও ভাবেই নায়। একাত্তর সালের চেষ্টায় অন্তত হেই ভাবডাতো অনেকের মাথায় আইছে। হয়তো হেডা এইমণ্ড পোক্ত অয়নায়। তয়, যেডুক হইছে হেয়াই বা কোম কী? একদিন কেরমে কেরমে পুরাডাই পোক্ত অইবে। হেই আশায়ই বাচ্‌ইয়া থাক্‌মু।

—o—

BanglaBook.org

বিষাদ বৃক্ষ, জীবনের বিষাদ ও হর্ষ

—এক—

যাঁরা জীবনে কিছু হয়ে ওঠেন, তা লেখক, শিল্পী, অভিনেতা বা গায়ক যাই হোন না কেন, তার পেছনে ঠিক কি জিনিসটি সক্রিয় থাকে তা বলা খুব কঠিন। আমি সে অর্থে কিছু হয়ে উঠিনি। তথাপি যতটুকু হয়েছি তার পিছনে বোধহয় অনেক কিছুই আছে। মনে হয় কিছু হয়ে উঠতে না পারার পিছনেও অবশ্যই অনেক কিছুই থাকে। কিন্তু সে প্রসঙ্গে এ আলেখ্য নয়। এখানে আমার নিজের কথাই বলছি। মানুষের কাছে যতটুকু পরিচিত হতে পেরেছি, সেইটুকু হয়ে ওঠার পিছনে যা যা সক্রিয় তার একটা মোটামুটি হিসাব নিয়ে এই আলেখ্য। প্রসঙ্গত বলি, আমার অন্যান্য লেখাপত্রের মতো এটিও আমার ব্যক্তিজীবনকে কেন্দ্র করেই এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য মানুষেরাও আছেন।

আমাকে আজকাল, অর্থাৎ প্রায় দশক দেড়েক ধরে কিছু কিছু মানুষ দেশে, এমনকী বিদেশেও লেখক হিসাবে জানেন। ব্যাপারটা আমার কাছে যতটা ভাল লাগার তার চাইতে কম অস্বস্তিকর নয়। একথা সত্য যে আমি ছোট বড়ো খান দশ বারো বই লিখেছি। লিখেছি কিছু প্রবন্ধ এবং স্মৃতিগল্পও বিভিন্ন ছোটবড়ো পত্র পত্রিকায়। সেসব অনেকের ভাল লেগেছে, আবার অনেকে তা 'দুচ্ছাই'ও করেছেন। প্রশংসা বা নিন্দা কোনোটাতেই আমার তেমন হেলদোল নেই, এমনটা স্বভাবে থাকলে বেশ হতো। দুঃখের কথা অতোটা বৈরাগীভাব নেই আমার। অস্বস্তি যেটা তার কারণ এই যে যাঁরা প্রশংসা করেন তাঁরা যেমন, যাঁরা নিন্দা করেন তাঁরাও তো তেমনি আমাকে লেখক হিসাবেও গণ্য করেন।

আমি কথা-সাহিত্যিক বলতে যা বোঝায় তা নই। একথাটা প্রতিষ্ঠিত কথা সাহিত্যিক যাঁরা, তাঁদেরই। বোধহয়, তাঁরা বোঝাতে চান যে আমি একজন সৃজনশীল লেখক বলতে যা বোঝায় তা নই। কথাটা পাঁচসিকে খাঁটি সত্যি। আমি যা লিখি, শাস্ত্রসম্মতভাবে তাকে কোন বিভাগে ফেলা যায় তা নিয়েও বিস্তর বিতর্ক আছে। কিন্তু যেহেতু মাধ্যমটা 'কথা' নিয়েই, সুতরাং তার মধ্যে সাহিত্য গুণ যদি কিছু থাকে তবে তাকে কথাসাহিত্য কেন বলা যাবে না—তা

BanglaBook.org

পরিষ্কার নয়। তবে এ নিয়ে লেখালেখি কিছু হয়নি, এ শুধু 'কফি হাউসীয়' উদ্গার মাত্র।

এর আরেকটা প্রকাশ 'কথা সাহিত্য' বিষয়ক সভা বা আলোচনাকেন্দ্রে আমাকে আমন্ত্রণে আয়োজকদের অনীহা। কিন্তু সেসব আলোচনায় যাব না। সে বরং একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। আমি স্বভাবগতভাবে অলস ব্যক্তি। বেমতলব দৌড়াদৌড়ির হাত থেকে বেঁচেছি। কোলকাতার শীলিত আধুনিকতায় আপটুডেট হতে না পারাটা অবশ্যই একটা বড়ো ক্ষতির ব্যাপার। কিন্তু সব কী আর এক জন্মে হয়।

আমি যা হয়েছি, এখানে সেই হয়ে ওঠার বিষয়ে কিছু খবরাখবর বলবো। তবে একথাও বলে নি যে, অনেক কথা বলার পরেও হয়তো আসল কথাটা অনুক্তই থেকে যাবে। এইসব বৃত্তান্ত বলে খোল্‌সা করা যায় না বলেই মনে হয়।

প্রথমেই বলি, সাহিত্য সৃষ্টি করব বলে কলম হাতে নিইনি। সাহিত্যের ক্ষেত্র বড় বিশাল বিস্তৃত ব্যাপার। সেখানে যাঁরা বিচরণ করেন, ক্ষমতা, গুণ এবং কর্ম অনুসারে, তাঁদের অঞ্চল বহুধাবিভক্ত। সামান্য দু'একজন ঐ বিশাল বিস্তার ক্ষেত্রটি আনুপূর্ব কর্ষণ, বপন, রোপণ ইত্যাদি করার ক্ষমতার অধিকারী, তথা তদনুযায়ী ফসল উৎপাদনে সক্ষম। বাকি বেশিরভাগ ছোট বড় অংশে তাঁদের প্রচেষ্টা এবং ক্ষমতা অনুসারে সাহিত্য সেবা করেন। আমার ক্ষেত্রে, যেহেতু কোনও পূর্বনির্দিষ্ট ক্ষেত্রাংশ ছিল না, সুতরাং প্রথামত তাকে কর্ষণোপযোগী করে তৈরি করাও হয়নি। সব কিছুরই একটা প্রস্তুতিপর্ব থাকে। আমার প্রস্তুতিপর্বটি বড় ধূসর, কারণ তা প্রকৃতই অসম্পূর্ণ এলোমেলো এবং অনুশীলন রহিত। ইংরাজি ভাষায় যাকে home-work বলে, তা আমার ক্ষেত্রে এতই অকিঞ্চিৎকর যে তার বর্ণনা দেওয়াও লজ্জাজনক। অনেকেই হয়ত এই যুক্তির সঙ্গে সহমত হবেন না, অথবা একে নিতান্ত খঞ্জ যুক্তি বলে আখ্যা দেবেন, কিন্তু 'আলস্য দোষের আকর' এই সত্যের ব্যত্যয় নেই জেনেও আমি তার থেকে নিবৃত্তি যাচ্‌ঞা করিনি। এই অনুশীলনহীনতার পিছনে আরও একহাজার একটা বা তারও অধিক কারণ হয়তো আছে। কিন্তু সেসব মনুষ্যজীবনের স্বাভাবিক অনুষঙ্গ মাত্র। তার ব্যাপক বিবরণী আমার রচনায় লভ্য, অতএব, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

BanglaBook.org

তথাপি আমি লিখি, আর তার জন্য বেশ নাম যশও হয়েছে। অর্থ হয়নি। দু-একজন প্রকাশক ছাড়া বই এর রয়ালটি দেবার ঔদার্য বাংলা সাহিত্যের বাজারে দুর্লভ, অবশ্য এখানে বক্স অফিস, বেস্ট সেলার ওয়ালা লেখকদের কথা স্বতন্ত্র। যশ ব্যাপারটা অর্থের চাইতে কম ক্ষমতাশালী নয়, যদিও সাহিত্যজগতের পিতামহ বঙ্কিম উপদেশ করেছিলেন, যশের জন্য লিখিবেন না। কিন্তু সেকথা শোনে কে? লোকে আজকাল জ্যান্ত প্রতাপশালী বাপের কথাই গেরাহ্যি করে না, তো মরে ভূত হওয়া ঠাকুর্দ্দার কথা শুনবে। যশ বড় মাহেঙ্গা বস্তু, আবার তা যদি ছাপার অক্ষরে নামীদামী পত্রিকায় প্রচারিত হয় তো কথাই নেই। যশ অর্থের চাইতে দীর্ঘস্থায়ী এবং তার স্বাদ পুরোনো মদের তুল্য। আধমড়া মানুষকে পর্যন্ত তা চাঙ্গা করে দেয়। সমালোচনার ক্ষুদ্র বৃহৎ কণ্টকের চাইতে যশের স্নিগ্ধতা অবশ্যই অধিক উপভোগ্য। নচেৎ ওই মহদ্‌বাক্য বলার পরেও বঙ্কিম লোক-কটাক্ষে বিদ্ধ হতেন না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কণ্টক ক্ষুদ্র হইলেও, তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে।' কথাটি বঙ্কিম প্রসঙ্গেই। কিন্তু যশের জন্য বোধহয় স্বয়ং ঈশ্বরও বুভুক্ষু কুত্তার মত দেড়হাত জিভ বের করে লালা ঝরান। মনুষ্য তো ষড়রিপুর ক্রীতদাস। আবার একথাও তো মানতে হবে যে মনুষ্য সমাজের অধিকাংশ সদস্যই গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শকে অনুসরণ করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং যেটুকু নাম যশ হয়েছে, তার জন্য আমার বিন্দুমাত্র হেলদোল নেই, একথা জজে মানবে না। শুধু এটুকু বলতে পারি যে যশের জন্য ঢাক ঢোল পিটানোর হ্যাংলামিটা এখনও স্বভাবে আশ্রয় করেনি। প্রশংসা প্রশস্তি শুনে অস্বস্তি বোধ করাটাই তার প্রমাণ। অস্বস্তিটা নিজের অক্ষমতা সম্পর্কে সম্যক ধারণার কল্যাণেই। সেখানে 'সুখেষু বিগত স্পৃহঃ, দুঃখেষু নিরুদ্বিগ্নমনাঃ'' এরকম মহৎ তত্ত্বদর্শন নেই।

তাহলে এ লাইনে এলাম কেন এবং কীভাবেই বা? আপাতত সেই গল্প বলতেই এতক্ষণের ঝোপঝাড় পিটোনো। আমার লেখালেখির জীবন বড় বেশি দিনের নয়। যদিও এর আগে বলেছি যে আমার কোনো প্রস্তুতি পর্ব নেই, কিন্তু সেটা আংশিক সত্য। এক ধরনের প্রস্তুতি ভেতরে ভেতরে তো চলছিলই, নাহলে 'Ex Nihilo' ব্যাপারটা হলো কীভাবে?

ছোট বয়স থেকে পিতৃদেবের কাব্যচর্চার প্রচেষ্টা অবশ্যই আমার মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছিল। ভদ্রলোক সংসারিক সর্বব্যাপারে ছিলেন

BanglaBook.org

অনবদ্য অলসতা এবং উদাসীনতার প্রতিমূর্তি। শুধু একটি ব্যাপারে তাঁর নিরলসতা দেখেছি, তা এই পদ্যরচনা। বিষাদবৃক্ষে তাঁর সাংসারিক, বৈষয়িক অকর্মণ্যতার কথা এন্তের লিখেছি, তাই বিশদে যাব না। শুধু এই পদ্যরচনার কথা খানিক বলি। আমার স্মৃতিতে, সেকালের দারিদ্র, দুঃসময়ের দিনগুলি যে আনন্দের সংবাদ আজও বহন করে, তার স্মৃতির চিত্রকল্প বড় মধুর, যদিও সেই মধুরতা অসম্ভব বিষণ্ণতা-মণ্ডিত। ঘরে চাল বা কোনোরকমের খাদ্যবস্তু নেই, ছোট ভাইবোনেরা হয়ত খিদেয় কাঁদছে, বাহুল্যবোধে মা উনুন জ্বালেননি। বাইরে অঝোর বৃষ্টি, বাবা পদ্যের মিল খুঁজছেন। সে প্রায় রবিঠাকুরের 'পুরস্কার' কবিতাটির শুরুয়াতের ছবিটি—

... রাশি রাশি মিল করিতেছ জড়ো
রচিতেছ বসি পুঁথি বড় বড়
মাথার উপরে বারি পরো পরো
তার খোঁজ রাখ কী?

.....
ওগো ফেলে দাও পুঁথি ও লেখনী
যা করিতে হয় করহ এখনি
এত শিখিয়াছ এটুকু শেখোনি
কীসে কড়ি আসে দুটো!

অবশ্যই মা এমত ব্যবহারের সাহস ধরতেন না। ততক্ষণে হয়ত বাবার পদ্যটি মাত্রা, ছন্দ এবং পঙ্‌ক্তির অক্ষরসাম্যে আঁটসাঁটো হয়ে দিব্য নিটোলটি হয়েছে। বাবা ভূমানন্দে ভোঁ হয়ে আছেন। 'পোলাপানের' কান্না তাঁকে স্পর্শ করছে না। মা স্বভাবগত ভাবে এসব সমস্যায়, নিরর্থকবোধে বাক্‌শূন্য। জানেন, কিছু বললে কবিসুলভ বাণী শুনতে হবে, একদিন না খেলে মানুষ মরে না। তার চেয়ে কী লিখেছি শোনো। অগত্যা তাঁকে শুনতে হতো এবং পেটে গোখরোর ছোবল সহ্য করে দশ এগারো বছর বয়সী আমাকেও। তখন বুঝতাম না বটে, তবে বোঝার বয়স হলে ঐ খাতার কবিতা বা পদ্য, যাই বলি না কেন, কাব্যের চাইতে অধিক আনন্দ দিয়েছে, পথ দেখিয়েছে এমন এক দেশের যেখানে প্রসন্নতা—প্রফুল্লতার ঋতু, প্রাকৃতিক নিদাঘ, হিম অথবা বর্ষণের তীব্রতাকে

BanglaBook.org

অক্লেশে উপেক্ষা করে। ক্ষুধা, নিদ্রা, ইত্যাকার শারীরিক ক্লেশও সেখানে তুচ্ছ হয়ে যায়। আর সেইসব স্মৃতির সূত্রই আমার মধ্যে গড়ে তুলতে থাকে এক প্রস্তুতিপর্ব। এর সঙ্গে আরও থাকে একান্ত নিজস্ব নিঃসঙ্গ যাপিত কৈশোর। সেই সময় অর্থাভাব এবং উদ্যমহীনতা অভিভাবকদের নিস্পৃহ রেখেছিল আমার মত কিশোরদের শিক্ষা বিষয়ে। এর ফল হয়েছিল দ্বিবিধ। প্রথমটা মারাত্মক ক্ষতিকর। ইস্কুলে পাঠানো হয়নি বলে প্রথাসিদ্ধভাবে পড়াশোনা করতে না পারা। জীবনের গঠনের প্রাথমিক স্তর থেকেই বিশৃঙ্খলভাবে বড় হওয়া, সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বেড়ে ওঠার সুযোগ না হওয়ার জন্য স্বভাবে চিরস্থায়ী নিঃসঙ্গতা এবং মেলানকোলিয়ার প্রকোপ। এই যেমন একটা দিক, অপর দিকটা ভালোয় মন্দয় মেশানো। বয়সের তুলনায়, বুঝে না বুঝে গোগ্রাসে, বয়সের অনুপযোগী গ্রন্থপাঠ এবং সেখানেও শৃঙ্খলার অভাব। অল্প বয়সে এই বিশৃঙ্খলার প্রকোপ ততটা অনুভূত হয়নি, বরং ইসকুল কলেজে যখন পড়াশোনা করছিলাম, তখন এই সময়কার পড়াশোনার জন্য মনে বেশ একটা অহংকার পোষণ করতাম। সহপাঠী, পাঠিনীরা, এমন কী শিক্ষক অধ্যাপকেরাও অনেকেই আমার সমতুল্য পাঠের ব্যাপকতায় ছিলেন না, এরকম প্রমাণ পেয়ে। তাঁরাও আমার বয়স অনুপাতে অধ্যয়নের ব্যাপকতায় মুগ্ধতা প্রকাশ করতেন। পরে বুঝেছি এটা যতটা আমাকে উপর-চালাকিতে দস্তুর করেছে ততটা শিক্ষিত. করেনি। লেখালেখির জীবনে এর ভাল মন্দ প্রভাব দুটোই পড়েছে। রুটিনসম্মত পড়াশোনা বা লেখালেখির অভ্যাস বাবার মধ্যেও ছিল না। তিনি তো আবার তাঁর লেখার এক বর্ণও কোনোদিন ছাপার জন্য কোথাও উদ্যোগ নেননি। লিখতেন, প্রথম মাকে শোনাতেন, পরে গ্রামের দু-একজন বোদ্ধাকে। ব্যস্ ঐ পর্যন্ত। তাঁর সব লেখাই ছিল পদ্যে। ছন্দের উপর অসামান্য দখল। শব্দচয়নের দক্ষতা ঈর্ষণীয়। তবে রচনা নির্মাণরীতি প্রাগাধুনিক। আধুনিক কবিতা বলতে তখন যা বোঝানো হত, তার উপর অপরিসীম বিতৃষ্ণা ছিল তাঁর। এমনকী যে কল্লোল যুগ বিষয়ে তাঁর কাছে এত এত গল্প শুনেছি, যে গোষ্ঠীতে তাঁর দু'একজন কলেজ জীবনের বন্ধুও ছিলেন, সেই কল্লোল গোষ্ঠীর বাঘা কবিদেরও তিনি একসময় আর পছন্দ করতেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে শেষ কথা। কল্লোলী কবিদের ব্যবহৃত উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অনুপ্রাস এবং ছন্দ নিরীক্ষার পদ্ধতি তাঁর মতে রীতিমত অসুন্দর তথা অ-কাব্যোচিত ছিল। মাঝে মাঝে মনে হত

BanglaBook.org

তিনি বোধহয় ব্যাপারগুলো ঠিক বুঝতেন না। পরে ভুল ভেঙেছে। বুঝেছি, বুঝতেন তিনি ঠিকই, তবে নতুনত্বকে গ্রহণ করার নাগরিক ঔদার্য তাঁর রপ্ত ছিল না। গ্রামীণ নিস্তরঙ্গ জীবনে দীর্ঘদিন এক বদ্ধতায় কাল কাটিয়ে, কলেজ জীবনের দু'চার বছরের নাগরিক বোধ আর বিকশিত হয়নি। ব্যাপারটা অনেকটা কবি কায়কোবাদের মত আর কী। তিনি রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করতে পারেননি। হেম, নবীন যুগের আচ্ছন্নতা তাঁকে তাঁদের জগতে আটকে রেখেছিল। বাবার এই ব্যাপারটার গভীর প্রভাব, তাঁর কবিজীবনের অর্ধশতাধিক বছর পরে লেখালেখি করতে গিয়ে আমাকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়, যদিও কবিতা আমার লেখার বা রচনার মুখ্য বাহন নয়। এই যে কথাটি বললাম, তাও যে সর্বার্থে সঠিক তা নয়। পাঠকরা জানেন আমার রচনার গান এবং আঞ্চলিক পদ্যের ব্যবহার কতটা ব্যাপক। এটাই হয়ত পৈত্রিক উত্তরাধিকার। তবে এই সময়ে যতটা পড়েছি, লিখিনি প্রায় কিছুই। একটা খাতায় বেশ কিছু পদ্য লেখার কসরৎ করে বাবাকে দেখিয়েছিলাম। চোখ বুলিয়ে তিনি খাতাটা ফেরত দিয়েছিলেন। কিছু মন্তব্য করেননি। বুঝেছিলাম, ওসব আমার হবার নয়। তখন বয়স বারো তেরো। যৌবনকালে আবার চেষ্টা করেছি। তবে তাতে পূর্বোক্ত বিশ্বাসটা পাকাই হয়েছে। ছাপার প্রচেষ্টা করে আর লোক হাসাইনি। এইসব ঘটনাকে যদি আমার পরবর্তীকালীন লেখালেখির প্রস্তুতিপর্বের প্রাথমিক প্রয়াস ধরা যায় তবে তাই। ততদিনে প্রাচীন আপ্তবাক্য বেশ পাকাভাবেই রপ্ত হয়েছে 'শতং বদ মা লিখ' এবং 'শতং লিখ মা ছাপো'। দ্বিতীয় আপ্তবাক্যটিই এক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী থেকেছে। তবে একটা কথা অবশ্যই সত্য যে ভালমন্দ যা কিছুই হোক, জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। সঞ্চয়ে যা কিছু ছিল, তার টুকরো টাকরা পরবর্তীকালের লেখালেখিতে যথেচ্ছ কাজে লাগিয়েছি। এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণই বাবার অভ্যাস থেকে রপ্ত করা। তিনি মাঝে মাঝে, হঠাৎ খেয়ালে এক আধ লাইন এখানে ওখানে লিখে রাখতেন, পরে সেগুলো প্রয়োজনমত ব্যবহার করতেন।

অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটকটি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। বস্তুত ধ্রুপদী সব নাটকই, ইংরাজি, বাংলা এবং সংস্কৃত, তাঁর আদরণীয় পাঠ-বিষয় ছিল। তার মধ্যে থেকে কোনও বিশেষ সংলাপ কখনও কখনও তাঁর পদ্যরচনায় স্ফুলিঙ্গ হত। সেইসব একটা খসড়া খাতায় লিখে রাখতেন তিনি পড়ার সময়। এরকম একটি কবিতার

BanglaBook.org

উল্লেখ করছি উদাহরণ হিসাবে। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়ার পর প্রাথমিক পর্যায়ে, রাজ্য শকুন্তলাকে বলছেন, ননু কমলস্য মধুকরঃ সন্তুষ্যতি গন্ধ মাত্রেণ। শকুন্তলা সরলা আশ্রমবালা। নাগরিক চাতুর্য জানেন না। রাজার সংলাপের উত্তরে খুব সরল প্রতিপ্রশ্ন তাঁর, অসন্তোষে উণে কিং করেদি?— মধুকর কমলের গন্ধ মাত্রেই সন্তুষ্ট হয় না। রাজার এই কথাটি যদি বর্তমান নারী স্বাধীনতার যুগে কোনো স্বাভিমানী নাগরিকা সুন্দরীকে তিনি করতেন, অথবা গ্রামীণ ললনাকেও, তবে তা যে যৌন কুপ্রস্তাব হিসাবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেন না, মধুকরেরা যে ফুলে ফুলে মধু খায় এ সত্য সর্বজ্ঞাত। শকুন্তলার প্রশ্নটি এতই সরল যে তিনি আশ্রমপালিতা, অরণ্যদুহিতা হলেও তা যেন রাজার পক্ষে মিলনের আমন্ত্রণই। একথা আমাদের আজকের ব্যাখ্যা। এর অন্য ব্যাপক ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ করেছেন। কিন্তু বাবার ক্ষেত্রে এই সংলাপ দুটি প্রেমের সহজতায় ধরা দিয়েছিল। তার কবিতাটি রচিত হল এই সংলাপ দুটিকে শিরোনাম করে। কবিতাটি উদ্ধৃত করছি—

এই যে শ্যামল সুষমায় ভরা
স্নিগ্ধ শীতল তটিনী ধার
ধীরে সখা হেথা চরণ ফেলিও
কিশলয়ে যেন বাজে না ভার।
হয়ত উহারা উঠেছে দলিয়া
কুসুমিত কোনো তরুণীকায়
হয়ত তাঁদের অধর কোন বা
রূপসী অধর পরশি ধায়।
তারা বলে সুখ স্বর্গেরও দূরে
আমি বলি সুখ মদিরে বঁধু
বাকি ত্যাজি আজ নগদ যা লহ
দূরের ঢোলক শুনিতে মধু'।

BanglaBook.org

বলা বাহুল্য, কালিদাসের সঙ্গে ওমর খৈয়ামের ভাব-সংমিশ্রণ এখানে এক চমৎকার মাধুর্যের সৃষ্টি করেছে। যদিও খৈয়ামের প্রভাবটাই সমাধিক স্পষ্ট। আমার সংস্কৃত সাহিত্য প্রীতি, অক্ষমণীয় কম পড়াশোনা এবং অশুদ্ধ উদ্ধৃতি ব্যবহার সত্বেও অনেকাংশেই পিতৃপ্রভাব প্রবল। প্রাথমিক প্রস্তুতি পর্ব বিষয়ে

এটুকুই আপাতত বক্তব্য। এর তাৎপর্য যে আমার জীবনে কতটা তা যৌবনকালে কোনোদিন ভেবে দেখিনি। সামান্য লেখালেখির আবর্তে এসে যখন অসামান্য সমাদর, অযাচিত, অহৈতুকী, অলৌকিক কৃপা-বৃষ্টির মত লাভ হচ্ছে, তখন ফেলে আসা দিনের 'কণা'টুকুর জন্যেও 'প্রাণ করে হায় হায়'। কিন্তু আমার সেইসব দিনতো 'ভেসে গেছে চোখের জলে'। আজ ছাই পাঁশ যা লিখছি তা তো সেইসব দিনের ছায়াঘন ভিজে মেঘের ছবিমাত্র।

।। দুই।।

জীবনের অভিজ্ঞতা এবং তার স্মৃতিই মূলত একজন লেখকের লেখালেখির উপকরণ। এরকম একটা কথা শ্রদ্ধেয় কাজি মোতাহার হোসেনের একটি লেখায় পড়েছিলাম বলে মনে পড়ছে। তিনি বলেছেন, অভিজ্ঞতা যাদের মনে সঞ্চিত হবার অবকাশ পায় না, তাদের লেখক, সাহিত্যিক হবার প্রচেষ্টা দুরাশামাত্র। কথাগুলি আদ্যন্ত সত্য বলেই মানি। স্মৃতি, বিশেষত, বাল্যস্মৃতি সহজে মুছে যাবার নয়। আবার সেই স্মৃতির সিংহভাগ জুড়ে যদি থাকে ব্যথা, বেদনা, অসম্মানের অনিরুদ্ধ প্রবাহ, তবে তার প্রভাব তো আমৃত্যু-কালের। এর সঙ্গে স্মৃতি-কালের অম্ল, মধুর, তিক্ত, কষায় ইত্যাদি তাবৎ লভ্য-স্বাদ বিস্বাদের রসায়ণে লেখালেখির জগৎটা গড়ে ওঠে। একথা যেমন একজন সার্থক সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে সত্য, তেমনই সত্য আমার মত pseudo লেখোয়াড়দের ক্ষেত্রেও। 'লেখোয়াড়' কথাটি লেখক শব্দের বিকল্প হিসাবে শ্রদ্ধেয় হিমানীশ গোস্বামী মশাই এর ব্যবহার। ধার নিলাম। বুৎপত্তির যুক্তি সূত্র, যে খেলে সে খেলোয়াড়, সুতরাং যে লেখে সে লেখোয়াড়। হিমানীশদা বলেছেন যে এতবড় একটা আবিষ্কার তাঁর মত স্বল্প বুদ্ধি এবং অপ্রকৃষ্ট মেধাসম্পন্ন লোকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এর জন্য তিনি তাঁর ক্ষণজন্মা নপাৎ শিশুটির কাছে ঋণী। মনে হয়, তিনি আমার লেখকত্ব বিষয়ে সেইদিনের শনিবাসরীয় আড্ডায় মদীয় ইতস্তত ভাব দেখেই গল্পটির অবতারণা করেছিলেন। এক্ষেত্রে আমার বলার ছিল যে 'নপাৎ' বা নাতি থাকতেই পারে। আমিও তো কারুর নাতিই। কিন্তু নাতিটা কার তাওতো দেখতে হবে। যেমন অগ্নিদেব স্বয়ং 'অপাং নপাৎ।' হিমানীশদার নপাৎ তো সেই গোত্রেরই হবেন। অতএব, আমি একজন লেখোয়াড় এবং আমার তাবৎ রচনাকর্মের অভিধা শুধুমাত্র 'লেখা'—অন্য কিছু নয়। কিন্তু এসব পরের কথা। আগের কথায় বরং ফিরে যাই।

অভিজ্ঞতার কথা বলছিলাম। মানুষের জীবনের সবটাই অভিজ্ঞতার উপাদান। এমনকী কড়িকাঠ গোনাও। সেক্ষেত্রে জীবনের খুঁটিনাটি অনুষঙ্গ কোন্‌টাকেই বা আমরা সঞ্চয় হিসাবে কদর না করে পারি? তবে কথা হচ্ছে সঞ্চয়কে কারা মূল্য দিই বা সম্মান করি? জীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়কে যাঁরা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে, মূল্যবান মনে করে গ্রহণ করেন এবং সেসবের বিচিত্র রসায়নকে উপলব্ধি করে সাহিত্যে প্রকাশ করতে সক্ষম হন, তাঁরাই লেখক পদবাচ্য। অভিজ্ঞতার সঞ্চয় এবং তার সারাৎসারের সুচারু তথা শৈল্পিক পরিবেশনটাই ব্যাপার। নিজেকে সেই ক্ষমতার আধিকারিক মনে করার স্পর্ধা আমার নেই।

তথাপি যেটুকু লিখেছি তার প্রস্তুতিপর্বকে অস্বীকার করতে পারি না। একটা জীবন তো কম কথা নয়। তার বিচিত্র আয়োজনকে অস্বীকার করব কী করে? জীবনের প্রাথমিক পর্বের ভৌগোলিক অবস্থান যৌবনের শুরুতেই পরিবর্তন করতে হলে আমার জীবনের মৌল রসায়নের ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের রদবদলের সূচনা হলো। নিস্তরঙ্গ পল্লী-কেন্দ্রিকতার স্থানে একটা তরঙ্গক্ষুব্ধ নাগরিক আবর্তে পড়ে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম তখন। বৌদ্ধিক মাপটা মধ্যমেধারও নয়। অনুকরণ ক্ষমতাটাও রপ্ত নেই। ফলে লেখালেখির একটা মোটামুটি আবহের মধ্যে থেকেও ভেতর থেকে কোনো প্রেরণা বোধ করিনি। সবচেয়ে বড় কথা ফেলে আসা পল্লীজীবনের নিঃসঙ্গতাটার প্রকোপ একেবারে মজ্জায় মিশেছিল। নাগরিক জীবন সেকারণে কোনোদিন আমাকে আকর্ষিত করতে পারেনি। বই পড়া আবাল্য নেশা হলেও নাগরিক জীবনের আলেখ্যে আমার রুচি উল্লেখযোগ্যভাবে নিম্নমানের এবং তা অদ্যাবধি।

আমার তৃতীয় অগ্রজ অত্যন্ত ছোট বয়স থেকেই সাহিত্যচর্চা করত। আমরা দুজন পিঠাপিঠি ভাই। যে সময়টার কথা বলছি, তখন সে এবং তার সমমনস্ক বন্ধুরা কবিতা নিয়ে কিছু কিছু চর্চা করত, লিখতোও কখনো সখনো। সেই বয়সটা এবং ষাটের দশকের শুরুয়াতের সেই সময়টা কবিতারই প্রাবল্যের যুগ। রথীমহারথীরা তখন মধ্য গগনে। বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব, প্রেমেন প্রমুখদের প্রেরণায় নবীনরা ভীষণভাবে চঞ্চল। কিন্তু নবীনদের আলোচনার আসরে সম্পূর্ণ নির্বাক শ্রোতা হিসাবে আমার উপস্থিতি প্রায় নিয়মিত হওয়া সত্ত্বেও তারা যে কবিতা পড়ত বা লিখত তার কিছুই আমার মগজে ঢুকত না। একমাত্র জীবনানন্দ ছাড়া

BanglaBook.org

অন্য কবিদের রচিত কাব্য কবিতা আমার কাছে ধাঁধার মত মনে হত। মনে হত, তাঁরা যেন শব্দ নিয়ে, ছন্দ নিয়ে লুকোচুরি খেলছেন। সেই খেলায় আমি যেন চোর, ধরা পড়ে যাওয়া। তাঁদের এবং অগ্রজের ও তার বন্ধুদের রচিত কবিতার ধরতাইটাই থাকত আমার নাগালের বাইরে। এই সময়টা আমার খুব কষ্টের সময় ছিল। কবিতার প্রতি আকর্ষণ ঐ বয়সে থাকেই। কবিতা বুঝতে না পারা বা লেখার অসামর্থ্য, দুটো ব্যাপারের জন্যই প্রচণ্ড হীনমন্যতায় ভুগতাম। অনুভূতির যে রণণে স্পর্শেন্দ্রিয় থেকে বৌদ্ধিক স্তর পার হয়ে অন্তরিন্দ্রিয়ে অলৌকিক আবেশের সৃষ্টি হয় তার দিশা খুঁজে পেতাম না। জীবনানন্দ বোধহয় প্রথম আধুনিক নামধারী কবি, যিনি তাঁর রূপসীবাংলার পঙ্‌ক্তিগুলোকে প্রায় আমার ফেলে আসা অবস্থানের নির্জন ধান ক্ষেতের আলপথের মত সহজতায় আমাকে হাত ধরে কবিতার এক ভিন্ন উপত্যকায় নিয়ে গেছেন। অন্যথায় জীবিত বা মৃত কবিরা কেউই আমার সঙ্গে সেই সময় কোনো সেতুসংযোগ করেননি। অনেক হীনমন্যতার আগুনে পুড়ে, দগ্ধ হয়ে, তবে বিষ্ণু দে, সুধীন দত্ত, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব ইত্যাদির কিছু কিছু নাগাল পেয়েছি। কিন্তু আজও মনে হয়, আধুনিকতা বা উত্তর আধুনিকতা, যা আজকের বৌদ্ধিক যুযুৎস্যু, তার জটিলতা আমার জন্য নয়। সে-সবের বোধগম্যতায় প্রবেশের প্রস্তুতিপর্বেরে শ্রম এবং সাধনা আমি করিনি। আধুনিকতা, উত্তর আধুনিকতা ইত্যাদি ব্যাপারগুলোর আমার কাছে যে কোনো গ্রাহ্য সংজ্ঞার্থ নেই তার জন্য আমার বোধ এবং মানস গঠনতন্ত্রই সম্ভবত দায়ী। স্বল্প অনুশীলনতো বটেই।

অগ্রজ জীবনের নানান সরল এবং জটিল অলিগলির ঘুরে বিগত শতকে ষাটের দশক থেকে লেখালেখিকেই একমাত্র কর্ম হিসাবে অবলম্বন করেছে এবং অদ্যাবধি তা সচল। সম্ভবত একটা পর্যায়ে তার মনে প্রতীতি জন্মেছিল যে, 'গদ্যং নিকষাংকাব্যম'—কথাটি এক মহৎ সত্য। তদবধি তাঁর সাধনা তদনুসারী। এই সময় থেকেই আমি তার প্রায় সর্বক্ষণের তল্পিবাহক। পাঠক হিসাবে যেমন অন্ধ সমর্থক, লেখার স্বার্থে তথ্যের খুঁটিনাটি সরবরাহের কাঠবেড়ালিগিরি করার অহংকারও আমার ষোলআনা। তাতে তার কোনো লাভ হয় কী না জানা নেই, তবে আমার উপকার ঢের আর আনন্দও অপরিসীম। ওর সাহিত্যিক খ্যাতি আজ আর গল্প কথা নয়। এপারে ওপারে তার গুণমুগ্ধ পাঠক পাঠিকার সংখ্যা যে কোনো সমসাময়িক লেখক, গল্পকারের কাছে ঈর্ষার ব্যাপার। ব্যক্তি এবং

BanglaBook.org

সাহিত্যিক অভিজিৎ সেনের সঙ্গে আমার সহোদরত্ব ছাড়াও এমন একটা সম্পর্ক আছে যা সে বা আমি কখনোই খোল্‌সা করে কাউকে বোঝাতে পারব না। একটা হাল্‌কা কথা শুধু বলতে পারি, আমি তার ছায়া অনুসারী। তার লেখার প্রথম পাঠক যদি সে হয় দ্বিতীয়জন আমি। অন্তত, গত শতকের ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত এর কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। ঐ বছর থেকে আমার লেখালেখির বুড়ো বয়সের ছেলেখেলার শুরু, যা এখনও চলছে। কিন্তু অভিজিতের সামান্য দু-একটা ছোটগল্প ছাড়া, পাণ্ডুলিপির খসড়া থেকে ছাপা হয়ে বেরোনোর পর পর্যন্ত নাগাড়ে পড়িনি এমন একটা লেখাও পাওয়া যাবে না। এই সময়টা থেকেই আমার লেখার মানসিকতার বায়ু, পিত্ত, কফ ইত্যাদি কুপিত হওয়ায়, আমি আর আগের মত দ্বিতীয় পাঠক নেই। তবে তেমন কিছু বিচ্ছিন্নতাও নেই।

বড় ভাই বড় মাপের লেখক হলে ছোটর পক্ষে লেখক হওয়া মুশকিল। বড়র প্রভাব প্রায় অনিবার্যভাবে, সেক্ষেত্রে, ছোটর ওপর পড়েই। সে কারণেই শুরু থেকে আমি তার ধারায় লিখতে চেষ্টাই করিনি। করলেও যে তা হাস্যকরই হতো, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। সে ক্ষমতাই আমার হতো না। একারণেই কথাসাহিত্যের নির্ধারিত বিধি আমার লেখার ক্ষেত্রে রাখিনি। সেটা আমার মৌলিকতা বা স্বতন্ত্রতা, তা নিয়ে বিচার পাঠকের।

আশির দশকের গোড়ার দিকে, একেবারে শুরুতে, আমি চাকুরিসূত্রে ছিলাম ঝাড়খণ্ডের নানান জঙ্‌লা এবং খনি অঞ্চলে। বেশিরভাগটা কেটেছিল তোপচাঁচি এলাকায়। তখন কাজকর্ম ছিল বিভিন্ন আরণ্যক জনজাতিদের উন্নয়ন বিষয়ক। দীর্ঘদিন তাদের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ হয়েছিল তখন। প্রখ্যাত সমাজসেবী এবং লেখক মহাশ্বেতা দেবীর পরামর্শে ও সময় বেশ কিছু নিবন্ধ লিখেছিলাম, যেগুলো তৎকালীন 'বর্তিকা' পত্রিকায় তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে নয়ের দশকে 'কালান্তর' পত্রিকাতেও ধারাবাহিক বেশ কয়েকটা বেরিয়েছিল। আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এবং শুভানুধ্যায়ী প্রয়াত সুনীল সেনশর্মা এবং শ্রীসুনীল মুন্সীর ইচ্ছায়ই ব্যাপারটা ঘটেছিল। ২০০৭ এর বইমেলায় 'টাঁড় পাহাড়ের পদাবলি' নামে একটি ছোট বই গাঙচিল-এর প্রকাশনায় বের করা হয়। এছাড়া আদিবাসী/জনজাতিদের নিয়ে আর কিছু লেখার চেষ্টা করিনি। 'কম্পাস' পত্রিকায় টাঁড় পাহাড়ের কড়চা নাম নিয়ে এই বইএর লেখাগুলি ধারাবাহিক বেরিয়েছিল। সেটা সম্ভবত ১৯৯৭ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত। এসবই পরের কথা। বইয়ে বিষয়টি পুনর্বিন্যাসিত করা হয়েছিল।

BanglaBook.org

আবার অভিজিতের প্রসঙ্গে ফিরি। সত্তরের দশকের আগে অভিজিৎ নিয়মিত লেখালেখি করত না। কিছু গল্পটল্প লিখেছে তখন এবং ছোটবড়, নামী অনামী পত্রিকায় সেসব প্রকাশের পেছনে আমি কিছুটা সচেষ্ট ছিলাম। তার কারণ ছিল এই যে ও তখন পাকাপাকি বালুরঘাটের অধিবাসী, কোলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক সামান্য। সেজন্য ওর লেখা নিয়ে পত্র পত্রিকার দপ্তরে পৌঁছোনো আমার আরব্ধ কর্ম ছিল। বর্তিকার ভূমিকাকে যথোচিত সম্মান জানিয়েও একটা কথা বলতেই হয় যে এর প্রকাশনায় যত্নের অভাব অত্যন্ত প্রকট ছিল। অজস্র ভুল সংশোধন করে পড়া পাঠকদের কাছে সহজ ছিল না। অভিজিতের বিখ্যাত গল্প 'দেবাংশী', যাকে আশ্রয় করে ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থা হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'দেবাংশী' নাটকটির উপস্থাপনা করেছিল, তা বর্তিকাই প্রথমে প্রকাশ করেছিল। অভিজিৎ দীর্ঘকাল বালুরঘাটে বসবাসকালে ত্রিতীর্থের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ছিল এবং সত্তর থেকে মধ্য আশির সময়কালে নাটক নিয়ে কাজকর্ম মোটামুটি ভালই করেছে। ঐ সময়টায় বছরে একবার দুবার আমি ওর কাছে যেতাম এবং প্রত্যেকবারই অন্তত মাসখানেক ধরে থাকতামও ওখানে। সাহিত্য, নাটক ইত্যাদি নিয়ে তখনকার আড্ডার দিনগুলো আমার অত্যন্ত মূল্যবান এবং মধুর স্মৃতি হয়ে আছে। ঐ সময়টাতে আমরা দুজনেই ব্যাপকভাবে সাহিত্যপাঠ এবং আলোচনায় সময় কাটিয়েছি। অভিজিৎ তখন স্থানীয় পত্রপত্রিকা এবং কোলকাতারও বিভিন্ন লিট্‌ল ম্যাগাজিনে অনেক গল্প, ছোট উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রকাশ করে বেশ নাম করেছে। ওর সবচাইতে উল্লেখযোগ্য লেখাগুলো বের হয় এক্ষণ, প্রস্তুতিপর্ব, প্রমা ইত্যাদি কোলকাতাকেন্দ্রিক পত্রিকাগুলোতে। নিজের লেখালেখির প্রস্তুতির কথা বলতে গিয়ে অভিজিতের কথা এত বলার কারণ এই যে ওর একজন সফল লেখক হয়ে ওঠার এই পথপ্রস্তুতিটার সঙ্গে নিরন্তর যুক্ত থাকায় আমারও যেন একটা পরোক্ষ প্রস্তুতি ঘটে চলেছিল। তখন অবশ্য সেটা সজ্ঞানে আমি উপলব্ধি করিনি। আমি যদিও সে অর্থে কিছুই হয়ে উঠিনি। তথাপি যেটুকু যা হয়েছি, তার মিথোস্ক্রিয়ার স্বরূপটা এরকমই।

অভিজিতের ধারার সঙ্গে আমার লেখালেখির ধারার কোনোরকম মিলই যে নেই, একথা আমার পাঠকেরা সবাই জানেন, কিন্তু তার মানে অবশ্যই এ নয় যে আমি তার কাছে আদৌ ঋণী নই। সে ঋণ আমার উপর তার লেখার প্রভাব জনিত নয় বটে, তবে তার স্বরূপটা যে মিথোস্ক্রিয়ার কথা বলেছি তার মধ্যে

BanglaBook.org

নিহিত, অথবা তা যে কী সেকথা আমি পরিষ্কারভাবে নিজেই বুঝি না, অথচ অনুভব করি।

অভিজিতের লেখা আমার অসম্ভব ভাল লাগে। কিন্তু এরকম কখনোই আমার ইচ্ছে হয়নি যে, ওইরকম লেখা মক্‌সো করি, অন্তত চেষ্টা করি। তার কারণ বোধহয় এই যে, আমি নিশ্চয় করে জেনেছি ব্যাপারটা সেরকম আদৌ হবার নয়। আমার এরকম একটা অনুভব আমার মধ্যে যেন অন্তর্লীন ছিলই যে তার উপলব্ধি, অভিজ্ঞতার অংশী আমিও এবং যেহেতু তার উপস্থাপনা চমৎকার, তাই আমার আলাদাভাবে প্রচেষ্টা সেক্ষেত্রে অধিকন্তু এবং অর্থহীন। কথাটা হয়ত হাস্যকর মনে হতে পারে, তবে কোনোমতেই তা অন্যের গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত করার নির্বোধ অহংকার নয়।

লেখালেখির জগতে আমার ঢুকে পড়াটা এতটাই আকস্মিক যে আমার পাঠকেরা কেউ বিশ্বাসই করতে চান না এর পিছনে আমার আদৌ কোনো প্রস্তুতি ছিল। এই আকস্মিক অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত কথা সাহিত্যিকেরা কেউ কেউ প্রায় সামনাসামনিই নানারকমভাবে ঠাট্টা করার প্রয়াস পান, যদিও সেইসব প্রয়াস আমাকে প্রায় স্পর্শই করে না, বলা যায়। তার কারণ এই নয় যে আমি তাঁদের ক্ষুদ্র বৃহৎ শব্দ কীলকের দ্বারা বিদ্ধ হই না। তার কারণ এই যে, আমি প্রকৃতই তাঁদের ক্ষমতাকে শ্রেষ্ঠতর বলে বিশ্বাস করি, কেন না তাঁদের লেখা আমি পড়ি এবং তাতে মুগ্ধ হই। পক্ষান্তরে আমার লেখার দীনতা আমাকে সদা ম্রিয়মানই রাখে। সে যাহোক, এই সরস্বতীর পদ্মবনে মত্তমাতঙ্গের মত আকস্মিক অনুপ্রবেশের কথাটি এবার বলি।

১৯৯২ এর শারদীয়া দেশ পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী মশাইয়ের 'রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিত চর্চা' নামক রচনাটি প্রকাশিত হয়। তার বাকি অংশ পরবর্তী রবিবাসরীয় সাহিত্যের পাতায় প্রকাশিত হয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং যথাসময়ে পুস্তকাকারে পাঠকমন মোহিত করে। দেশ এর রচনাটি পড়ে আমি এবং আমার পরিবারস্থ জনেরা অসম্ভব পুলক এবং উত্তেজনা বোধ করি। সেবার পূজায় বাংলাদেশের বরিশালে গিয়েছিলাম। সেখানে এখনও আমার ভাঙাচোরা পৈত্রিক ভদ্রাসন এবং 'এখনও দাপুটে' শ্বশুরালয় বর্তমান। এর আগে দীর্ঘ প্রবাসবাসের পর ১৯৮৬ সাল থেকে পূজায় ওখানে যেতে শুরু করেছিলাম। ১৯৮৬, ১৯৮৮, ৯০ এবং ১৯৯২ এই চার

BanglaBook.org

বছরের শারদী ভ্রমণই আমার কাছে বড় উত্তেজনাময় এবং প্রগাঢ় নস্ট্যালজিক হয়েছিল। সেই সময়ের অভিজ্ঞতা ও মহার্ঘ চেতনা উত্তাল করেছিল আমাকে। তাই তপনদার লেখা, আর সেই লেখার ভৌগোলিক অবস্থানে পায়ে হেঁটে ভ্রমণ আমার মধ্যে এমন এক আলোড়ন তুলেছিল যে তার পরিণতি মূককে বাচাল করল। অনতিবিলম্বে আমি এক দীর্ঘ, প্রায় আশি পৃষ্ঠার পত্র লিখে, তপনদার অক্সফোর্ডের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম। সঙ্গে তাঁর পিতৃপুরুষের প্রাসাদ এবং মন্দিরাদির ফোটোও পাঠালাম। সেটা সম্ভবত ১৯৯৩ এর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি হবে। কিছুদিন বাদে অত্তবড় চিঠিটার উত্তর এলো একখানা এ্যারোগ্রাম মারফৎ সামান্য কয়েকটি লাইনে। আর কী বিচ্ছিরি তার অক্ষরের চেহারা, যেন খেতে না পাওয়া ফড়িং ছবি হয়ে এ্যারোগ্রামটার গায়ে লেপ্টে আছে। চিঠির বিষয় বস্তুও সেইরকম—আমি কোন্ বাড়ির ছেলে, কোথায় থাকি ইত্যাদি। অমন চিঠিখানার এই জবাব! শুধু একটা কথা ছিল শেষ লাইনে, আগামী জুন মাসে কোলকাতা আসছি। দেখা হবে। ভাবলাম, এটা ডাহা গুল। দেখাটা কীভাবে হবে? উনিতো আর নিজে আমার কাছে আসবেন না। কোলকাতায় এলে আমাকেই তাঁর কাছে যেতে হবে। কিন্তু তিনি উঠবেন কোথায়, তা কী জানি? ঠিকানাইতো জানাননি কিছু। অত্তবড় একটা রসালো পত্তর দিলাম! মনে আশা ছিল বেশ সরেস একখানা জবাব পাব। যাঁর অত চমৎকার একখানা বই বাজার মাৎ করেছে, তার চিঠি না জানি কত্তো সুন্দর হবে। ভীষণ দমে গেলাম। মনে বেশ ভয়ও হলো একটু। ভয়টার কারণ, অধ্যাপক মানুষ আমার এ ছ্যাব্‌লা বাচালতায় (বাখোয়াজিতে) যদি রুষ্ট হন। এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে জুন মাসের কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি এসেছিলেন। তখন লিণ্ডসে স্ট্রীটে আমার আপিস। ঠিকানাটা চিঠিতে দেওয়াই ছিল। সে কাহিনী আমার পাঠকেরা জানেন। আমার সেই আশি পৃষ্ঠার চিঠিই আমার লেখোয়াড়ত্বের প্রকৃত হাতেখড়ি এবং সেটা তাঁরই অনুজ্ঞায়। পরে কিছু বর্ধিত আকারে একখানি কৃশ পুস্তকে তার পরিণতি। তাঁর ছোট রচনার একটি সংকলন বের হলে তিনি মূল পত্রটি সেখানেও ঠুসে দিয়েছিলেন। তো ওখান থেকেই শুরু বলা যায়। লেখাটি জনপ্রিয় হয়েছিল, যদিও তার মধ্যে ভুলের পরিমাণ ছিল লাগামছাড়া এবং আনন্দ পাবলিশার্সের দক্ষতাও তার বিহিত করেনি।

BanglaBook.org

এই অভিজ্ঞতাটা আমাকে সাহসী করলে আমি বরিশাল বিষয়ে আরও ছটি বই, ছোট বড়, পরপর লিখে ফেললাম এবং বন্ধুরা বলতে শুরু করল, 'তাইলে এ্যাদ্দিনে ল্যাখক হইলা?' এর নাম যদি 'ল্যাখক' হওয়া হয়, তবে 'হইলাম'। শুধু মনের মধ্যে একটা খচ্‌খচানি যেন কোথায় কী একটা ভুলভাল কিছু হয়ে গেছে। আমার পাঠকেরা বোধহয় আমাকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়ে ফেলছেন। নচেৎ সর্বমোট ছোটবড় দশখানা বই এর একখানাও লেখক হিসাবে আমার নিজের তৃপ্তির কারণ হলো না কেন? যে বিষাদবৃক্ষ এবং সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম অগণিত পাঠক পাঠিকার ভালবাসা এবং প্রশংসায় আমাকে অভিভূত করেছে, পুরস্কার এনে দিয়েছে, তারও একটা পাতা ওল্টাতে ইচ্ছা করে না কেন?

এইসব নিয়ে এখন যা লিখছি, আমার অন্যান্য লেখার মত তাও স্মৃতিচারণাই একরকম। আসলে স্মৃতি-আলেখ্য ছাড়া, অন্যকিছুই আমার মগজে বা কলমে আসে না। সম্বলই নেই কিছু।

।। তিন ।।

লেখালেখির প্রস্তুতি পর্বে সহায়ক হিসাবে একজন লেখকের ঋণ যে কত কিছুর কাছে, সে বৃত্তান্ত বলে শেষ করা যায় না। তপনবাবুর রোমন্থন গ্রন্থখানি আমার নয়ের দশকের সারস্বত জীবনে আমাকে উজ্জীবিত করলে। প্রথম উল্লাসে ভাটিপুত্রের পত্র বাখোয়াজি এবং তারই ধারা ধরে এরই একটাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারা এবং বিষয় অবলম্বন করে, মহাভারতের বিদুর চরিত্রটি নিয়ে বিদুর গ্রন্থটি প্রথমে ক্ষুদ্রাকারে এবং পরে পরিবর্ধিত আকারে রচনা করেছিলাম। বইটি বিদুরের কথনে উপন্যাস হলেও মূল কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়। শুধু পরম্পরাগত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বাইরে গিয়ে, যুদ্ধবিরোধী বিদুরের দৃষ্টিতে সেখানে কিছু ভিন্ন বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করেছিলাম। বইটি উৎসর্গ করেছিলাম প্রয়াত গোপাল হালদার এবং অরুণ হালদারের উদ্দেশ্যে। অরুণাদি তখন জীবিত। পাটনার রাজেন্দ্রনগরে থাকেন। বইখানা তাঁকে ভীষণভাবে স্পর্শিত করেছিল। তার প্রমাণ তিনি অধমের মত নামগোত্রহীন একজন লেখকের এই হঠকারী স্পর্ধাকে বিশেষ স্নেহে অভিষিক্ত করে ছয় পৃষ্ঠার একখানা পত্র দিয়েছিলেন। এর পর থেকে টেলিফোনে এবং পত্রে অনেকদিন তাঁর আমার

BanglaBook.org

আলোচনা চলে। অরুণাদির সঙ্গে আমার যোগসূত্র ছিলেন প্রয়াত ভূতাত্ত্বিক এবং নদী বিশেষজ্ঞ, আমার সহোদর অগ্রজতুল্য সুনীল সেনশর্মা। তাঁর কাছে শুধু লেখালেখি নয়, একজন মানুষ যে স্নেহের প্রাবল্যে কতরকমভাবে অনুপ্রেরণা যোগাতে পারেন, সুনীলদা ছিলেন তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নানা বিখ্যাত জনেদের, নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে, আমার ছাই পাঁশ লেখাগুলো কিনে গস্ত করে তিনি প্রায় বাধ্য করতেন তাঁদের পড়তে। সুনীলদা এবং তাঁর মারফতে আমি যাঁদের স্নেহাভিষিক্ত হতে পেরেছি, এবার তাঁদের কথা কিছু বলব। এঁরা সবাই আমার পূজ্য এবং প্রস্তুতির সহায়ক।

সুনীলদার সঙ্গে আমার আলাপ যতদূর মনে পড়ে ১৯৯৩-এর কোনো একটা সময়ে। সূত্র, আমার প্রথম লেখা 'ভাটিপুত্রর পত্র বাখোয়াজি' নামক পত্রনিবন্ধটি। তপনবাবুর নির্দেশে সেটি তখন প্রকাশ করেছিলাম নাইয়া নামের একটি অ-সাময়িকী পত্রিকায়। পত্র নিবন্ধটির তখনকার নামকরণ ছিল 'আহ্লাদে ফাউকানো অথবা ভাটিপুত্রর পত্র বাখোয়াজি।' পত্রিকাটির একটি কপি দিয়েছিলাম নীলুদা অর্থাৎ নীলরতন মুখোপাধ্যায়কে। নীলুদা প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তাঁর জীবনীকার। এছাড়াও তাঁর আর একটা পরিচয় হলো শিশু সাহিত্যিক হিসাবে। মানুষটি নানা গুণের অধিকারী, মায় চমৎকার রন্ধন-কলায় নিপুণ। আমরা মধ্য আশির দশক থেকে পরিচিত শুধু নই, আত্মার আত্মীয়ও। যাহোক, নীলুদার কল্যাণে ঐ লেখাটি বেশ কয়েকজন বিদগ্ধ ব্যক্তির নজরে আসে। সুনীলদা তাদের মধ্যে প্রথম। সাধারণ একটি লেখা, তাও চিঠি এবং চিঠির মধ্যে চিঠি যে এরকম একটা ব্যাপক পরিচয়ে আমাকে পরিচিত করবে, তা আমার ভাবনাতেও ছিলই না। সুনীলদা লেখাটির আরও পাঠক বিস্তৃতি ঘটান। বস্তুত, একটিমাত্র সামান্য লেখার মাধ্যমে যে এতটা পরিচিতি লাভ করতে পেরেছিলাম, তার জন্য প্রাথমিক ভাবে তিনজন ব্যক্তির অপরিসীম স্নেহ এবং একজনের সপ্রেম শ্রম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। লেখক হিসাবে যেটুকু হয়ে ওঠা আমার ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে, তার জন্য এঁদের কাছে আমার ঋণ কৃতজ্ঞতা স্বীকারেই শুধু পরিশোধ্য নয়। এঁরা হলেন, শুরু থেকে বললে, তপন রায়চৌধুরী, তরুণ পাইন, নীলরতন মুখোপাধ্যায় এবং সুনীলদা। তরুণ পাইনকে বইপাড়ায় আণ্ডা বাচ্চারাও চেনে। সে আমার অনুজপ্রতিম এবং একদা নাইয়া পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। নীলুদা আরেকজনকে লেখাটি

BanglaBook.org

পড়িয়েছিলেন। তিনি সম্প্রতি পরলোক গমন করেছেন। সারস্বত জগতে জ্যোতিভূষণ চাকির নাম শোনেননি বা জানেন না, এরকম কেউ যদি থাকেন, তবে তিনি দুষ্ট সরস্বতীর সেবকমাত্র। কিন্তু তাঁর কথা ভিন্ন অধ্যায়ে ব্যাপক বলব।

সুনীলদাও অকালে প্রয়াত। বয়স যাই হোক, এইসব আত্মীয় মানুষেরা যখনই বিদায় নেন, সেটা শুধু অ-কাল নয় দুষ্কালও বটে। প্রস্টেটে ক্যানসার ধরা পড়ার মাস তিনেকের মধ্যে তিনি চলে গেলেন। বেলভিউতে শেষ যেদিন দেখা করতে যাই, হুইল চেয়ারে করে তাঁকে ডায়ালিসিসে নিয়ে যাবার সময়ের হাত নেড়ে বিদায় নেওয়াটা আক্ষরিক অর্থেই শেষ বিদায় ছিল। তার দুদিন পরই টেলিফোনে জানলাম সেইদিনই সকাল নটায় তিনি চলে গেছেন। ছোট্টোখাট্টো চেহারার ঐ মানুষটির মৃত্যুর ভার আজও আমাকে ন্যুব্জ করে। কিন্তু রোগগ্রস্ত হবার আগে এবং রোগশয্যায় থেকেও তিনি আমাকে যে কী অপরিসীম ভাবে উৎসাহ অনুপ্রেরণা এবং উদ্যম জুগিয়েছেন তার তুলনা আজ পর্যন্ত নজরে আসেনি। ইতিমধ্যে, অর্থাৎ ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত আমি লিখে ফেলেছিলাম, প্রাগুক্ত পত্র-নিবন্ধটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা ছাড়াও, বিদুর, সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম এবং পরিবর্ধিত বিদুর। ১৯৯৬ এর মধ্যেই এর সবকটি প্রকাশিত হয়েছে এবং বিষাদবৃক্ষ লেখা শুরু হয়েছে। সুনীলদা বিষাদবৃক্ষের কম্পিউটার কম্পোজের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তার ছোট জামাতা সৌমিত্রকে দিয়ে। সৌমিত্রই বইটা ছাপার ব্যবস্থাও করেছিল। সুবর্ণরেখা প্রকাশনীর নাম ব্যবহার করে নিজের খরচে পাঁচশো কপি ছেপেছিলাম। এ ব্যাপারে কৃতিত্ব সুনীলদা এবং তাঁর জামাতা সৌমিত্রর, ভুল ত্রুটির দায় আমার, কারণ Proof টা আমিই দেখেছিলাম। আমার একটা তৃপ্তি এই যে সুনীলদা বিষাদবৃক্ষের একটা প্রিন্ট-আউট পড়ে যেতে পেরেছিলেন এবং তাঁর গুরুপ্রতিম অগ্রজ বন্ধু ডঃ শিশির সেনকে পড়িয়েছিলেন। সুনীলদা জীবিত থাকতেই শিশিরদার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা গাঢ় হয়। তিনি এবং সুনীলদাই প্রথম বিষাদবৃক্ষ সম্পর্কে অপরিসীম আশাবাদী হয়ে আমাকে বইটির দ্রুত প্রকাশনার জন্য তাড়া দিতে থাকেন। ২০০২ এর কোনো একটা সময়ে সুনীলদারই আগ্রহে, শিশিরদা মারফৎ আমি বর্ষীয়ান অধ্যাপক ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের সান্নিধ্যে যাই। তাঁকে প্রকাশিত বই ও বিষাদবৃক্ষের লাস্ট প্রিন্ট-আউটটি পড়ালে তিনি বললেন, এটিকে এক্ষুণি

BanglaBook.org

প্রকাশ করা প্রয়োজন। এই লেখা দীর্ঘজীবী হবে। পাব্‌লিশার না পেলে নিজের খরচে ছাপাও। বস্তুত তাঁর মত একজন ব্যক্তিত্বের প্রশ্রয় পেয়েই আমি ঋণ করেও বইটির ছাপার খরচ জোগাড় করেছিলাম। এইসব কথা খুব বেশিদিনের নয়, তবু মনে হয় যেন কতযুগ পেরিয়ে গেছে তারপর। রবিদা বিষয়ে 'রশ্মিদ রবি এবং কেরাচিনির অম্ফ' নামে একটি হালকা প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিশদে লিখেছি।

সুনীলদা আর একজন মানুষকে আমার 'ভাটিপুত্র' রচনাটি পড়িয়েছিলেন। তিনি শ্রীদ্বিজেন শর্মা। এক রাতে টেলিফোনে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আরে শোনো দ্বিজেন শর্মার কোনো লেখা পড়েছ, তাঁর নাম জানো? তিনি তোমার ভাটিপুত্র পড়ে ভীষণ মুগ্ধ। আমার সঙ্গে সরাসরি আলাপ নেই, তবে লেখা পড়েছি তাঁর। সুলেখক এবং মস্কো প্রগতি প্রকাশনায় অনুবাদকের কাজ করেন। আমার এক বন্ধুর বন্ধু। বললাম, লেখা পড়িনি তবে আমি একজন দ্বিজেন শর্মাকে জানতাম, যিনি বরিশাল বি. এম. কলেজে বোটানির অধ্যাপক ছিলেন। মাস দুয়েক তাঁর ছাত্র ছিলাম। নিজের এলেম না বুঝে ভুল করে ইন্টার মিডিয়েট ক্লাসে বিজ্ঞান নিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। পরে কলাবিভাগে চলে যাই। ঐ মাস দুয়েককাল আমি দ্বিজেন শর্মার ছাত্র ছিলাম।

—কী আশ্চর্য। তিনি কিন্তু তোমাকে দেখার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করছেন।

—কিন্তু তিনি তো এদেশে থাকেন না। তিনি এদেশে চলে আসেননি। তাঁর স্ত্রী দেবিদি আমার স্ত্রীর সহকর্মিনী ছিলেন বরিশাল উইমেন্স কলেজে।

—তিনি শিগ্‌গিরই এদেশে আসছেন, তখন দেখা হবে। ইতিমধ্যে তোমার যে কটা বই বেরিয়েছে, সব আমাকে এক কপি করে দাও। লাড্‌লি আমার বন্ধু, এখানে এসেছেন, ওঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দেব। ডঃ শর্মার দ্বিতীয় আস্তানা বাংলাদেশের ঢাকা শহরে, যদিও সিলেট জেলার মানুষ।

জীবনের সুখ সৌভাগ্যের দরজা বোধহয় এভাবেই খোলে। আমরা তার খেয়াল রাখি না। জীবনের দাহটাই বেশি করে দাগ কেটে বসে আমাদের মনে। ওটাকেই একমাত্র পাওনা হিসাবে মনে করি। শিশুকাল থেকে এই আমার একটা মস্ত অসুখ। পছন্দের কিছু, আনন্দের, ভালবাসার ক্ষণগুলি বড় দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। দুঃখ আর তাপ আর তার দাহ যেন চিরস্থায়ী মনে হয়। একারণেই কী জ্ঞান হওয়ার পর থেকে কারণে অকারণে বিষণ্ণতাকেই ধ্রুব মেনে নিয়েছি? কিন্তু তার স্থায়িত্বও তো শেষ বিচারে ক্ষণিকত্বের সত্যেই বাঁধা।

BanglaBook.org

সুনীলদা তাঁর বিষয়ের বাইরের বিষয় নিয়ে কম মগ্ন ছিলেন না। ছোটবড় নানা পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ নিবন্ধের বিষয়, ভূতাত্ত্বিক গবেষণার গণ্ডি পেরিয়ে কতকিছু নিজেই না সরস আলেখ্য সৃষ্টি করেছিলেন। সেসব অবশ্যই ব্যাপক পাঠকদের দরবারে পৌঁছায়নি। নিজের পরিচয় গোপন রাখার এক অদ্ভুত স্বভাব ছিল তাঁর। আলাপের কিছুদিন পরে, অত্যন্ত সলজ্জভাবে একদিন তিনি তাঁর পুস্তকাকারে প্রকাশিত একটি ক্ষীণকায় বই আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। ছায়াবৃতা। সূচীতে রচনা নির্দেশনা ছিল এরকম—

ছায়াবৃতা—১

ছায়াবৃতা—২

ছায়াবৃতা—৩

ছায়াবৃতা—৪ থেকে ছায়াবৃতা ৭ অবধি।

নিজের হাতে লিখে দিয়েছিলেন, সদ্যলব্ধ চিরকালের সুহৃদ মিহির সেনগুপ্তকে।

সুনীল সেনশর্মা

২৮/৫/৯৪

মাত্র ১০৬ পৃষ্ঠার একটি চটি বই, প্রথমে শ্রীযুক্ত অশোক সেন মশাই এর 'বারোমাস' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এবং পরে অরুণাদির সুপারিশে পুঁথিপত্র থেকে বই আকারে। কর্মসূত্রে নেফা অঞ্চলে (বর্তমান অরুণাচল) থাকার সময়ে দেশটাকে তিনি যেভাবে দেখেছিলেন, তারই মনোজ্ঞ আলেখ্য এটি, যদিও তাঁর ভাষায় 'ওসব এক অজাগতিক পরিবেশে আদিমতার মাঝে আবোল তাবোল চিন্তার হিজিবিজি রূপলেখা। ঐ 'মেঘমুলুকের ঝাপসা রাতে' বা 'আদিম রাতের চাঁদিম হিম' জাতীয়।

তা তিনি যাই বলুন, বইখানা প্রকাশের ব্যাপারে যে চারজন মহারথীর নাম ওতপ্রোত, তাঁরা সবকজনই সাংস্কৃতিক অঙ্গনের হেভিওয়েট। তাঁরা হলেন, অরুণা হালদার, গোপাল হালদার, অচ্যুতানন্দ সাহা এবং শ্রী অশোক সেন ('বারোমাস' পত্রিকার কর্ণধার)। এঁদের মধ্যে প্রথম তিনজন প্রয়াত। অশোকদা অনুগ্রহ করে ইহজগতটাকে এখনও তুচ্ছ বোধ করছেন না। বইটি পড়ে আমার মনে হয়েছিল, আমি যদি আমার কলমটাকে সুনীলদার কলমের অনুসারী করতে পারতাম বা সামান্যতম রকমেও যদি ঐ প্রসাদগুণ আমাতে বর্তাতো, আমার লেখাও হয়ত লেখা পদবাচ্য হতো। কিন্তু ক্ষোভের কথা এই যে, সুনীলদা ঐ

BanglaBook.org

পথে আর হাঁটেননি। তাঁর নিজস্ব বিষয় ভূতত্ত্ব বা নদী সম্পর্কীয় লেখা ছাড়া, তিনি প্রায় লিখতেই চাইতেন না।

আমার লেখালেখি বিষয়ক এই পরিক্রমায় সুনীলদার ভূমিকার কথা শেষ হবার নয়। কত গুণী এবং বিদ্বজ্জন তথা কলাবিদদের সঙ্গে যে তিনি আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। কীভাবে যে তিনি আমাকে তাঁদের সামনে তুলে ধরবেন যেন তার উপযুক্ত ভাষাই খুঁজে পেতেন না। আমার ভীষণ লজ্জা আর অস্বস্তি হতো। যেমন সুনীলদা, তেমনই তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিনী মণি বৌদি, এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায়। নিজেকে যে কী অপরিসীম ভাগ্যবান বলে মনে হয়, লিখে বোঝানো যাবে না। আমার কলম-নবিশীর এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের অবদানের কথা পরিমাপ হয়না। কিন্তু একই সঙ্গে চরম দুর্ভাগ্য আমার। তাঁদের সংশ্রব বড় ক্ষণস্থায়ীই হল। সুনীলদার সেই ছায়াবৃতার উপরে লেখা— 'সদ্যলব্ধ চিরকালের সুহৃদ' কথাটি আমার তরফ থেকেই বোধহয় অধিক সত্য। সুনীলদা মারা যাবার পর বৌদি চলে গেলেন ছেলের কাছে দুর্গাপুরে। কিছুদিন ফোনে যোগাযোগ রেখেছিলাম। কিন্তু চোখের অদর্শন মানুষকে বোধহয় অকৃতজ্ঞ করে। বহুদিন কোনো যোগাযোগ নেই, সংসারের নিত্য নতুন চাহিদার কাছে নিজেকে বন্ধক রেখে সবার কথাই ভুলে বসে আছি। ফিরে চাওয়ার সামান্যতম সময়ও যদি হৃদয় বরাদ্দ রাখত!

BanglaBook.org

।। চার।।

আমার কপালটাই অদ্ভুত। সেটা ভাল না মন্দ, তা সবসময় ঠাহর করে উঠতে পারি না। মানুষের সব আকাঙ্ক্ষা মেটে না। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ আকাঙ্ক্ষার তো শেষ নেই, তাই সব আর মিটবে কী করে? আমার আকাঙ্ক্ষাগুলো অনেকই মেটে, তবে তা বড় দেরিতে। সারাজীবন যেসব মানুষের সংসর্গ আমি আকাঙ্ক্ষা করেছি, তার অনেকটাই মিটেছে, কিন্তু তার ঘটনাকাল এমন অসময়ে যে, সেইসব মানুষদের তখন আর সময় নেই। তাঁদের ছায়া তখন পূর্বদিকে ক্রমশ লম্বা হয়েই চলেছে। আসলে আমি আমার সারস্বত চর্চার শুরুটাই এমন একটা সময় করেছি যে নিজের ছায়াটাও ঐ পূর্বাচলের পানে লম্বা হতে শুরু করেছে। এখন যাঁদের ছায়া এক এক করে চিরকালীন অন্ধকারে

মিলিয়ে যাচ্ছে, তাঁদের কথা ভাবতে বা লিখতে বসে, মনে হচ্ছে, আরে! এত তাড়াতাড়ি? এইতো সেদিনই না টেলিফোনে বলছিলেন, 'করো ত্বরা, করো ত্বরা, ত্বরা করো ত্বরা, কাজ আছে মাঠ ভরা', তা সেসব ফেলে রেখে তিনি গেলেন কই আর কেনই বা? সঙ্গে সঙ্গে নিজের ছায়াটাকে আরো পূর্বদিকে অধিক প্রলম্বিত দেখতে থাকি। কিন্তু 'ত্বরা করা আর হয়ে ওঠে না। মহাকবির সংলাপ ভেসে আসে 'Everything is rotten in Denmark'' মনের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাকেই Denmark বলে মনে হয়। তখন এক চিরায়ত অমোঘ বিষণ্ণতায় মূহ্যমান হয়ে পড়ে থাকি। দিন যায়। সময় আবার কিছু উজ্জীবনের আয়োজন করে। নচেৎ যে রক্ষা নেই।

সম্প্রতি ঢাকা গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম আত্মীয়বিয়োগে বিধ্বস্ত মনটাকে খানিক ধাতস্থ করার আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু সে দেশটা আমার অতি প্রিয়তমা জন্মভূমি হলেও, আমাকে সামান্যতম ধাতস্থ করতে পারল না। বিগত বছরের সিডার নামধারী সমুদ্র-দস্যু তাকে এমন ধ্বস্ত করে রেখেছে এবং এই রাজধানী শহরটির হালও এমন হয়েছে যে মন তো দূরস্থান, সেখানে ক্ষণকালের স্থিতিও অসহ্য দেহের দাহ পর্যন্ত দূর করতে পারে না। ঠিক সেই সময়ের একটি রাত্রের মধ্যযামে টেলিফোনে স্ত্রী জানালেন, জ্যোতিভূষণ চাকী মশাই আজ চলে গেলেন।

জ্যোতিবাবুকে আমি মেসোমশাই ডাকতাম, তাঁর স্ত্রীকে মাসিমা। তিনি আমার তিন অগ্রজের মাস্টারমশাই ছিলেন, তাঁদের স্কুল-জীবনের প্রথম দিকে। তাঁদের কাছে জ্যোতিমশাই এর হরেক গল্প শুনেছি, নানা প্রসঙ্গে, বিশেষত বাল্যস্মৃতি রোমন্থনের সময়। কিন্তু তখন তাঁর সঙ্গে আলাপ করার কোনো হেতু বা সুযোগ ঘটেনি। তিনি ক্লাসের কাকে মজা করে কী নাম দিতেন, কী কী গান করতেন, কী সব ছড়া চট্ জলদি বানিয়ে ফেলতেন ইত্যাদি শুনে শুনে সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ আমার মনে কেমন যেন একটা বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, আমি তাঁকে বহুকাল ধরেই চিনি এবং তিনি আমারও মাস্টারমশাই। তখনও আমি তাঁকে চাক্ষুষই করিনি যদিও। মাস্টারমশাই হিসাবে তাঁর অসাধারণত্বের গল্প বলার সময়, দাদারা কেমন যেন আত্মহারা হয়ে পড়তেন। আমি তখন সদ্য আমার মাস্টারমশাইয়ের সংসর্গ ছেড়ে এদেশে এসেছি। জ্যোতিমশাইয়ের নানান গুণপনার কথা শুনে শুনে, তাঁর সঙ্গে আমার ফেলে আসা দেশের

BanglaBook.org

শিক্ষকদের তুলনা করতে গিয়ে বড় মন খারাপ হত। কারণ তাঁদের মধ্যে এমন একজনও ছিলেন না, যাঁর মধ্যে জ্যোতিভূষণ চাকীর মত অতসব গুণের সমাহার দেখেছি। একজনকে পেয়েছিলাম, যিনি আমার প্র-পালক শিক্ষক। শিক্ষক হিসাবে তিনি অবশ্যই চমৎকার ছিলেন, কিন্তু তা শুধুই শিক্ষক হিসাবে। তাঁদের মধ্যে ছাত্রদের আকর্ষণ করার জন্য ছড়া বাঁধার, গান গাওয়ার বা গাওয়াবার, নাটক করাবার কুশলতা তো ছিল না। সে কারণেই দাদাদের ভাগ্যে ঈর্ষান্বিত বোধ করতাম। আমার সেই মাস্টারমশাইও বিভিন্ন বিষয় অবলীলাক্রমে পড়াতে পারতেন জ্যোতিমশাই এর মতই এবং যে কোনো শ্রেণীতে, কিন্তু মৌলবী সাহেব অনুপস্থিত থাকলে, আরবী উর্দু পড়াতে পারতেন না। দাদার কাছে শুনেছি, একটা ক্লাসে পণ্ডিতমশাই আসেননি বলে সেই ক্লাসে সংস্কৃত পড়িয়ে, মৌলবী সাহেবের অনুপস্থিতির কারণে অন্য ক্লাসে আরবীও তিনি অক্লেশে পড়িয়ে আসতেন। আবার অঙ্কের ক্লাসেও নাকি উত্তম গণিত শেখাতেও তাঁর অসুবিধে বা আপত্তি হতো না। এমন একজন শিক্ষকের কাছে আমি পড়তে পাইনি, এমন কী সেই মানুষটি কে তখন দেখতেও পাইনি, এ দুঃখ আমার বহুকাল ছিল।

আমার বড়দাও ছিলেন সংস্কৃতিমনস্ক গুণী মানুষ। গান, নাটক, আবৃত্তি, ছড়া লেখা, পদ্য লেখা এসব যেমন পারতেন, তেমনি তাঁর দক্ষতা ছিল আঁকা, বাঁশি বাজানো এবং সর্বোপরি শিশুদের নিয়ে এইসব তালিম দেওয়ায়। জ্যোতিবাবুর সঙ্গে তাঁর বেশ হৃদ্যতা ছিল। তাঁদের দুজনের পরিচালনায় অন্তত দুটি নাটক আমি দেখেছিলাম রামকৃষ্ণ মিশন কালচারাল ইনস্টিটিউটের প্রেক্ষাগৃহে। একটির নাম 'অঙ্কমালার দেশে' অপরটি 'ছড়ার দেশে আনন্দ'। এর মধ্যে কিছু ছড়া বড়দার তো কিছু জ্যোতিমশাইয়ের। সুর বেশিরভাগই জ্যোতিবাবুর। আজও 'মাহিন্দরের বড় ব্যাটা মেঘনাদ গো' বা 'শূন্য কোথায়? শূন্য কোথায়?' এই টুকরো টাক্‌রা লাইন মনে পড়ে। ঢাকুরিয়ার পূজারিণীর আসরের তখনকার শিশুরা আজ বোধহয় সবাই শিশুদের পিতামাতা হয়ে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছে। তাদের এইসব মনে থাকার কথা। কিন্তু তখন বড়দাকে অনেকবার অনুনয় করেও জ্যোতিমশাই মানুষটিকে দেখার সুযোগ হয়নি। আসলে সেটা যে তাঁর অনিচ্ছা ছিল এমন নয়, হয়ে ওঠেনি।

BanglaBook.org

এই সব ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭ সালের কথা। তখন আমার বয়স ১৭ থেকে ২২। বড়দা, জ্যোতিমশাই সদ্য প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, এমন কী জ্যোতিমশাই সবে বা বার্ধক্যস্তরেই উঠে গেছেন। সে যাই হোক, এইসব সাংস্কৃতিক ব্যাপার স্যাপারে দুজনেরই মানসিকতা শৈশব থেকে পৌগণ্ডের বিষয়ের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে। কিন্তু ৬৭'র সময়টায় আমি অকস্মাৎ যেন ছিন্নরশি-ষণ্ডবৎ। সুতরাং এইসব শিশু পৌগণ্ড সুলভ ব্যাপার স্যাপারে আমার কোনো চাঞ্চল্য বা উৎসাহ ছিল না। যে ব্যাপারে ছিল, তাও তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে অনেকেই শিশুসুলভ চপলতা বা infantile disorder বলে ব্যঙ্গ করতে থাকলেন। অর্থাৎ আমি তখন অত্যন্ত উগ্রভাবে সমাজবিপ্লবের জগতে ঘোরাফেরা করছি এবং সাংস্কৃতিক জগতের এই ব্যাপারগুলো আমার বা আমাদের কাছে পুতিগন্ধময় বুর্জোয়া ব্যাপার স্যাপার। বড়দারও তাই। এসবের ডামাডোলে মন থেকে জ্যোতিমশাই উধাও।

একটু খাপছাড়াভাবে হলেও একটি কথার কৈফিয়ৎ দিয়ে রাখি। জ্যোতিভূষণ চাকীকে আমি এই স্মৃতিচারণায় কখনো জ্যোতিবাবু, কখনো, জ্যোতিমশাই, কখনো জ্যোতিভূষণ চাকী এই পুরো নামটি ধরেই উল্লেখ করে যাচ্ছি। অন্য নামগুলো নিয়ে সমস্যা নেই, কিন্তু জ্যোতিমশাই শব্দটি হয়তো অনেকের কানে অশোভন বা অদ্ভুত শোনাতে পারে। তবে কৈফিয়ৎ এই যে শব্দটি আমি শুনেছিলাম পূজারিণীর আসরের একটি কিশোরীর মুখে। আরও অনেক সভ্য সভ্যারাও নামটি ব্যবহার করত এবং নামটি আমার বেশ পছন্দের, যদিও পরবর্তীকালে যখন আলাপ পরিচয় হলো, আমি তাঁকে মেসোমশাই বলেই সম্বোধন করতাম। প্রথমদিকে দুএকবার মাসতুতোমশাইও বলেছি। কিন্তু তাঁর ছাত্র না হতে পারার সুবাদে, ঐ ডাকটা স্থায়ী হয়নি। মনের অভিমানটা বড় বেয়াড়াভাবে বাধা সৃষ্টি করে রেখেছিল। এসব কথা উল্লেখের কোনো বিশেষ হেতু নেই। তবে বলতে যখন বসেছি, খুঁটিনাটি সবই বলি না কেন।

এদেশে আসার তিরিশ বছর পরে তাঁর সঙ্গে আমার সামনাসামনি সাক্ষাৎ হয়। সেই ঘটনাটির কথা আমার পক্ষে আত্মপ্রশংসার হলেও আমাকে বলতে হবে। অন্য অনুরূপ অনেকের সঙ্গে আলাপের কারণের মত, তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রটিও আমার 'ভাটিপুত্রর পত্র বাখোয়াজি' নামক রচনাটি। নীলুদার, মারফতে ঘটেছিল বহু অপেক্ষিত তথা কাঙ্ক্ষিত এই পরিচয়, নীলুদার ক্রিস্টোফার রোডস্থ ফ্ল্যাটে। রচনাটির ভাষা ও বিষয়বস্তুর গোত্র ছাড়া ধরনটির

BanglaBook.org

জন্য জ্যোতিমশাই এর খুব পছন্দ হয়েছিল সেটি। লজ্জা লজ্জা ভাব নিয়ে বলেছিলাম, যে ব্যাপারটি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সে বিষয়ে তো আমার কোনো প্রথাগত বা রীতিসম্মত পড়াশোনা নেই, সেসব থাকলে হয়ত ভাল হতো। প্রসঙ্গত লেখাটিতে ভাষা এবং শব্দ নিয়ে আমার কিছু বক্তব্য এবং আলোচনা তাঁর ভাল লেগেছিল। বলেছিলেন, প্রথাগত এবং রীতিসম্মত কাজকর্ম ঢের দেখেছি। তাতে অরিজিনেল কিছু হয় না। যাঁরা বড় কাজ করেছেন, তাঁরা রীতি, প্রথা ভেঙেই খাস কিছু করেছেন। জ্যোতিমশাই ভাষা, শব্দ নিয়ে কতটা ভিন্ন ধারায় চিন্তা ও কাজ করতেন, তা পরবর্তী কালে বাগার্থ কৌতুকী নিয়ে যখন দেশ এ ধারাবাহিক লিখতে শুরু করলেন, সবাই নিশ্চয়ই লক্ষ করে থাকবেন। তখন আমি তাঁর সঙ্গে রীতিমত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। কাঁকুলিয়ার বাসায় যাতায়াত চলছে মাঝে মাঝে। বস্তুত আমার ঐ 'ভাটিপুত্রের পত্রবাখোয়াজি' নামক লেখাটি জ্যোতিমশাই ইত্যাদি গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, আমি সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম রচনাটিতে হাত দিই। জ্যোতিমশাই এ সময়টায় আমার নিয়মিত দূরভাষি-মনিটর। প্রথম উপদেশ, কোনো লেখককে লেখা পড়ে শোনাবে না। প্রথমে দলিলায়নটা একটানা করে যাবে। তারপর পরিমার্জনা, পর্বভাগ ইত্যাদি। গান ব্যবহার করলে, কম্পোজ করার আগে সুরটা মাথায় কদিন ধরে খেলাবে। যে লেখা স্বাভাবিক ভাবে আসবে, তাই লিখবে। বনাওটি ততটুকুই থাকবে, যতটুকু অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রতিতি একদম ফলাবে না। প্রতিটি কথা, দাড়ি, কমাসহ মনে আছে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, মেসোমশাই, গল্প, উপন্যাস লিখতে গেলে কীভাবে তৈরি করব নিজেকে বা লিখব?

—দেখো, ও ব্যাপারে একটা ভিন্ন প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। বিভিন্ন ছোট ম্যাগাজিনে লিখেলিখে দীর্ঘকাল ধরে হাত আর মগজ মেজেঘষে পালিশ করলে ভাষা, ভাব, কল্পনা, ঠাটবাট এইসব তৈরি হয়। চরিত্র নির্বাচন করতে অনুশীলন করতে হয় মানুষকে। আরও অনেক কিছুই শিখতে হয়। কিন্তু সেসব বলে বোঝানোর ব্যাপার নয়। তবে একটা সরলসোজা কথা বলি, তোমার লেখা পড়ে মনে হয় ওটা তোমার ক্ষেত্র নয়। আমি বলি কী, ঐসব প্রথার মধ্য দিয়ে যাওয়ার বয়স বোধহয় তোমার আর নেই। ওসব নিয়ে ভেবো না। বরং তোমার স্বাভাবিক ক্ষেত্রে, তোমার যা আসে, তাই নিয়ে কাজ করে যাও। তার মধ্য

BanglaBook.org

থেকেও তো কিছু গল্প বা উপন্যাস গড়ে উঠতে পারে। নাহয়, অন্য কিছুই হোক। আসলে, পরিবেশনার পদ্ধতি, বিষয় এবং ভাষাটাই ব্যাপার। ভাষাটা মাধ্যম।

একটি সুন্দর উপমান দিয়েছিলেন মশাই—ভবাপাগলার গান শুনেছ তো? ঐ যে রাজার কথা আছে না, রাজার চৌঘোড়ার গাড়ি, হাতে চন্দনের ছড়ি, আগুপাছু মোগোল পাঠান যায় দড়োবড়ি।' একটি সুদৃশ্য, শোভন রচনাকর্মের সঙ্গে এর অর্থ-পাট মিলিয়ে দেখ, দেখবে কেমন খাপ খায়। আরে, রাজা চলেছেন, তাঁর পোষাক আসাক, ঠাটঠমক, জাঁকজমক রাজার মতন না হলে, লোকে তাঁকে তাকিয়ে দেখবে কেন হে? তবে হ্যাঁ, ছুতোর, কামার, কুমোর বা হেলেচাষি তাদের কথা বলতে গেলে কিন্তু আবার অন্য কথা। সেও ভবা পাগলা তাঁর গানে বলেছেন। গিরি-রাজকে বাগ্‌দি বানিয়ে, তাঁর মেয়ে উমাকে বাগ্‌দিনীর সাজে সাজিয়েছেন তিনি। কালিদাসীয় সূক্ষ্মতায় রাখেননি তাঁর বিন্যাস। সেখানে তিনি বাগদিনীর বেশে শ্যামাকে সাজিয়েছেন, বলেছেন—

চল্ বাগদিনীর বেশে
শ্যামা মা আমার সঙ্গে চল্।
হাতে নে মা মাছের খালুই
কাঁধে নে মা বেঁকি জাল
চল্ বাগদিনীর বেশে—।

কী বললাম কিছু বুঝলে?—যখন বলেছিলেন তখন বুঝেছিলাম ঠিকই, কিন্তু অনুসরণ করাটা হলো কী না, তা আজ আর কে বলে দেবে? তিনি তো বলা কওয়ার বাইরে চলে গেলেন। এমন একটা বয়সে গেলেন, যে চোখের জল ফেলতে গেলেও লোকে পাঁচকথা বলে মস্করা করবে। আর আমিও যে তাঁর বুড়ো-খোকা। কাঁদি কোন্ আক্কেলে?

সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম তাঁকে দিয়েছিলাম। পরে এদিক ওদিক দাতব্য করতে আরো কয়েক কপি নিয়েছিলেন। বইটি পড়ার মধ্যে একদিন ফোনে জানার ইচ্ছে হয়েছিল, কী প্রতিক্রিয়া। বাড়ি ছিলেন না। মাসিমা তখন সুস্থ। ফোনটা তিনিই ধরেছিলেন। বলেছিলেন, পড়া শেষ হয়নি। তবে পড়তে পড়তে, একা একাই হাসছেন, চোখও মুছছেন। শুনে ভাল লেগেছিল। কয়েকদিন পর একটি পোস্টকার্ড পেলাম। খুদে খুদে অক্ষরে ঠাসা। পাঠটির উদ্ধৃতির লোভ সামলাতে পারছি না। এ যে আমার অমূল্য সম্পদ। চিঠিটি এরকম—

BanglaBook.org

৮১ কাকুলিয়া রোড,
কলকাতা-২৯ ৩১.৫.৯৮

স্নেহের মিহির,

আমি এখন উৎসে। ফকির সাহেব, মোকছেদ, কার্তিক আর ছোমেদদের মধ্যে।
সবই অমৃত—না, না—অমের্ত।

আমার কী মনে হয় জান মিহির, যে ঘ্রাণটা নাকে আসে তা চিরকালের মানুষের উৎসের ঘ্রাণ। শুধু নস্ট্যালজিয়ায় তা বোঝায় না।

লোক ভাষাতে মাটির পরাণ কান্দে। তোমার সিদ্ধিগঞ্জের মোকামএ, মোকাম কথাটাও চম্‌কে দিল আমাকে। সুফি ফকিররা গন্তব্যের প্রান্তলোককে বলে মোকাম। আশ্চর্য নামকরণ! হৃদয়রসে জারিত—না—মানবরসে জারিত তোমার এই বাঙময় উপহার আমার জীবনে এক মহার্ঘ প্রাপ্তি। আশীর্বাদ নাও।

জ্যোতিভূষণ চাকী।

[আমার একটা কাজ করে দাও। যে কোনো একটা বাক্যকে ওবাংলার অন্তত চারটে লোকভাষায় (আঞ্চলিক) এবং এ বাংলার চারটে লোকভাষায় তর্জমা করে দাও]—এ খেলাটা বাক্য ও শব্দের ব্যাপারে আমাদের বহুদিন চলেছিল। মনে হয়, এটাও আমাকে হাতে ধরে প্রস্তুতির পথে নিয়ে যাওয়ার, তাঁর একটা পদ্ধতি। আমার চাইতে ভাগ্যবান শিষ্য তাঁর আর কে আছে? দেরিতে পেয়েছি বটে, তবে ভাগে কম পড়েছে, এমনটা বলতে পারব না।

নীলুদার দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাটেও কখনো কখনো বৈঠক হয়। কতভাবে তিনি যে শেখান কতকিছু, তার কোনো হিসাব নেই। আমার মনোবাঞ্ছা এতদিনে পূর্ণ হয়েছে। যেভাবেই হোক, শিক্ষক হিসাবে তো শেষ তক্ পেয়েছি তাঁকে। না

BanglaBook.org

হয়, তাঁর ক্লাসে পড়ুয়া নাই হলাম। এখানেও রীতি পদ্ধতির রাস্তা ধরে নয়। আমার লেখালেখির যে প্রথা-বিরুদ্ধতার কথা আমি মাঝেমাঝেই বলি তার পিছনে জ্যোতিমশাইয়ের একটা গূঢ় প্রশ্রয় এবং ইচ্ছা যে খুবই সক্রিয় ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। আবারও বলছি, এইসব স্মৃতিচারণা করা মানে খানিকটা যে আত্মপ্রচার, তাতে ভুল নেই। কিন্তু তা এড়ানো যাচ্ছে না। ঐ সময়টা, সন তারিখের হিসাবে নব্বই এর দশকের মাঝামাঝি কী শেষের দিকেই হবে। তাঁর বাগার্থ কৌতুকী তখন চলছে। প্রায় রাত্তিরেই ফোনে কিছু নির্দেশ দেন। একদিন বললেন, আরে তোমাদের বরিশালিয়াদের 'ইশে' বলে একটা বাগ্‌বিধি আছে না?—বললাম, শুধু 'ইশে' তে থামলে তো চলবে না, তৎসহ 'কচু' আছে। আর ওটাতো শুধু বরিশালিয়া নয় অন্য বাঙাল জিলাগুলিতেও কমবেশি আছে। এপারে 'ইশে'র কাছাকাছি 'ইয়ে' আছে।—তা তোমাদের ইশের তাৎপর্যটা কীরকম?—আজ্ঞে, ইশে অতি ব্যাপক শব্দ। এতদ্বারা জগৎ সংসারে না বোঝানো যায় হেন বস্তু নেই।—ইশের প্রতিশব্দ কী?—বাংলা প্রতিশব্দ ঐ ব্যাপকতায় নজরে আসেনি, এক ঐ যে বললাম, 'ইয়ে' ছাড়া। হিন্দুস্তানীতে একটা পেয়েছি, প্রায় সম-ক্ষমতা সম্পন্ন। শব্দটি 'এথি'।—না হিন্দুস্তানী শব্দে হবে না, বাংলা প্রতিশব্দ খোঁজো।—খুঁজেছি, কিন্তু পাইনি। 'ইয়েতে' তাঁর মন ভরেনি।

একরাতে টেলিফোন।—কাল সকাল দশটার মধ্যে ফোনে কম করে পাঁচটি বরিশালিয়া প্রবচন চাই যার ব্যাপক প্রচলন নেই। বললাম, দশটার সময় হবে না। বর্ধমানের সাতগেছিয়াতে অফিস। খুব সকালে বেরিয়ে যেতে হয়। রাতে জানাব। অফিসে একটা রাফ প্যাড নিয়ে স্মৃতি কচলে, বিকেল নাগাদ দেখলাম ১২০ কী ১২১ টা মতন নানা ধরনের শোলোক, শাস্তর, পল্‌কি জড়ো হয়েছে। রাতে সবগুলো বললাম। তার থেকে তাঁর প্রয়োজন মত নিলেন। বললেন, বাকিগুলো ফেলে দিও না। এগুলোর আলাদা আলাদা বর্গীকরণ কর, শোলোক, শাস্তর, পল্‌কি হিসাবে। তারপর আমাকে এতক্ষণ যা বললে, সেই কথাগুলোর মধ্যে সেগুলো ঢুকিয়ে দাও, দিব্য একটা লেখা হবে।—পরে সেই লেখাটি 'চান্দ্রদ্বীপি শোলোক, শাস্তর, পল্‌কি কথা' এই শিরোনামে একটি ছোট সাহিত্যপত্রে বের হয় এবং ক্রমে উজানি খালের সোঁতা নামক সংকলন গ্রন্থের অন্যতম রচনা হিসাবে স্থান পায়। বইটি আনন্দ প্রকাশ করেছিল ২০০৬ এর বইমেলায়। জ্যোতিমশাই এর সঙ্গে এরকম একটা সম্পর্ক যে আমার ঘটেছিল,

BanglaBook.org

তার জন্য নিজেকে বড় ভাগ্যবান বলে মনে হয়। বহু প্রতীক্ষিত একটা আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি এভাবেই হয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা যদি আরো আগে ঘটত। সেই 'ছড়ার দেশে আনন্দ'র সময়টায়ও যদি সাক্ষাৎটা পরোক্ষে না হ'য়ে প্রত্যক্ষে ঘটত, লেখালেখির জগতে হয়ত বেশ খানিকটা আগে এসে, অন্যভাবে নিজেকে গড়তে পারতাম। হয়ত ভাল কিছু কাজ করার জন্য প্রস্তুতিটা উপযুক্ত সহায়তায় অনেক বেশি অর্থবহ হতো।

ঐ সময়েই একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, দেখ, এই বয়সেও কী অপরিসীম পরিশ্রম করতে হয়, মাঝে মাঝে বড় ক্লান্তি আসে। ইচ্ছে হয়, কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি। কিন্তু আমার স্ত্রীর শরীর একেই ভাল নয়, তার ওপর সম্প্রতি পা ভেঙে 'দ' হয়ে আছেন। আমি আবার একা কোথাও যাই না কী না।—কথাটা ঠিক, জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও নিরুদ্বেগ বিশ্রাম বা নিশ্চিত নিশ্চিন্ত অন্ন তাঁর অদৃষ্টে ছিল না। তখনও বাংলা একাডেমির আনুকূল্য তাঁর ঘটেনি। অর্থকরী কাজ বলতে প্রধান ছিল Proof editing এবং সাময়িক পত্রে লেখালেখি করে কিছু উপার্জন। বাগার্থ কৌতুকী-র পর্ব তখন শুরু হয়েছে বলে কিছু নিয়মিত রোজগার। কিন্তু বিশ্রাম নেই। এসব কাজে থাকেও না। একদিন বললাম, আমার বাড়ি যাবেন?—এক কথায় রাজি। কিন্তু মাসীমার পা ভাঙা যে? বললাম ট্যাক্সিতে নিয়ে যাব— সেরকমই সাব্যস্ত হলো। একদিন কোলকাতায় বন্ধুর বাড়ি রাত কাটিয়ে ভোরবেলা কাঁকুলিয়ায় গেলাম। ততক্ষণে দুজনে স্নানটান সেরে, সেজেগুজে বসে আছেন। কী উৎসাহ দুজনের! ট্যাক্সিতে বসে বললেন, শোনো, তোমার ভদ্রেশ্বর স্টেশনটার আগের স্টেশনে কী সিঁড়ি না ভেঙে বাসস্টপ অবধি যাওয়া যাবে?

—তা যাবে। কিন্তু তার দরকার কী?

—না, অতদূর অবধি ট্যাক্সিতে যাওয়া মানে বেকার গুচ্ছের টাকা খরচ। সিঁড়িভাঙার ব্যাপারটা যদি এড়ানো যায় তো যেমন বললাম,—ও তোমার মাসিমা দিব্য পেরে যাবেন। কী গো অসুবিধে হবে?

—না—, একটু আস্তে আস্তে হাঁটলে ঠিক পেরে যাব।

জ্যোতিমশাই পণ্ডিত মানুষ বলে আমি বা আমার মত সাধারণেরা বিশ্বাস করি, যদিও কোলকাতার তাবড় তাবড় বুদ্ধিজীবিদের কারুর কারুর এবং তাঁদের কুঁচোকাঁচা চামচাদের অভিমত এই যে, 'জ্যোতিবাবু নাকি ঠিক পণ্ডিত পদবাচ্য

BanglaBook.org

নন।' তা হবে। পণ্ডিত কথাটিকে নানা মুনি নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, করেনও। তার একটা ব্যাখ্যা হচ্ছে সর্বং পশ্যতি যঃ সঃ পণ্ডিতঃ ইতি। সে অর্থে জ্যোতিমশাই পণ্ডিত অবশ্য নন। তাঁকে কোনোদিন কোনো কর্ম পণ্ড করতে কেউ দেখেনি। এই ব্যাখ্যাটা ক্রিয়ার দিক থেকে ব্যাখ্যা, এক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হলেও ক্ষেত্রান্তরে বা পাত্রান্তরে ক্রিয়াশীল, সুতরাং, মিথ্যে নয়। আরেকটি টীকাও চালু আছে। সেটি আরো গভীর অর্থবহ। সেখানে বলা হয়েছে যে পণ্ডিতদের সবটাই গুণ, কেবল একটিমাত্র দোষ এবং তা হলো যে তাঁরা মূর্খ। এটিকে বিশেষণধর্মী অর্থ-প্রকরণ বলা যেতে পারে। কিন্তু জ্যোতিমশাইকে সেদিকেও ফেলা যায় না। আমরা যারা প্রবল রবকারী ভীষণ তাত্ত্বিক ও তার্কিক পণ্ডিতদের থেকে সহস্র যোজন দূরে অবস্থান করা নিরাপদ মনে করি, তাঁরা জ্যোতিমশাইকে ভিন্ন কারণে পণ্ডিত মনে করে থাকি। সেখানে পাণিণি পান থেকে চুন খসলেই খড়্গপাণি হন না বরং একটি কান্তকোমল ছড়া বা শ্লোকের বাগার্থ নিয়ে কৌতুক রসের ধারা বইয়ে দেন। আমরা তাতে তাঁর সহজিয়া পাণ্ডিত্যের শীতল তক্র পান করে প্রাণে মনে বড় স্নিগ্ধ এবং ঋদ্ধ হই। সেখানে বোধের চাইতে অনুভবের অতীন্দ্রিয় আনন্দটাই প্রবল হয়। তাই তিনি আমাদের পণ্ডিত।

যাহোক্, আমার বাড়িতে তাঁকে নিয়ে আসার পথে আমার মনে একটা ফন্দি এসে গেল। জ্যোতিমশাই একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, তোমাদের আগের ঐ বৈদ্যবাটি জায়গাটি আমার তীর্থস্থান।— বৈদ্যবাটির গঙ্গায় নিমাই তীর্থের ঘাট বলে একটি বিখ্যাত ঘাট আছে বটে, তবে তাতো এখন তারকেশ্বর গামী তীর্থযাত্রীদের জল নেবার স্থান। জ্যোতিমশাইকে বলতে বললেন, আরে সে তীর্থ নয়। ওখানের কাছে পিঠে থাকো, অথচ জানো না বৈদ্যবাটি কেন আমার তীর্থক্ষেত্র? ওখানে যে মহামহোপাধ্যায় ঠাকুর অনন্তলাল চক্রবর্তী মশাই-এর বাড়ি।—জানি না আবার! তাঁর কাছেই তো অরুণাদি অর্থাৎ ডঃ অরুণা হালদার আমাকে পাঠিয়েছিলেন এক কপি বিদুর তাঁকে দেওয়ার জন্য। আর তারপর সে কী কেলেঙ্কারি। প্রণামসহ বিদুর তো এক কপি দিয়ে এসেছিলাম। নিয়েও ছিলেন বেশ হৃষ্টচিত্তে লম্বা একটা শ্লোকে আশীর্বাণী উচ্চারণ করে। তার দিন কয়েক পরে টেলিফোনে যা একখানা ধ্রুপদী নিরুক্তিতে ঝাড় দিয়েছিলেন না যে আমার অবস্থা প্রায় ঝাড়ে বংশে নির্বংশ হবার মত। ক্ষমা চাইতে গিয়েছিলাম তার

BanglaBook.org

পরের দিন, তা প্রায় ঢুকতেই দিচ্ছিলেন না বাড়িতে। ভাগ্যিস মাসিমা ছিলেন, কোনোক্রমে পার পেয়েছিলাম। পরে আবার একদিন ফোনেই উল্টো দুঃখ করে মনের খেদ দূর করে দিয়েছিলেন আমার। তারপর থেকে বাড়িটি আমারও তীর্থস্থান হয়েছে। এবার ফন্দি করলাম এই দুই পণ্ডিতকে এক জায়গায় এনে রঙ্গ দেখার। এরকম রঙ্গ দেখার বাই আমার পুরোনো। তবে তা কোনক্রমেই শালীনতা বা ভব্যতার সীমা ডিঙিয়ে নয়। রঙ্গের বিষয়টা সাধারণত নির্ভরশীল হয় দুই পণ্ডিতের বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বিতর্ক বিস্তারের মাধ্যমে খুঁটিনাটি, এটা ওটা মুফতে জানতে পারার সুযোগ লাভের জন্য। জ্যোতিমশাই আমার এই স্বভাবটা বেশ জানতেন। তাঁকে কথাটা বলতে, বললেন, প্রস্তাবটা আমার খুবই মন মতন, তবে জানো তো, সমুদ্দুরের সীমায় একবার পড়লে, নালা খালের কলধ্বনি আর থাকে না। তোমার কৌতুকী বোধহয় সিদ্ধ হবে না তবে—আমার খুব আহ্লাদ হচ্ছে। বাড়িটা চেনো না কী?

—একেবারে নিজের বাড়ির মতই চিনি, ফলারটাও হয় খাঁটি ফলুরে বামুনবাড়ির মতই। মাসিমা খাওয়ান ভাল।

এদিকের মাসিমার চরণ সমস্যা এই প্রস্তাবে তখন অনেকটা কমের দিকে। দুজনেই বললেন, চল তিথিটা সেরেই যাই না কেন। বৈদ্যবাটি স্টেশনে নেমে দুখানা রিক্সা নিয়ে রওনা দিলাম। খবর দেওয়া নেই, হঠাৎ করে গিয়ে যদি বাড়ি না পাই, বাহাদুরিটা মাঠে মারা যাবে। তাছাড়া দুইজন এই বয়সী বৃদ্ধবৃদ্ধার হয়রানিটাও কম আফশোসের কথা হবে না। এ কারণে মনে আশঙ্কা। পাড়াটার নাম মালির বাগান। জ্যোতিমশাইদের রিক্সাওয়ালাকে জায়গাটার হদিস বলে আমার রিক্সা নিয়ে একটু দ্রুত গেলাম। পণ্ডিত মশাইকে জানাতে যে খবর না দিয়ে বাড়িতে অতিথি নিয়ে এসেছি। সভাসমিতিতে দুজনের ইতিপূর্বে পরিচয় কিছুটা ছিল, তবে গভীর আলাপ সে অর্থে ছিল না। দুজনে দুজনার কর্ম সম্পর্কে অবশ্য জানতেন। মহামহোপাধ্যায় বৌদ্ধ ন্যায়ের পণ্ডিত এবং দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে এই বিষয়ে পর্বতাকৃতিপ্রায় কাজ করেছেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানতাপস বলতে যা বোঝায় তাই। তাছাড়া কালিপ্রসন্ন সিংহের 'সাক্ষরতা প্রকাশন' কৃত মহাভারত সম্পাদনা করেছেন, প্রয়াত গোপাল হালদার মশাই এর সহযোগে। তার ভূমিকাটি পড়লেও পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। কোটালিপাড়া অঞ্চলের বিখ্যাত পণ্ডিত বংশের তিনি প্রথম পুরুষ, যাঁকে কৌলিক প্রথা ভঙ্গ করে তাঁর পিতাঠাকুর গোবিন্দলাল চক্রবর্তী মশাই সেই যুগে

BanglaBook.org

ইংরাজি শিক্ষার অনুমতি দিয়ে জ্ঞাতিদের তিরস্কার হজম করেছিলেন। এসব কাহিনী তাঁর শ্রীমুখেই শোনা। বয়স তখন, অর্থাৎ এই সাক্ষাৎকারের সময় বোধহয় ৮৬ না কত যেন বলেছিলেন, আর জ্যোতিমশাই আশির আশে পাশে। মজা লাগছিল যখন দুজনে সামনাসামনি পরস্পরকে অভিবাদন করছেন। দুজনেই দুজনের প্রশংসায় সব সুছন্দবদ্ধ শ্লোক আওড়াচ্ছেন আর তৎসহ নমস্কার প্রতি নমস্কার করছেন। আমি এবং আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু দুজনে অবাক হয়ে তাঁদের কাণ্ড দেখছি। আমার বন্ধুটিও ঠাকুর চক্রবর্তী পদবীর এবং ঐ পাড়াতেই থাকেন। বয়সে আমার চাইতে অনেক ছোট, কিন্তু পড়াশোনার পরিধিতে তার থই পাওয়া ভার। এমন বিষয় পাওয়া ভার যেখানে তার গতিবিধি নেই। ও যে কখন এত পড়ে, তা ওই জানে এবং কোনোটাই ভাসাভাসা নয়, সবটাই গভীরে।

কথাবার্তা এবং ফলারের সঙ্গে পণ্ডিতমশাই এর কাজকর্ম দেখা চলছিল। একটা বড় টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখা হয়েছিল তাঁর সম্পাদিত এবং রচিত গ্রন্থাবলী। সেসবের আনুপূর্ব বিবরণ বলে যাচ্ছিলেন মধ্য অশীতি অতিক্রান্ত পণ্ডিতমশাই। পূর্ব এবং উত্তর মীমাংসার, নব্যন্যায়, বৌদ্ধন্যায়ের নানা প্রসঙ্গ ছিল তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু, যার সামান্যতম অংশও আমার মাথায় ঢুকছিল না। ঢোকার কথাও নয়। বন্ধুটির কথা আলাদা। সে আবাল্য এঁর সংসর্গে মানুষ, উপরন্তু ঠাকুর চক্রবর্তীর রক্ত তার ধমনীতেও বহমান। একসময় জ্যোতিমশাই পণ্ডিতমশাইকে জিজ্ঞেস করলেন, সারাজীবন এই যে এতসব করলেন, তার উত্তরাধিকার এই সমাজে কাকে দিয়ে যাবেন?—বৃদ্ধ খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইলেন। ভাবলাম, নিজের কাছে এই প্রশ্ন বোধহয় তারও এবং তা বহুদিনের। কিন্তু না, হতাশাকে যেন সজোরে দূরে নিক্ষেপ করে বলে উঠলেন তিনি, কেন, এঁরা রয়েছেন। এঁরা বহন করবেন এই উত্তরাধিকার।—বলে আমাদের দিকে ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু আমি নিশ্চিত, তিনি আমার বন্ধুটিকেই বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন সেদিন। ঐ গৌরবের ভাগী অন্তত আমি হবার যোগ্যতা রাখি না। পণ্ডিতমশাই নেহাৎ ভদ্রতাবশত বহুবচনটি ব্যবহার করেছিলেন।

আধুনিক সমাজে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, ব্রাহ্মণ্য অহংকার, ব্রাহ্মণ্যধারা বা তাঁদের ভেদবাদী ব্যাপারাদি নিয়ে নানান সমালোচনায় আমরা যেমন মুখর, তেমনই আক্রমণপ্রবণ। ভারতীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা প্রকৃতই জ্ঞানতাপস এবং নিরলস মস্তিষ্কশ্রমী স্বাধ্যায়ী, তাদের অবদান এবং নির্লোভ যাপিত জীবনের কথা আমরা

BanglaBook.org

আজ কদাচিৎ স্মরণে মননে লালন করি বা শ্রদ্ধা জানাই। সমাজবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে হয়ত অনেক ত্রুটিই তাঁদের অনুগামীদের মধ্যে আছে, কিন্তু হাজার বছরের, কী তারও অধিক কালের সাধনার মধ্যে কি কোনো লোকহিতৈষণার প্রজ্ঞার আবির্ভাব ঘটেনি? জ্ঞানের পরম্পরাগত সংরক্ষণ এবং প্রসারণের জন্য বংশানুক্রমিক অনুশীলনের তপশ্চর্যা একশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা প্রকৃত নিরাসক্ত এবং স্বার্থশূন্য হয়ে করেছেন, আমরা আজ তার ফল এবং গৌরব ভোগ করে যাচ্ছি, কিন্তু সামাজিক ভেদ আর বর্ণাশ্রমী বা জাতপাতের কদর্যতার দায় তাঁদের উপর পুরোটা চাপিয়ে দিয়ে ভিন্নতর এক বিভেদের সূচনা করে যাচ্ছি। সেখানে মুড়ি মিছরির তফাৎ করা হচ্ছে না।

পণ্ডিতমশাইয়েরই বংশলতিকায় দেখছি, ধারাবাহিকভাবে এই পাশ্চাত্য বৈদিক পরিবারটি কী অপরিসীম নিষ্ঠায় একের পর এক প্রজন্মে জ্ঞানবর্তিকাটি বহন করে চলেছেন। এইসব দেখে শুনে মনে হয়, শুধু কঠোর গালাগালি এবং নিন্দাবাদই এইসব মানুষদের একমাত্র প্রাপ্য হওয়া উচিৎ নয়। তাঁদের মূল্যায়ন আরও অনেক গভীরে গিয়ে করার প্রয়োজন আছে। আমি কোনোক্রমেই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ভেদাচারের সপক্ষে নই। কিন্তু একথাটিও ভুললে চলবে না যে গোটা সমাজবিন্যাসের ভালমন্দের মন্দটা বিশেষ এক গোষ্ঠীর মানুষদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে অন্যদের দায়মুক্ত করাটাও কোনো কাজের কথা নয়। সূক্ষ্মবিচারে অসুবিধে ভোগীরা সুবিধাভোগীদের চাইতে খুব কম দায়ী কী? তাদের সহযোগিতা ছাড়া সুবিধেভোগী শ্রেণী বা জাতটি তৈরি হয় কী করে? এখন কথা হচ্ছে, ক্ষমতার অধিকারী কারা? অবশ্যই ব্রাহ্মণ ইত্যাদি উচ্চবর্ণীয়রা। কিন্তু কারা তাঁদের ক্ষমতায় রাখে এবং কেন? এসব জটিল ব্যাপারগুলোর বোধহয় নিষ্পত্তির প্রয়োজন।

এইসব কথা নিয়ে সেদিন দুই বৃদ্ধের দীর্ঘ আলোচনা শুনেছিলাম। পণ্ডিতমশাই এর একটি কথার মীমাংসা আমি আজও করতে পারিনি। অথচ তা এড়িয়ে যেতেও পারছি না। তিনি বলেছিলেন, পুরুষানুক্রমে আমরা জ্ঞানচর্চার এইসব অনুশীলন করে আসছি। আমার বংশ পুরুষেরা রাজন্যদের কাছ থেকে ভূমি, বৃত্তি ইত্যাদি পেয়ে নিশ্চিন্তে এইসব কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারতেন। আজ যদি আমাকে দিনান্তের শাকান্নের জন্য কায়িক প্রচেষ্টা চালাতে হয় এসব কাজ কীভাবে করব? সবার জন্য কী একই নিয়ম বা বিধি চলে? ঐতিহ্য এবং পরম্পরার বাইরে গেলে কী ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হব না?

BanglaBook.org

তাঁদের অনেক যুক্তিরই প্রতিযুক্তি আছে, আছে তর্কের বিরুদ্ধে প্রতিতর্ক। কিন্তু সেটাই কি সব? কোনো দৃষ্টিকোণই কী সর্বাংশে সঠিক?

এ আলেখ্যে এইসব কথা প্রধান আলোচ্য নয়। দুইজন প্রাচীন জ্ঞানী মানুষের খানিকক্ষণের আলাপের সূত্র ধরে এসব বললাম।

রাস্তায় এসে জ্যোতিমশাই বললেন, অনেক দিনের একটা সাধ পূরণ হলো হে, তোমার কল্যাণে। আহা কী মানুষ। আমার মত একজন অজ্ঞাত কুলশীলকে কতটা সময় দিলেন, অ্যাঁ ভাব দেখিনি একবার। একটি প্রকৃত মহীরূহ! আর আমি?—মনে মনে বললাম, বটে? তাহলে আমাহেন অভাজনের গৃহ ধন্য করতে যাঁরা চলেছেন, তাঁদের তুলনায় আমি কী?

গোটা একটা দিন জ্যোতিমশাই-এর সঙ্গে কাটাব, এই চিন্তাটাই আগের কয়েকটা দিন আমাকে উত্তেজিত রেখেছিল। দাদাদের কাছে শুনেছি মুখে মুখে ছড়া তৈরি করাটা তাঁর কাছে ছিল যেন ভোজবাজি। আমার সদ্যাগ্রজ অভিজিৎ দশ এগারো বছর বয়স থেকেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ওকে একটা ছড়া লিখে দিয়েছিলেন একেবারে চট্‌জলদি। অভিজিৎও প্রতিদানে একটা লিখে নিয়ে দিয়েছিল তাঁর হাতে। সেটা আমি শুনিনি। তবে জ্যোতিমশাইয়ের ছড়াটি সেই কবে অভিজিৎ বলেছিল, আজও মনে আছে। ছড়াটির কিছুটা বলি—

রাজা মশাই রাগ করলেন
সে কী রাগ!
রাজামশাই তাগ্ করলেন
সে কী তাগ!
রাজামশাই বাঘ মারলেন
সে কী বাঘ!

ছড়া, কবিতা, গান, নাটক, বিশেষ করে সেসব যদি শিশুদের কৃত বা শিশু উপভোগ্য হতো জ্যোতিমশাই সেসব ক্ষেত্রে একা একশো হয়ে পরিবেশনা, নির্দেশনা ইত্যাদি করতেন। নিজের কোনো সন্তান ছিল না। প্রথমে ভাইদের সন্তান হিসাবে মানুষ করেছেন, পরে তো তাবৎ শিশুদেরই নিজের করে নিয়েছেন। অভিজিতের মধ্যে ছড়া, কবিতা লেখার প্রবণতা দেখে, তার শৈশবের দিনগুলিতে প্রভূত উৎসাহ তিনি দিয়েছেন। একজন লেখকের প্রস্তুতিপর্বে এমন একজন প্রকৃত রসবেত্তা, পণ্ডিত তথা গুণী ব্যক্তির পোষকতা পাওয়া ভাগ্যের কথা। আমার যদিও শৈশবে এই সৌভাগ্য ঘটেনি, তবে অভিজিতের মধ্য দিয়ে

BanglaBook.org

পরোক্ষে এবং প্রৌঢ়ত্বে এসে প্রত্যক্ষভাবে আমি যে তাঁর পোষকতা পেয়ে ধন্য হয়েছি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেকথা আজ স্মরণ করি।

সেবার পণ্ডিতমশাই এর বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসে করেই আসতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। আমরা মফঃস্বল অঞ্চলে থাকি, ইচ্ছে করলেই গাড়িটাড়ির ব্যবস্থা করতে পারি না। ভীষণ খারাপ লাগছিল। বললাম, রিক্সায় চলুন না। রিক্সায় আসতে গেলে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মত সময় লাগবে।—না, বাসেই ঠিক আছে হে। ওতেই তো অভ্যস্ত। কিন্তু মাসিমার যে পায়ের অবস্থা খারাপ? ওনার কষ্ট হবে। মাসিমা বললেন, বসতে পারলে হবে না। বাসে উঠে কোনো মতে মাসিমার একটা সীট পাওয়া গেল। জ্যোতিমশাই হাঁফ ছেড়ে বললেন, বাস্, আর সমস্যা নেই। মাসিমার কোনোরকম অসুবিধে না হয়, সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল সবসময়। কিন্তু নিজেও তো ভীষণ দুর্বল এবং ক্ষীণজীবী। এইসব কথাগুলো এমন কিছু বলার বা উল্লেখ করার বিষয় নয়। তবে করছি একারণে যে, একটু নামী দামি লোক হলেই, তাঁদের নাড়াচাড়া করতে বড় ঝঞ্ঝাট। খরচে খরচ, তার ওপর আবহাওয়ার তীক্ষ্ণতার জন্যও যেন নিজেকে দায়ী মনে হয়। যেন এরকম একটা গরম বা শীত বা বৃষ্টিপাতের ব্যাপারটা আমার মাথায় রাখা উচিৎ ছিল। জ্যোতিমশাইয়ের ব্যাপারে এসব আদৌ ছিল না।

বাস স্ট্যান্ড থেকে রিক্সা নিতে দিলেন না। হেঁটেই চল। জায়গাটাতো দেখতে হবে, না কী। আমার বাড়িটা একটু বড়। একটু একটু করে প্রয়োজনের দিনে করা। তখন অনেকে একসঙ্গে। যে সময়টার কথা বলছি, তখন প্রায় সবাই নিজের নিজের আলাদা ব্যবস্থা করে দূরে দূরে। বাড়ির কাছাকাছি এসেই বললেন, এত প্রাসাদ হে। বড় সুন্দর তোমার বাড়ি এবং বাগান। ভালোই হল, মাঝে মাঝে এসে হাঁফ ছাড়া যাবে। আসলে কাকুলিয়ার ঐ চৌখোপী ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকতে থাকতে প্রকৃতি-পরিবেশ বেমালুম বিস্মৃত হয়ে আছি। আমরা যারা ওপার থেকে এসেছি, তাদের জন্য ফ্ল্যাটবাড়ি কোনো বাড়িই নয়। ঘর থেকে এক পা বাইরে দিলেই সেটা পরের জায়গা। বাঙালমতে ওটা বাসা। বাড়ি নয়।

চা চা জল খাবারের সময় পেরিয়ে গিয়েছিল। তবু 'চন্নগরের' সূয্য মোদকের জলভরা তালশাঁস একটা, আর গোটা দুয়েক মিত্যুঞ্জয়ের ভদ্রেশ্বরী লর্ড চম্‌চম্ খেয়ে, চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে নানান সুখাদ্যের গল্প। সে গল্প শুনলেও খিদে বাড়ে। পাবনা জিলার লোক। কিন্তু সেখানকার স্মৃতি বেশি দিনের নয়। এ জেলা ও জেলায়ও বাল্যকালটা কেটেছে। কবে নাকি তাঁর বাবা না কাকা ঢাকার

BanglaBook.org

ভাগ্যকুলের দোকান থেকে সন্দেশ এনেছিলেন। তেমনটি নাকি আর কখনো জিবে পড়েনি। ঢাকায় ভাগ্যকুল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের বেশ কয়েকটি মিষ্টান্নের দোকান পরে আমিও দেখেছি। সে মিষ্টির 'তার' আলাদা একথা মানতে হবে এবং অপর একটি দ্রব্য, সেটি মিষ্টান্ন নয়, বাখরখানি। আহা! সে যেন 'বেহেস্তি বাসে' ভরপুর খাস্তা আহার, তবে দামে সস্তা নয়। দামে আর স্বাদে সেসব নাকি এখন আর জ্যোতিমশাইয়ের সেকালের তুল্য আদৌ নয়। একথা মশাইয়ের এবং দোকানিদেরও। তবে কিনা এই আফশোসটি মানুষের চিরন্তন, একাল সেকালের ভালত্বের তরতম নিয়ে দ্বন্দ্ব সর্বযুগের প্রাচীন নবীনে থাকবেই। তা কী মানুষ, কী বস্তু, সর্ববিষয়ে।

বাড়িতে আসার আবেদনটি গ্রাহ্য হবার প্রাক্‌কালে জানতে চেয়েছিলাম, কী মাছ পছন্দ?

—প্রথম ইলিশ এবং শেষ পাতেও।

—রান্না বিষয়ে?

—বরিশাল রান্নার জন্য বিখ্যাত নয়। তবে ঐ 'ইশে'র, মানে কচুর সুখ্যাতি ইদানীং দেখছি সবাই, মায় ঘটিরাও করে। তা, বৌমার হাত কেমন?

—শোলোকে কই, 'মায় রান্দে য্যামন ত্যামন, বুইনে রান্দে পানি।
ঐ আবাগীর হাতের রান্দন, যেন চিনির পানা খানি।'

—ভাল বলেছ, বাগার্থ কৌতুকীতে ঠুসে দেবার কথা ভাবব। তবে বৌমাকে বল, আমি জাতে মাস্টার। রান্নাও পরীক্ষা বিশেষ। খেয়ে বলব কত নম্বর পেলেন। এ ব্যাপারে আমি কিন্তু প্রকৃতই কর্তিত-ওষ্ঠ।

চার রকমের মাছ, ঢেঁকি-শাক-নারকোল কোরা সহযোগে, মানকচুর ডালনা, পাতলা মুসুর ডাল সঙ্গে অল্পমাত্রায় আমচুর—এইসব ভোজ্যবস্তু। বুড়োবুড়ি দুজনকে নিয়ে খেতে বসেই এক ধাক্কা খেলাম। মশাই মাছের বাটিগুলো থেকে পটাপট্ মাছগুলো তুলে, সব ধপাধপ মাসিমার থালায় ফেললেন। গিন্নি এবং আমি দুজনেই হতভম্ব। তাহলে কী রান্নার রঙ দেখেই তাঁর পিত্তি চটে গেল? বললাম, কী হলো? একটু মুখে দিয়েও পরখ করলেন না? ততক্ষণে তিনি ডাল আর শাক দিয়ে খাওয়া শুরু করেছেন। চোখ বুজে চিবোচ্ছেন, কিন্তু দুজনেরই চোখেমুখে একটা চোরা হাসির আভাস। আমি শুরু করতে পারছি না। মাছগুলো তাহলে কোনোটাই খাবেন না? ইলিশ তো ব্যবস্থা করেছি। জিজ্ঞেস করলাম আবার। বললেন, ও একটা ব্যাপার আছে, পরে বুঝবে ক্ষণ। ডালটা বেশ নতুন

BanglaBook.org

রকম লাগছে। এজন্যেই বোধহয় বরিশালের লোকেরা বেশিরভাগ সবশেষে ডাল খায়।

ও হরি! ব্যাপার তাহলে এই! মশাই এর প্রেমিকাটি মানে স্ত্রী মানে মাসিমা ততক্ষণে সব মাছের কাঁটা বেছে, আলাদা আলাদা করে তার পাতে তুলে দিয়েছেন। চোখ বন্ধ অবস্থায়ই তিনি গপাগপ্ সেসব সাপটে চলেছেন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায়। ইলিশ শেষ হলে চোখ খুললেন, বললেন, একশোর মধ্যে একশো। কিন্তু কাচকলা সহযোগে ইলিশ খাওয়া এই প্রথম। বললাম, বরিশালি ওদন সংস্কৃতিতে একটি শোলোক আছে, ইলিশ কাচকলা দিয়ে গিলিস।

—বৌমাকে বলো, এ নিয়ে থাকল না কোনো নালিশ। তবে অবশ্যই খাওয়ার পরে লাগবে দুটো বালিশ। বৌমার জয় হোক।

—কম্বিনেশন মিলিয়ে সওদা করার ক্রেডিটটা?

—ওটা মহতী সংসর্গের অভ্যাস। তা অবশ্যই সদভ্যাস বটে, তবে কোনোক্রমেই প্রতিভাজনিত সৃজনশীলতা তাকে বলব না।

—আপনি কি একারণেই সব ছেড়েছুড়ে পুস্তক সমালোচনার কর্মটি ধরেছেন?

—আহা চট্‌ছো কেন? বাজার করাটারও সংসারে দাম আছে। প্রয়োজনতো আছেই। —হাত মুখ ধুয়ে, সোজা গিয়ে বসলেন ফোনটার কাছে। বললেন, একটা জরুরি ফোন করতে হবে। সংযোগ হলে, ফোনে বললেন, নীলুবাবু, মাছ চার রকম। এলে পারতেন।

পণ্ডিত অনেক হয়ত আছেন। কিন্তু প্রকৃত নিরভিমান, রসে টুইটুম্বুর অথচ তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত খুবই কম পাওয়া যায়। আমার ধারণা, রসশাস্ত্রে যতগুলো রসের বিবরণ আছে, তার সবকটির নির্যাস নিঙড়ে বর্ষ শাস্ত্রকার জ্যোতিমশাইয়ের আজীবন লালিত ভাবটি বোধহয় তৈরি করেছিলেন এবং তারমধ্যে 'শান্ত' রসটির প্রাধান্য ছিল। সেই শান্ত রসটিকে মশাই স্থাপনা করেছিলেন আবার দুই ভাবের চাকার উপর, তা হলো সখ্য আর মধুর বা প্রণয়, যার ফলে তাঁর জীবনরথটি শত বন্ধুরতার মধ্যেও গড়গড় করে এগিয়ে চলেছে। এই ভাবটিকে কোনো রসান্বেষণকারীই বোধহয় উপেক্ষা করতে পারে না। অবশ্য যাঁরা পাণ্ডিত্যকে রসব্যতিরেকী গাম্ভীর্যে পাথর করে রাখেন, তাঁরা তাঁর এই সদাশান্ত রসাশ্রয়ী সখ্য ভাবটিকে হয়ত দীনতা বিবেচনা করে তাঁকে সমাজে ব্রাত্য রাখতে চান। এইসব কথা বলছি একারণে যে নাগরিক সারস্বত সমাজকে

BanglaBook.org

জ্যোতিমশাইয়ের জীবৎকালে বিশেষ মনোযোগী খুবই কমই দেখেছি। তার মধ্যেই যাঁরা তাঁর যৎকিঞ্চিৎ গুণগ্রাহী ছিলেন, তাঁদের সংখ্যা এবং ক্ষমতার পরিধি বড়ই সংকীর্ণ। তথাপি সরকারি, বেসরকারি কিছু লোক তাঁর কথা দেরিতে ভাবলেও ভেবেছিলেন। নচেৎ চিরদুঃখী, রোগজর্জর এই মানুষটি এবং তাঁর আজীবন দয়িতা ও পত্নীর শেষের দিনগুলি হয়ত আরও মর্মন্তুদ হতো। আমি এই রচনায় তাঁর অপরিসীম ক্লেশকর জীবনযাপনের, বিশেষত, মাসিমাকে নিয়ে তার প্রায় একক জীবনযুদ্ধের কথার বাস্তব উদাহরণ কিছুই দিলাম না। কারণ, যাঁরা এই রচনা পড়বেন, সেইসব দুঃখস্মৃতি তাঁদেরও হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করেই চলেছে এই মুহূর্তে, এরকমই আমার বিশ্বাস। তাঁরা সেসব জানেন। যাঁরা ক্ষমতাশালী হওয়া সত্ত্বেও সেসব জানার প্রয়োজন বোধ করেননি, তাঁদের এখন আর জানার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। মাসিমাকে প্রশংসা না করে উপায় নেই। তিনি বাস্তবিকই, আক্ষরিক অর্থে জ্যোতিমশাইয়ের দয়িতা। মশাইয়ের বড় দুশ্চিন্তা ছিল, তিনি যদি আগে যান, মাসিমার শুশ্রূষা কে করবে? তাই আগেভাগে তিনি সরে গিয়ে মশাইকে নিশ্চিন্ত করাটা সংগত মনে করেছিলেন। সেটা করা দয়িতা হিসাবেই কর্তব্য হয়। শুধুমাত্র স্ত্রী হলে প্রথাগতভাবে তাকে আগে রওনা করিয়ে পরে নিজে যেতেন। স্ত্রীরা এরকমই করেন কী না। আদর্শক্রমে স্ত্রী তো ছায়ামাত্র, অতএব পশ্চাদগামিনী।

এই মানুষটির বিষয়ে এত ব্যাপক কথা বলার আছে যে তাতে একটা মোটা বই লেখা যায়। এতক্ষণের অগোছালো বক্‌বকানিতে তার সামান্য পরিচয়টুকুও দেওয়া গেল না। আবার ভাবছি, লিখে লাভই বা কী? তাঁর লেখাপত্তরই বা কজনে পড়েছেন বা পড়েন? বাজারে তাঁর নিজস্ব লেখা কটাই বা বই হয়ে প্রকাশিত হয়েছে? এ এক অন্ধ স্বার্থপর সময়। সব কিছুরই পরিমাপ বা মূল্য নির্ধারিত হয় বাজারের নিয়মে, প্রোডাক্ট হিসাবে। জ্যোতিমশাইয়ের মধ্যে যতটুকু বাজারে বিক্রেয় বস্তু আছে, তা নিঙড়ে, যাদের ব্যবসা করার, তারা তা করেছে। তিনি অবশ্য সেসব নিয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র করেননি। স্বভাবটা যে বুনো রামনাথের তুল্য। ঘরে তণ্ডুল হয়ত এক আধমুঠো আছে। তিন্তিরি বৃক্ষটিও পত্রহীন নয়। পুঁথিপত্রও আছে। সুতরাং কিছুই অপ্রতুল নাই। এই সব শতাব্দী প্রাচীন জ্ঞানতাপসেরা পৃথিবীকে বাস-অযোগ্য বিবেচনায় ক্রমশ অন্তর্হিত হচ্ছেন। এরপর আমরা আরো বেশ করে ভোগের নৈবেদ্য সাজিয়ে শ্মশানকালীর তামস উৎসবে মত্ত হতে পারব। জ্যোতিমশাইরা আমাদের জন্য

BanglaBook.org

সারস্বত যজ্ঞ অব্যাহত রাখুন। আমরা বরং তাঁদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো নিয়ে বিদ্বজ্জনী বিশ্লেষণ করতে থাকি।

।। পাঁচ ।।

এইসব লেখা পত্তর, এও এক প্রব্রজ্যা বটে। শব্দটি 'পরিক্রমা' হলে ভাল হত হয়তো, কিন্তু নিজস্ব জীবন পরিক্রমা আর প্রব্রজ্যার একটা বিস্তৃতিগত পার্থক্য রাখতে চাইছি বলেই প্রব্রজ্যা কথাটি ব্যবহার করলাম। পরিক্রমা কথাটি বড়ো ব্যাপক। বিগত দিনের প্রব্রজ্যা নিয়ে যা লিখেছি, সেসব সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম, বিষাদবৃক্ষ এবং ধানসিদ্ধির পরন কথার মধ্যে ধরা আছে, আছে অন্যান্য ছোটখাটো রচনাগুলিতেও। এবারের এই ক্ষুদ্র আলেখ্যেও যা লিখব তাও প্রব্রজ্যাই এক অর্থে। তবে তার ধরণটা একটু ভিন্ন। এবারের বিষয় সাম্প্রতিকতার খুঁটিনাটির দুচারটি বৃত্তান্ত, যা আমার লেখালেখির পশ্চাৎপট তৈরি করে চলেছে।

লেখা মানেই সাহিত্য করা নয়। সব বা সবার লেখাকেই কোনো না কোনো একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে থাকতেই হবে, এরকম তাত্ত্বিকতাকে আমি ধ্রুব মনে করি না। জীবন একটা লম্বা পথ। যে যার পথ হাঁটে। সব পথ তো একরকম নয়, সবার চলার গল্পও নয় এক রকমের। নিজেরটা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে হয়। লেখা ব্যাপারটা সেখানেও একটা অবলম্বন। নাইলে ভাগটা দিই কীভাবে? অবশ্য চিঠিপত্রের আদান প্রদান একদা একটা ব্যাপার ছিল। টেলিফোন, মোবাইলের সহজলভ্যতায় সেই জিনিসটা শেষ হয়ে গেছে।

লেখালেখি করতে এসে অনেক মজার মজার কাণ্ড ঘটে। তার কতক আনন্দের আর কিছু আবার থোড়বড়ি খাড়ার নৈমিত্তিক ঘটনা। যাঁরা জাত লেখক তাঁরা এইসব নিয়েই গড়ে তুলতে পারেন আকর্ষক কথা সাহিত্য। আমি জাত লেখক নই, নিতান্তই ঘষে মেজে এক বেজাত-কলমচি। যার লেখালেখির কোনো জাত-গোত্র নেই। তথাপি, ওইসব মজাদার ব্যাপার স্যাপার আমার বেলায়ও ঘটেছে, ঘটেও। সব ধরে রাখা যায় না। হয়তো বা তার দরকারও নেই। তবু কিছুটাই থাকুক, এরকম এক ইচ্ছা।

বর্তমান প্রচেষ্টায় সেই ব্যাপার স্যাপার নাড়াঘাঁটা করতে গিয়ে দেখেছি জীবনটাকে যত হেলাফেলা এবং একঘেয়েমির হাতবাক্সো বলে তুচ্ছ করি,

BanglaBook.org

আসলে সে তা নয়। অতীত স্মৃতি নিয়ে রোমন্থন মনোরম হয়, কারণ তার বেশিটাই সময়ের রোদ, শিশির, বৃষ্টির বা শৈত্যের আবর্ত পেরিয়ে বেশ পোক্ত। কিন্তু তার সবটাই তো একদার 'বর্তমানেরই' ঘটনা বা দুর্ঘটনার টুকরো টাকরা নিয়েই তার মায়াময় গতরটি পুষ্ট করে। ভাবলাম, দেখা যাক একেবারে টাটকা অবস্থায় সে সবের স্বাদ কেমন। কিন্তু গিয়ে দেখছি ব্যাপারটা সোজা নয়। এখানে চেষ্টাটাকে একটা একমাত্রিক সরলতায় রাখতে চেয়েছি।

একজন মানুষ কীভাবে প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত একজনকে, এমনকী সেই একজনের পরিবারের সবাইকে আত্মীয় করে তুলতে পারেন তারই একটি বাস্তব কাহিনী এবার বলবো। সেই কাহিনী বলতে গিয়ে সেই মানুষটার কিছু চিঠিপত্র অবিকৃতভাবেই রেখেছি। সেগুলো সবই ব্যক্তিগত, তথাপি পাঠক তার মধ্যে সেই মানুষটিকে খুঁজে পাবেন এই আশায়, তাঁর সম্মতি নিয়েই সেগুলো প্রকাশ করছি। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে তাওতো অমূল্য সঞ্চয়। এই অধ্যায়ে সেই চিঠিগুলিই প্রধান। সঙ্গে আছে কিছু পরিচয় বৃত্তান্ত। সেটা কেরামতি দেখাবার জন্য নয়। সাপ লিখি আর ব্যাঙ লিখি, তার প্রতিটি অক্ষর, ধ্বনি এবং রচনার আত্মা বলতে যদি কোনো বস্তু থাকে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তার ঋণ স্বীকার করাও এর উদ্দেশ্য। সে কারণে জীবিত জীবনমুক্ত অন্য দু'একজনের কথাও রাখলাম এর মধ্যে। চরিত্র সৃজনের ক্ষমতা নেই, তাই আশপাশজনেদের নিয়ে টানাটানি। দেখি কিছু দাঁড়ায় কিনা।

এতক্ষণে অনেক ঝোপঝাড়ই পেটানো হল, এবার একটু আসল কথায় ঢুকি। সেদিন, এক মধ্য শীতের দুপুরে যখন একা বাড়িতে, লেপটা গায়ে চাপা দিয়ে সবে গভীর ঘুমে তলিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎই টেলিফোনটা বেজে উঠল। এই সময়টায় টেলিফোন করে কেউ যদি অমন আহ্লাদের ঘুমটা ভাঙিয়ে দেয়, তাহলে আমাহেন অলস ব্যক্তিতো বটেই, যে কোনো লোকেরই পিত্তি জ্বলে ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু উপায় নেই, এসব ক্ষেত্রে ফোন না তোলাটার একটাই অর্থ, আমি বাড়ি নেই, বাড়িতে কেউ নেই সেই মিথ্যেটার প্রতিষ্ঠা দেওয়া যেতো। কিন্তু মনে সন্দেহ, যদি কোনো জরুরি ফোন হয়? সুতরাং অত্যন্ত অভদ্রভাবে, বিরক্তি গোপন না করেই 'হ্যালো' করলাম, যাতে অপর প্রান্তের জন বোঝেন যে তিনি এক অলস ব্যক্তির দিবানিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন। কথাটি আরেকটু খেলিয়ে বলি।

BanglaBook.org

সময়টা ২০০৫ এর জানুয়ারির শেষ, কী ফেব্রুয়ারির শুরু। সঠিক মনে নেই, ঘুমটা সবে গাঢ় হচ্ছিল। তখন আমার বয়স সাতান্ন কী আটান্ন। ব্যাপারটি নিয়ে এতো পাঁয়তারা করছি কারণ আমি বোঝাতে চাইছি কী বিপুল আয়োজনে ওই দিবানিদ্রাটি আমাকে তখন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রকৃত আলস্য রসের রসিক ব্যক্তি ছাড়া শুধু বয়সের দৌলতেই ওই অবস্থাটি সম্যক বোঝা যাবে না। বিশেষত, কাজ পাগল ব্যক্তিরা তা কখনোই বুঝবেন না। তা না বুঝুন, তাতে দিবানিদ্রাশীল, আমার মতো আলসে প্রজাতির মনুষ্যের বিশেষ কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না।

টেলিফোনেরা আজকাল ক্রিং ক্রিং করে না। ইদানীং তাদের ধ্বনি হলো 'কুলু কুলু কুলু' বা অনুরূপ কিছু। কুলু কুলু কুলু ধ্বনিতে ঘুম পালিয়েছিল। ঘড়িতে তখন দুটো মতন, ফোনটা সেরে, হারানিধি ঘুমকে ফিরিয়ে এনে আরেকবার ঢলে পড়ার সময় আছে দেখে বিরক্তিটা খানিক কাটল বটে কিন্তু 'হ্যালো' তে সেটা প্রকাশ করলাম না। সেটা বিরক্তি ভাবের নিজস্ব ধর্ম। যাহোক, হ্যালো করলাম।

ওপারের প্রতি হ্যালোটিও টেলিফোনের কুলুকুলুর মতোই সুমিষ্ট, যেন তার সুরটি আরও সুরেলা এবং তা তরুণী কণ্ঠ। এরকম একটা কোন ফোন যদি বছর পনেরো কুড়ি আগেও পেতাম, তবে ওই কণ্ঠের অধিকারিণীর সঙ্গে যে আমার সাময়িক অভদ্র আচরণটা ঘটতো না সে কথা হলফ পড়েও বলতে পারি। কিন্তু যেমন আমার কপালে বরাবর ঘটে, এই ঘটনাটিও সেরকমই ঘটেছিল বলে বিষয়টি নিয়ে এতো ফেনাচ্ছি।

আমি খুব একটা বিরক্তি প্রবণ বা অসহিষ্ণু লোক নই। কিন্তু তাতো একমাত্র পরিচিত জনেদেরই জানার কথা। অপরিচিত দূরভাষী বা ভাষিণীরা জানবেন কী করে? ওপারের 'কুলু কুলুতে' কাতুকুতু বোধ করার বয়সটাও যে ছাই নেই, তার আভাসটা ইতিপূর্বে দিয়েছি। কণ্ঠস্বরটি সুমিষ্ট বলেই হয়তো তখন অযুত কুসন্দেহ-তরঙ্গ মস্তিষ্কের কোষে। তার সম্যক কারণও আছে। সম্প্রতিকালে এই সময়টিতে যাঁরা টেলিফোন করেন, তাঁরা যদি মহিলা হন, তবে তাঁদের বয়স ইত্যাদি, কণ্ঠস্বর বা বাচনভঙ্গীতে সঠিক অনুমান করা যায় না। তাঁরা সাধারণত অবাঙালি হন, বা বাঙালি হলেও যে উচ্চারণে ভাষা-সংলাপটা তাঁরা ব্যবহার করেন, ভাষাচার্য তার পরিচয় নিতান্ত ভ্রূণাকারেই দিয়েছেন। কিন্তু তা শুধুমাত্র মাসিমা = মাশিমা জাতীয় দুই একটি, যা কোলকাতার স্থান বিশেষের

BanglaBook.org

তরুণীকূলের ব্যবহারে তৎকালে সবে আসতে শুরু করেছে। শব্দ, ভাষা, পদবন্ধ এবং উচ্চারণ ইত্যাদির স্বাভাবিক বিকাশের সঙ্গে যে এই ধারাটিরও বিপুল বিক্রমে বিকাশ ঘটতে পারে, মহাশয় বোধকরি তা ভাবেননি। এবিষয়ে মহাশয়ের প্রচেষ্টা যথা পুস্তকে দ্রষ্টব্য। কিন্তু তাঁর আত্মার সদ্গতি বা সার্বিক মুক্তি হবে না এবং অচিরাৎ তাঁকে মানুষী যোনী ভ্রমণ করতে হবে, কারণ বর্তমানকালীন এই ভাষা সংলাপ উচ্চারণের জন্য আরেক খণ্ড ODBL রচনা না করলে বাঙালিরা আদৌ তাঁকে ক্ষমা করবে না। সুতরাং পাঠক, আরেকখণ্ড ODBL বর্তমানকালীন পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষারীতির জন্য নিঃসন্দেহে আবশ্যক, তাতে সুনীতিকুমার পুনঃজন্ম গ্রহণ করুণ অথবা ভূত হিসাবে কাজটি করুন, এরকম একটি দাবি প্রতিষ্ঠা করা গেল।

সেটা আচার্যের সমস্যা। যা বলছিলাম, এইসব মহিলারা (অথবা, বালিকারাও বলা যায়, এক্ষেত্রে চোখে তো দেখিনি, শুধু কুলুকুলু শুনেছি)। হয় টিভি, নয় ওয়াশিং মেশিন, নয় ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড, নিদেন বাজারে সদ্য আগত ভীষণ সস্তা এবং সেক্সি গড়নের বিশেষ সেলফোন (মব্‌লু-সোনা = স্বপ্নময় চক্রবর্তীর কপিরাইট) ইত্যাদির মার্কেটিং অথবা এমনও হতে পারে যে, ফোনকারিণী (ফোনিনী বলা যাবে কী?) কোনো সদ্য গজানো ব্যাঙ্ক, অসম্ভব সুবিধা প্রদানকারী বীমা (বিতাংসহ, অর্থাৎ মরলে এত, আধমরা হলে এত, না মরলে এত বছর বাদে এত এত করে। বেশ্যায়নের যুগ বলে কথা। বেশী আনায়ন করে তাই বেশ্যায়ন, পাঠক কু-অর্থে নেবেন না) এইসব প্রতিষ্ঠানের ক্যানভাসারিণী। তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের চাকরির স্বার্থে অসম্ভব অসম্ভব প্রস্তাব ফিরি করবেন। কিন্তু আমার মতো একটা নিপাট অলস, এক পা ইলেকট্রিক চুল্লিতে, অন্য পা তথাকথিত কাতর (যাঁরা আমার ফুটে যাওয়ার ব্যাপারটাকে অন্যথায় আপদ বিদেয় অথবা লাভজনকই বিবেচনা করেন।) আত্মজনেদের দখলে, সেরকম এক হতচ্ছাড়া হাবড়ায় দিবানিদ্রাটা নষ্ট করার হেতু কী? কর্পোরেট কর্তারা এঁদের জন্য বেহতর বিকল্প ব্যবস্থা করুন। নচেৎ, নচেৎ আর কী, আমার মতো দিবানিদ্রাবিলাসী গলিত বৃদ্ধরা ভুল জায়গায় বেফাঁস বিরক্তি দেখাবার কসরৎ করতে গিয়ে লোকের শাপমন্যি কুড়োবে বই তো নয়। যাক সেসব "অ্যাপাচ্‌লা" কথা।

কুলু কুলু ধ্বনিল, আমি কী—'র' বাবুর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি? আমার নাম অলকনন্দা প্যাটেল (শব্দটি 'পটেল' শব্দের ইঙ্গ-বাঙলা ব্যবহার।)

বললাম, বলছি।—অতি কুৎসিৎ শোনাল নিজের কানেই। বলতেই পারতাম, 'বলুন' আমিই সেই। তা নয় গেরেস্তারি গলায় 'বলছি' মানে যেন কোন্ শালা ঘ্যাম তার সঙ্গে কথা বলার পারমিশন দিচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই, কুলুকুলু ধ্বনির বাঙলা বাক্যটির অ-বাঙালি, এমন কী প্রায় অ-ভারতীয় উচ্চারণে এবং 'প্যাটেল' কুলোপাধিতে আমি ততক্ষণে নিশ্চিত যে প্রশ্নকর্ত্রী অবশ্যই জনৈকা গুজরাতি ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি ওয়ালি এবং তাঁর এই সুমিষ্ট বাঙ্‌বিস্তারে আমার সাধের এই ঘুমটির তৎস্থানে জ্বালাময়ী নিদ্রাহর মলমটি প্রলেপ করবেন এবং নিদ্রাটি হ্যাং হয়ে থাকবে। এই নিদ্রাটি উপভোগ করবো বলে পরিবার পরিজন এমনকী 'বাড়ির জনের' আপত্তি গ্রাহ্য না করে, এখনো সাতবছর বাকি, কামধেনু চাকরিটিতে তুড়ি মেরে যে স্বেচ্ছাবসর নিয়েছি, মানিনী-ফোনিনীরা তার মর্ম কী বুঝবেন?

সুতরাং অসভ্যতা তার মাত্রা ছাড়ালো,—মাফ করবেন আমার ক্রেডিট কার্ড জাতীয় কিছু, অথবা কোনোরকম আধুনিক গৃহসরঞ্জামের কোনো প্রয়োজন নেই, এমন একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে মুক্তি চাইলাম। উত্তরে কুলুকুলু পুনঃ ভাষিল, 'সরি, ওসব ক্রেডিট কার্ড টার্ড নয়। আসলে আমার পদবি দাশগুপ্ত। অলকনন্দা দাশগুপ্ত। আমি প্যাটেল পরিবারে বিয়ে করেছি বলে প্যাটেল হয়েছি। ভাষা এতক্ষণে শতকরা নব্বই ভাগ ODBL অনুযায়ী হয়েছে। কিন্তু 'দাশগুপ্ত' শুনেই আবার ব্রহ্মরন্ধ্রে স্বজাতি বিষয়ক কুলকুণ্ডলিনী সতর্ক হল। কারণ, মনে আগেভাগেই কুবাতাস ঢুকলে তা বড়ো এলোমেলো বয়।

'দাশগুপ্ত' তো মরতে প্যাটেল ঘরণী হতে গেলেন কেন? দেশে কী পালটি ঘর হিসাবে 'সেনগুপ্তরা' ছিল না?—ভাগ্যিস এই চিন্তাটা উচ্চারণ করিনি। তাহলে কেলেঙ্কারির বেহদ্দ হতো। বললাম, মানে তোতলালাম, 'আসলে এই সময়টাতেই ওনারা সব টেলিফোনাদি করেন কিনা, ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করবেন।

এ একেবারে দুই পা খোঁড়া ওজর, কোনোমতেই দাঁড়ায় না। কিন্তু নিক্ষিপ্ত শব্দ এবং তিরের নিয়ম তো একটাই, ছুঁড়লে আর ফেরানো যায় না।

—ওনারা মানে কারা?

—ওই ক্রেডিট-কার্ড ওয়ালিরা। সে যে কী যন্ত্রণা, কী বলবো আপনাকে।

—না, সে ভয় নেই। আমার কর্তার নাম আই. জি. প্যাটেল, এক্স গভর্নর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। অবসরের পরে বিশ্বব্যাঙ্কে—।

BanglaBook.org

ভাগ্যিস বছর পাঁচেক আগে ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে চাকরিকে 'দুত্তোর নিকুচি করেছে' বলে নির্মল অলসতা উপভোগ করছি। আমিও ছিলাম ব্যাঙ্কের লোক। তবে আই. জির চেয়ার খানার থেকে আমার খানার দূরত্ব প্রায় হাজার পাঁচেক কিলোমিটার কী তারো কিছু বেশি। দূরত্বটা তাঁর দিক থেকে ধরলে, উপর থেকে নীচের দিকে। আমার ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে প্রয়োজনে তিনি 'পানি লাও, চায়ে লাও' করতে পারতেন, কী কান ধরে ওঠবোস করানোর পদাধিকারে ছিলেন, এমনও বলা যায়। নাম শুনেছি। দেখেনি কখনো। ভদ্রলোকের ঐ পদাধিকার ছাড়াও, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক পরিচিতির কথাও শুনেছি। শান্তিনিকেতনে তাঁর কিছু বন্ধুজনের সঙ্গে পরিচয়ও আছে। কিন্তু কোনোটাই আপৎকালে কাজে এলো না। তাঁরই বৌকে কিনা ক্রেডিট কার্ডের ক্যানভাসার ঠাউরে—ছ্যা, ছ্যা, ছ্যা। লোকেরা যে আমাকে 'খাজা' বলে, সে কিছু মিথ্যে নয়। কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে। আসলে সময়মতো আমি দরকারি অনেক কথা, বিশিষ্ট লোকেদের পরিচয়, বেবাক কেমন যেন ভুলে যাই। অবশ্য এরকম কেলেঙ্কারি আমার কিছু নতুন নয়। প্রসঙ্গক্রমে আরেকটা অসাধারণ কাণ্ডের কথা বলি শুনুন।

পুলিশ বিভাগের অধুনা প্রয়াত এক বড়ো কর্তার সঙ্গে আমার বেশ গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। যদিও সবাই জানেন, পুলিশ ছোট হোক, বড়ো হোক কারো বন্ধু হয় না। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটা ব্যতিক্রমই ছিল বলতে হবে। ভদ্রলোক সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে যথেষ্ট পরিচিত এবং জমাট ব্যক্তিত্ব হিসাবেই আদৃত ছিলেন। স্বয়ং নামী উর্দু কবি। নামটা করলাম না, এপারে ওপারে অনেকেই তাঁকে চেনেন। আমি মানুষটা পেঁচুরে মার্কা হলেও বন্ধুভাগ্য অনেকের কাছেই ঈর্ষার। নামটা করছি না একারণে যে তাহলে কথায় কথায় অনেক কথা এসে পড়বে; যার ফলে বেমতলব কথাকথির উদ্ভব হতে পারে। বন্ধুটি কবি ছিলেন এবং এক কবি বলেছেন, (তিনিও এঁর জিগরি দোস্ত) 'কবিরা বড়ো সামাজিক নয়', না কি যেন ঐরকম একটাকথা। কিন্তু তিনি বন্ধুমার্গে অন্তত সামাজিক ছিলেন।

তাঁর গৃহে মাঝেমধ্যেই আমার নেমন্তন্ন হত। বন্ধু পদস্থ এবং বিখ্যাত লোক। সুতরাং তাঁর বাসায় অনেক বিখ্যাত লোকের আনাগোনা হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই বাসাতেই মরহুম বিসমিল্লাহ খান সাহেবকে তাঁর জীবৎকালে আমি দেখেছি। কিন্তু সেবার এখানেই গণ্ডগোলটা পাকিয়ে ফেললাম। বন্ধু আমাকে তাঁর

BanglaBook.org

অন্তরঙ্গ সুহৃদ এবং সেদিনের প্রধান মেহমান, প্রখ্যাত ক্রিকেটার সেলিম দুরানির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। সেলিম দুরানির ক্রিকেটারত্ব বিষয়ে কিছু উল্লেখ আলাপ করাবার প্রাক্কালে করেননি। করার কথাও নয়। ব্যাপারটা অনেকটা রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে বলতে গিয়ে তাঁকে কবি বা বিশ্বকবি বলে উল্লেখ করার মতোই অধিকন্তু। তিনি শুধু বলছিলেন, "সেলিম ভাইসে মিলো। সেলিম ভাই হায়দারাবাদসে আয়ে হেঁ হাম লোগোসে মিল্‌নে।" আমিও "হ্যালো সেলিম ভাই" বলে তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে খানিকক্ষণের মধ্যেই খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম তাঁর। ভারি চমৎকার মানুষ এবং ঐরকম সাতফুট সুদর্শন একজন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া খুবই ভাগ্যের কথা। তাঁর গুণ বিষয়ক কিছু জানার কথা তখন আমার মনেই আসেনি। ক্রিকেটে আমার কোনকালে আসক্তি নেই, ব্যাপারটা খুবই অশ্লীল শোনালেও সত্য। অল্পবয়সে কখনো কখনো রেডিওতে টেস্ট ম্যাচের ধারাবিরবণী শুনেছি, সেও সামান্য। আমার বন্ধুটি সাহিত্য শিল্পের লোক। সুতরাং আমি প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হিসাবেই ধরে নিয়েছিলাম যে সেলিম ভাই যখন এঁর বন্ধু, তিনি নিশ্চয় কোনো পত্র পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত, অথবা কবিটবিই হবেন। সেদিন সবাই বেশ একটু বিয়ারপানে উচ্ছল ছিলাম। সেলিমকে খুব অন্তরঙ্গভাবে জিজ্ঞেস করে বসলাম, সেলিম ভাই, আপ কওন্ আখ্‌বরমে লিখতে হেঁ?

এক ঘর নামী দামী মেহমানদের মধ্যে এরপর যে কাণ্ড হয়েছিল পাঠক, নিজেরাই তা অনুমান করে নেবেন। নিজের কীর্তির ঢাক আর নাই বা বাজালাম। শুধু সবাইকে স্তব্ধ করে দিয়ে সেলিম ভাই আমাকে আলিঙ্গনে বেঁধে বলেছিলেন, At least one man in the world has taken me as a writer, I am really honoured. মাশাল্লাহ্। I shall prepare today's meat instead of the cook, I am a sixer in cooking too.

আমার অনারে সেদিন সেলিম মাংস রান্না করেছিলেন এবং এর দুদিন পরে ফোনে আবারও দাওয়াত দিয়েছিলেন বন্ধুর বাসা থেকেই। একটা চ্যারিটি ম্যাচের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন তিনি। ম্যাচটা অবশ্য দেখিনি, তবে মাংসটা রান্না দুদিনই অপূর্ব হয়েছিল। তাই বলছিলাম আমার গুণে নুন দেবার জায়গা নেই, যে যাই বলুন।

এইসব নেহায়েৎই পাঁচপেঁচি কথা। কথায় কথায় বললাম আর কি। তবে

BanglaBook.org

কোনো শীত, নিদাঘ বা বর্ষার দ্বিপ্রহরে যাঁরা আমার মতো বুড়ো আলসেদের দিবানিদ্রার ব্যাঘাত ঘটান, সেইসব ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির ক্যানভাসারিণীদের এর দ্বারা কোনোভাবেই ছোট করার মানসিকতা আমার নেই। তবে তাঁদের বাংলা বাগধারা বিষয়ে আমার আপত্তি থাকলোই, যতক্ষণ না পরবর্তী ODBL-এর খণ্ডটিতে সেইসব বাগধারাকে যথাযথ কৌলীন্যে সংস্থাপন করা হয়।

।। ছয় ।।

নিজের ঈদৃশ বোগ্দামো নিয়ে অনন্ত-পার 'কিসসা' শোনানো যায়। কিন্তু তাতে নিজের বা পাঠকদের কিছুমাত্র উপকারের সম্ভাবনা নেই। সুতরাং অলকনন্দা বৃত্তান্তে প্রত্যাবর্তন করি। 'কুলু কুলু', স্বভাবতই তাঁকে ক্রেডিট-কার্ডওয়ালি ধরে নিয়েছিলাম বলে পুলকিত বোধ করেননি। বরং মনে মনে বিলক্ষণ চটেছিলেন। তাই 'আই. জি.' অর্থাৎ তাঁর স্বামীর পরিচয় দিয়ে আমাকে হতভম্ব করার পরেও আত্মপরিচয় দানে দাঁড়ি টানেননি। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গবর্নরের বৌ ক্রেডিট কার্ড-ওয়ালি!

সুতরাং পূণঃ ভাষিলেন, আমার বাবার নাম অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্ত। আমার 'ছোট ভাই (স্যার) পার্থ দাশগুপ্ত। 'দেশ' ছিল বরিশালের গৈলা গ্রামে।" এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে—"। 'বইশ্‌শাল, গৈলা, কথা দুইটা আগে কইলে, বোগ্দামো করতে কোন পাডায়?' তদুপরি অমিয় দাশগুপ্ত, পার্থ দাশগুপ্ত ইত্যাকার নামগুলো চন্দ্রদ্বীপ-জাতকদের মধ্যে এপারে ওপারে এমন কোন্ 'পড়উয়া পাডা' আছে যাদের নাড়া দেবে না। কিন্তু তথাপি আরেকটু খেলাবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। তাই উত্তরটা কী হবে, জানা থাকা সত্ত্বেও প্রশ্ন করলাম, 'গৈলা? কোন্ বাড়ি?

—বক্‌সি বাড়ি।

এবার আর বৈদ্য-জাতীয় আত্মীয়তা প্রকাশের অবশ্যম্ভাবী উদগ্রতা 'দাবায়ে' রাখা গেল না। বললাম, সে বাড়িতেতো আমার এক পিসিমার বিয়ে হয়েছিল। পিসেমশায়ের নাম অধ্যাপক প্রফুল্ল দাশগুপ্ত, যিনি 'উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম' নামক একটি বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক, যদিও স্বয়ং ইংরাজি সাহিত্যের লোক, কাজটা করলেন বাংলা সাহিত্য নিয়ে।

—উনিতো আমার জেঠা মশাই।

BanglaBook.org

ঈশ্বর, বৈদ্যদের হাত থেকে বৈদ্যদের রক্ষা করো। বিশেষত, মদৃশ গো-বৈদ্যদের। এদের শেকড়ে-শেকড়ে আত্মীয়তা। ঝাঁকি-জালের বুনোটের মতো, একটা ফাঁস ধরে এগোতে থাকলেই মূল দড়িটায় পৌঁছানো যায়। বৃহত্তর মানব সমাজ সম্বন্ধেও ব্যাপারটি তাই, কিন্তু তা নিয়ে কেউ খোঁজখবর করে না। করলে হয়তো গোটা নৃকুলের কিছু বলদ-সুলভ আচার আচরণ সংহত হতো। শিং আছে, তাই গুঁতোবো, এটা বলদদেরই কালচার বটে। তবে বৈদ্যরা স্বজনপ্রীতির জন্য যতই বিখ্যাত হন, তাঁরা একে অন্যকে গুঁতোন না, এমন প্রমাণাভাব। অবশ্য সেটাকে বৃহৎ-সংসর্গের দোষ হিসাবেই দেখতে হবে। বৃহৎ মনুষ্য-সমাজের সংসর্গের।

কথাটা যখন উঠলই, একটু স্ব-জাতি দোষ কীর্তনও করা যাক্। দুইজন পরস্পর অপরিচিত বৈদ্য আলাপের দ্বিতীয়, খুব বেশি হলে তৃতীয় বাক্যটি থেকেই বুঝে গেলেন যে তাঁরা একে অন্যের আত্মীয়। এই আত্মীয়তার ঘনত্ব 'তুতো' থেকে 'আপন' পর্যন্ত এগোলে অনেক সময় দেখা যায় যে একজন অপরজনের গুরুজন স্থানীয়। কিন্তু ততক্ষণে হয়তো উভয়েই বয়স্যসুলভ এমন কিছু বাগধারা ব্যবহার করে বসে আছেন যে, সম্পর্কে 'ছোটোর' ক্ষেত্রে ব্যাপারটা প্রচলিত শিষ্টাচার বিরোধী, প্রায় বেয়াদপির পর্যায়ে চলে গেছে। বৈদ্য পুরুষ নারী নির্বিশেষে চরিত্রের খুব একটা প্রশংসার কথা তাদের কুল পঞ্জিকাতেও পাওয়া যায় না। সুতরাং আত্মীয়তার এই ব্যাপকতা বাপ-ছেলে পর্যন্ত গড়াতে পারে। জাত-গৌরবী, বংশ পুরুষ বিষয়ক 'বাত্তেলা বাজেরা' এসব কথায় ক্রুদ্ধ হতে পারেন, তবে উচ্চ বংশগর্বীদের দুঃখবোধ করার হেতু নেই। বাঙালি জাতটারই নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস এরকম। জাত হিসাবে বৈদ্যরা, বিশেষত যাঁরা কিছুটা পুঁথি-পুস্তক এখনো নাড়াঘাঁটা করেন, তাঁরা এইসব গূহ্য তত্ত্ব প্রকাশে আদৌ কুণ্ঠিত হন না। একটি প্রচলিত জাত্যর্থ-বাচক প্রাচীন শোলোক (আসলে 'শাস্তর' কয় এগুলারে) উদ্ধৃত করে প্রসঙ্গটির ইতি করি, 'শাস্তর'টি চান্দ্রদীপি—

"নাপ্‌তেরে খামার দিয়া মাথায় পড় চূড়া
চাইর পুরুষ পাউছাইয়া দ্যাখফা নাপতা তোমার খুড়া।"

এসব বৃত্তান্ত অন্যত্র ঢের বলেছি, কিন্তু হোনেইবা কেডা, আর, পড়েই বা কেডা? মানুষকে যে কবে জাতবংশের বাইরে এনে আমরা 'মানবপুত্র' হিসাবে গ্রহণ করতে পারবো খোদায় মালুম।

BanglaBook.org

তবু শেকড় বাকড়ের এক আধটা তন্তু ধরে এগোলে কাণ্ডের খবর পাওয়া যায়, যেমন জালের ফাঁস আর দড়ির বৃত্তান্তটা বললাম। অলকনন্দা অবশ্য আত্মীয়তার প্রচলিত বৈদ্যজাতিসুলভ ছ্যাব্‌লা অনুসন্ধিৎসা দেখাননি। নেহাৎই পরিচয়ের উত্তাপে দুপক্ষেরই যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে।

আমার খবর পেলেন কী করে এবং কেন? এই প্রশ্নটাই ঠিক করেছিলাম কিনা, মনে নেই। এরকমই কিছু সম্ভবত প্রশ্নাকারে ছিল। উনি বললেন, বাসু, মানে বাসুদেব দাশগুপ্তর কাছে। সেইতো আপনার সব বইপত্তর আমাকে পাঠায়। আপনার সঅব বই ও আমাকে পাঠিয়েছে। পড়ে আমার খুব আনন্দ হয়েছে, সত্যি খুউব ভালো লেগেছে আমার।

ইস্‌স্‌, কী গাধার গাধা আমি! একজন মুগ্ধ পাঠক (আজ কাল লেখক পাঠকের স্ত্রীং হয় না, আবার যদিও ইনি স্ত্রীং কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষণটিও 'মুগ্ধা' বলা যাবে না।) মুফতে লেখকের প্রশংসা করার জন্য গাঁটের পয়সা খরচ করে ফোন করলেন, আর আমি ...। লোকে আমার বই পড়ে 'বধাই' দিতে চাইছে। আর আমি কিনা ...। না আমার সত্যিই কোনো ভবিষ্যৎ নেই। নিজের পায়ে কেউ এভাবে কুড়ুল মারে?— আপনি কী হাঙর বংশী বাসুদেব দাশগুপ্তের কথা বলছেন, যিনি অশোক নগরে থাকেন? অর্থাৎ আমি হাংরি জেনারেশানের বাসুদেবের কথা বলছি,—আমি এতক্ষণের পাপ কাটাতে চেষ্টা করি।

—আবার কে? ওতো সম্পর্কে আমার বোনপো।

ইস্‌স্‌, আবার বৈদ্য-আত্মীয়তা।

—ষাটের দশকে হাংরি জেনারেশানের মধ্যে যাঁরা গল্পকার, বাসুদার তুল্য গিফটেড তাঁদের মধ্যে ক'জন আছেন বা ছিলেন, বলে মনে হয় আপনার? আমি অবশ্য আপনাদের মতো পড়ুয়া নই, আর বাসুদাও মাত্র বছর দেড়েক হলো ফোনে আমার সঙ্গে আলাপ করেছেন। সামান্য দু-চারটি গল্পমাত্র পড়েছি তাঁর। এখনতো বহুকাল ধরে লেখেনই না। এখনও সামনাসামনি আলাপ হয়নি। ভাবছি, একবার অশোকনগর যাব। প্রায়ই বলেনও। হয়ে উঠছে না।

অলকানন্দা হাসলেন। 'অনেক কথাই বললেন, কিন্তু ফোনে তো সব কথা হয় না। কালই বরোদায় চলে যাচ্ছি, ওখানেই থাকি তো। কখনো বিদেশে, কোলকাতায় খুব একটা আসা হয় না। পরে যখন আসবো, দেখা হবে নিশ্চয়ই, অনেক কথা হবে তখন। তবে ঠিকই বলেছেন, বাসু সত্যি অসাধারণ গিফটেড, কিন্তু লিখবে না।

BanglaBook.org

অভিমান আছে। ও সারাজীবন বাঁধনছেঁড়াই রয়ে গেল। খালাসিটোলার রাস্তাটায় যে বা যারা ওর সঙ্গী ছিল, তারা আখের গুছিয়েছে যথাসময়ে। মনে হয়, তারা ঈর্ষাপরায়ণ ছিল ওর প্রতিভার ব্যাপারে। ও পারল না।

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বাসুদার সঙ্গে আমার পরিচয়ের কথা বলতে গিয়ে কিছু বাড়তি কথা বলছি। বাসুদা আমার ফোন নম্বর এবং ব্যাপক পরিচয় জেনেছিলেন এক অত্যন্ত শুভানুধ্যায়ী এবং শ্রদ্ধেয় দাদাবন্ধুর কাছ থেকে। তাঁর নাম প্রশান্ত রায়। তিনি লেখক-গল্পকার নন, তাঁর চমৎকারিত্ব অন্য বিষয়ে। তিনি স্বভাব বাউল। অসামান্য আখড়াবাজ। এরকম একজন বন্ধুবৎসল, রসিক, জীবন-প্রেমী এবং সদাতুষ্ট মানুষ আমি জীবনে খুব বেশি পাইনি। এপার বঙ্গের হেন বাউল, ফকির, বোষ্টম বা সহজিয়া ধারার আখড়া, আশ্রম নেই তাঁর যেখানে পদপাত তথা নিশিযাপন ঘটেনি। বাউল গান বাঁধার চমৎকার দক্ষতা ছিল তাঁর। জয়দেব-কেঁদুলি, নানুর বা বীরভূমের অন্যান্য স্থানের বাউলেরা হামেশাই প্রশান্ত গোঁসাই-এর রচিত গান গেয়ে থাকেন। নিজেও সুগায়ক তথা সুকণ্ঠের অধিকারী।

কর্মে অবসর গ্রহণের পর তিনি তাঁর প্রিয় জায়গা মিহিজামের সংলগ্ন চিত্তরঞ্জন ছেড়ে, বাধ্য হয়েই অশোক নগরে থাকেন। স্বভাবগুণে নতুন জায়গাতেও মনপসন্দ্ মানুষের আখড়া গড়ে তুলতে তাঁর সময় লাগেনি। সাধারণ, অসাধারণ সর্বস্তরেই গতায়াতে তাঁর সমান দক্ষতা। বাউল জগতে তাঁর দীর্ঘ প্রব্রজনার ফল হিসাবে সংগৃহীত অজস্র গান নিয়ে তিনি একটি সংকলন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন, যা প্রকাশকের অপেক্ষায়। প্রকাশিত হলে কাজটি গুণীজনের কাছে নিঃসন্দেহে সমাদর পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি একটি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তবে তাঁর প্রাণশক্তি এবং জীবনস্পৃহার প্রাবল্যে তিনি ভালোই আছেন এখনও। আশাকরি, ভালোই থাকবেন তিনি। যাইহোক এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার গাঢ়তা হয় নব্বই-এর দশকের শুরুতে। অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই উল্লেখ করছি যে আমার সামান্য লেখালেখির জীবনে তাঁর অবদান অপরিসীম। এঁর মতো মানুষেরা সেই বিরল প্রজাতির লেখক, যাঁরা পাণ্ডিত্যের জন্য পড়েন না, রসগ্রহণের জন্য পড়েন এবং বন্ধুবান্ধবদের লেখাপত্র কিনে পড়েন। আমি দীর্ঘ দেড়-বছরকাল একটানা তাঁর আতিথ্য, স্নেহ এবং সঙ্গ লাভ করে ধন্য হয়েছি। অবসর নিয়ে তিনি অশোকনগরে বসবাস

BanglaBook.org

করছেন। এখানে বাসুদেবদাও থাকতেন আগে থেকেই। সম্ভবত, বাসুদাকে তিনিই আমার সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম বইটি পড়ান এবং তারপরই বাসুদার সঙ্গে আমার ফোনালাপ ঘটে।

বাসুদা 'বিষাদবৃক্ষ' বইটি বোধহয় বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই কেনেন। বইটি পড়ার পর ফোন মারফৎ তিনি যে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর মাপের একজন লেখকের কাছ থেকে, বিশেষ করে তিনি যে ঘরানার কথাসাহিত্যিক, তাঁর মুখ থেকে ওই মুগ্ধতার প্রকাশ শোনা যে কতটা ভাগ্যের আর আনন্দের কথা, তা বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখন অলকনন্দা বলছেন, তিনি তাঁর মাসি। ভাগ্যিস বাসুদা তাঁর আমার মধ্যে বৈদ্যজাতকীয় আত্মীয়তার সন্ধানে যাননি, আমিও না!

অলকনন্দাকে কলকাতা, শান্তিনিকেতন, এমনকী বলতে গেলে এপার-ওপার বাংলার তাবৎ বিদ্বৎসমাজ শুধু ড. অমিয় দাশগুপ্ত নামক বিশ্বখ্যাত অর্থশাস্ত্রবিদের কন্যা, বা আই. জি. প্যাটেল নামক তীক্ষ্ণধী একজন অর্থনীতিবিদ বা উচ্চপদাধিকারীর পত্নী হিসাবেই জানেন না, তাঁর কৃতিত্বও ওই অর্থশাস্ত্রেই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে, ছাত্র হিসাবে এবং অধ্যাপিকা হিসাবে। যদিও অধ্যাপনা তিনি একটানা করেননি। ইকোনমিকসের ছাত্রী হিসাবে বেনারসের হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। ততদিনে জীবনের সার্থক ছোটোগল্পটি অর্থাৎ যেটি আসলে সব চাইতে বড়োগল্প তা ঘটে গেছে। প্রণয় এবং পরিণয়। অতঃপর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সপ্রতি গমন, হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আবার অর্থশাস্ত্রেই আরেকটা ফাটাফাটি কাণ্ড। অতঃপর ভবঘুরের পাঠশালায়। এখনও নিজের বিষয় নিয়ে তিনি যথেষ্টই কাজকর্ম করেন, কিন্তু সেসব কথা নিয়ে পাঁচকাহন তিনি নিজেও বলেন না, অন্য কেউ বলুক তাও পছন্দ করেন না। সেসব কথা বাদ দিয়ে শুধু একটি যথার্থ গুণের কথা জানাই। সেটি হল তাঁর সঙ্গীত। ধ্রুপদী সঙ্গীতে আমার সামান্যতম গ্রাহকতা নেই, তবে তাঁর কণ্ঠে কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ এবং নজরুলগীতি শোনার এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। কোনো অনুষ্ঠান নয়, একেবারেই ঘরোয়া, আমার নিজস্ব পারিবারিক বৃত্তে। আমার বাড়িতে।

যে কারণে এরকম একটা লেখা ফেঁদেছি সেটা শুরুতে বলেছি, তবু আরেকটু খোলসা করা দরকার। সেটা মূলত এই যে আমার মতো একজন অতি নগণ্য

BanglaBook.org

কলমচিকেও কিছু হয়ে ওঠার ব্যাপারে কত অসাধারণ এবং সাধারণের কাছে ঋণী থাকতে হয়। টেলিফোনে যখন কথা হয়েছিল, তখনো 'বিষাদবৃক্ষ' আনন্দ পুরস্কার পাবে এমন কোনো খবর কোনো স্তরেই ছিল না। বাসুদা, অলকনন্দা, শঙ্খ ঘোষ, অশ্রুকুমার সিকদার ইত্যাদি স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা পুরস্কার পাবার খবরের অনেক আগেই টেলিফোনে বইটির জন্য আমাকে সাধুবাদ, আশীর্বচন জানিয়েছিলেন। তপন রায়চৌধুরী এবং রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের তো কথাই নেই। তাঁরা তো লিখিতভাবেই বইখানিকে আশীর্বাদ জানিয়ে রেখেছিলেন। বাংলাদেশের খ্যাতনামা লেখক, রুশ ভাষার অনুবাদক এবং বুদ্ধিজীবী দ্বিজেন শর্মাও একটি সুদীর্ঘ আলোচনা নিবন্ধ লিখেছিলেন মিজানুর রহমানের ত্রৈমাসিকে। সেটিও পুরস্কার পাবার আগের ঘটনা। অলকনন্দাই এঁদের মধ্যে বোধহয় শেষের দিকের। তাঁর টেলিফোনটি পাবার কয়েকদিনের মধ্যেই পুরস্কার সংক্রান্ত খবরটি এক দুপুরবেলা (বোধহয় ৫ই মার্চ ২০০৫) কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী টেলিফোনে আমাকে জানান। সেই খবর বাসুদাই অলকনন্দাকে জানিয়েছিলেন কয়েকদিনের মধ্যেই।

যা হোক, এতক্ষণে যে উপহারগুলি পাঠকদের সামনে উপস্থিত করব বলে এত বকবক করলাম, তার সবকটিই অবিকৃতভাবে এখানে উদ্ধৃত করছি। উপহারটি অলকনন্দার প্রথম চিঠি এবং আমার উত্তর। এ চিঠিটির পর, কয়েকবার টেলিফোনে কথা হয়েছে এবং আরেকটি চিঠির মাধ্যমে নামের শেষ থেকে 'বাবু' লেজটি তথা 'আপনি' 'আজ্ঞে' ইত্যাদি খসে ঘরোয়া হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত, পাঠকস্বার্থে প্রয়োজনে কিছু টীকা, মন্তব্য ইত্যাদি সংযোজন করার অধিকার হাতে রাখলাম। হয়তো প্রয়োজন হতে পারে। না করাটার ইচ্ছাই প্রবল। নাম পরিচয়ের অতিরিক্ত টিপ্পনী ব্যক্তিগত খবরের স্থূলতা অনাবশ্যক বাড়ায়।

চিঠি কয়েকটিই উদ্ধৃত করার ইচ্ছে। আগেই জানিয়েছি বৈদ্যদের সব চাইতে বদ অভ্যাস হল নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তা। কে যেন বলেছিল 'বদ' ধাতুর থেকেই নাকি বৈদ্যের উৎপত্তি। কথাটা অর্থগতভাবে সঠিক হলেও একটু ব্যাকরণ দোষ আছে। বদ কথাটা ঠিক ধাতুমূল থেকে আসেনি শব্দমূল থেকে এসেছে। তাতে অবশ্য অর্থগত ব্যপ্তিটা বেশিই হয়। কুটুম্বিতার গোপন খবর খুঁজে বার করার এক অদম্য স্বভাব আছে এই জাতটার। বাসুদার মধ্যে সেই

BanglaBook.org

অভ্যাসটি ছিল না। অলকনন্দারও কম। তবে তাঁর স্বভাবটা আত্মীয় হয়ে ওঠা। বাসুদা হয়ে উঠতে পারলেন না। সময় হল না। হঠাৎ করে চলে গেলেন। সেই খবরও জানলাম অলকনন্দার পত্রেই। অথবা প্রশান্তদার ফোনে, ঠিক স্মরণ নেই। বাসুদার সঙ্গে ফোন পরিচয় মাত্র বছর দুয়েকের। তিনি অলকনন্দার বিষয়ে কোনো খবর আমাকে বলেননি। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা আত্মীয়তার স্তরে অবশ্যই পৌঁছত যদি একবার তাঁর সামনাসামনি হতে পারতাম। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জীবনে তখন এক মহাপ্রলয়ের ভ্রূকুটি দেখা দিয়েছে। আমার সর্বকনিষ্ঠ ভাইটি (মন্টু অর্থাৎ অশোক সেনগুপ্ত), যাকে প্রায় সন্তানের মতো মানুষ করেছিলাম, যার বিবরণ বিষাদবৃক্ষেও যথেষ্ট রেখেছি, তার ফুসফুসে ক্যানসার ধরা পড়ে। আনন্দ পুরস্কারের আনন্দ আর উত্তেজনাকে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল এই সংবাদ। আমার গোটা পরিবারকেই একেবারে লণ্ডভণ্ড অবস্থায় এনে ফেলেছিল মাত্র কয়েকটা দিনের ব্যবধানেই। এরই এক বছরের মধ্যে বাসুদা আমাকে কোনো সুযোগ না দিয়েই চলে গেলেন। সুতরাং আত্মীয়তার গাঢ়তায় তাঁর কাছে পৌঁছতেই পারলাম না। অনুজ লেখককে স্নেহের পুরস্কার হিসাবে (বিষাদবৃক্ষ রচনার জন্য) বাসুদা রেজিস্ট্রি পোস্টে একটা চমৎকার গল্প সংকলন পাঠিয়েছিলেন। তাঁর নিজেরও একটি অসাধারণ গল্প তাতে ছিল, 'বমন রহস্য।' ওই মাপের গল্প পড়লে মনে হয় অধুনাকার লেখক-যশোপ্রার্থীদের আত্মপ্রচারের আদেখলাপনা তাতে অনেক সংহত হতে পারে। কিন্তু পড়ে কজন? বিশেষত, এক লেখকতো অন্য একজন লেখককে সতীন মনে করেন। তবে আবার বলি, পড়লে আত্মগরিমা প্রচারটা সংহত হয়। আমার অন্তত হয়েছে। ফোনে বইটির প্রাপ্তিস্বীকার এবং গল্পটি পড়ে মুগ্ধতার কথা জানালে বলেছিলেন, 'ওসব কিছু নয়। ও অনেকদিন আগের, ছেলেমানুষী করার বয়সের ব্যাপার। লিখতে আর পারলাম কই?

অলকনন্দার সঙ্গে আমার এবং আমার পরিজনদের আত্মীয়তা একটু একটু করে কীভাবে গড়ে উঠল, সেই বিষয়ে সম্যক ধারণা হবে তাঁর চিঠিগুলি পড়লে। আমি তার কয়েকটি মাত্র পত্র এখানে প্রকাশ করছি। কিছু চিঠি এদিক ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, যার প্রত্যেকটিই গভীর আন্তরিকতায় এবং প্রকৃত আত্মীয়তায় সমৃদ্ধ। সবগুলো দিতে পারলেই ভালো হত। কিন্তু অগোছালো মানুষদের যা হয় আর কী। কোনো কিছুই ঠিকঠাক থাকে না। আবার ভালো

BanglaBook.org

করে গুছিয়ে রাখলে তো কথাই নেই। সে আর খুঁজে পাওয়া দায়। আমি চিঠিগুলি ভালো করেই রেখেছিলাম। তবে ভালোতর করে রেখেছিলেন আমার গিন্নি। পাঠক এবং সম্পাদক পুং হলে জানবেন সেই ভালোতরর মানে কী। কিন্তু এবিষয়ে বিস্তারিত হওয়া আত্মহত্যার সামিল। তাতে পাঠকদের স্বস্তি জুটলেও আমার ইচ্ছে নেই আপাতত। এবার চিঠিগুলোর উদ্ধৃতিতে যাই।

12, Ami Society
Diwalipura
Vadodara-930015
৮ই এপ্রিল চৈত্রের শেষ বেলা (২০০৫)

প্রীতিভাজনেষু
মিহিরবাবু,

আপনার আনন্দ পুরস্কার পাবার সুসংবাদ বাসুদেব অনেক আগেই দিয়েছে। ভেবেছিলাম নববর্ষের পরেই লিখবো। তবে সে দিনের যেন আরো অনেক দেরী আছে তাই ধৈর্য্য হারিয়ে ফেললাম, 'তর সইলো না' ব'লতে হয়। আপনাকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। সবসময় যে স্বীকৃতি সঠিক জায়গায় পৌঁছোয় তা তো নয়—সেইজন্য আরো তৃপ্তি পাচ্ছি। ভালো থাকুন, আরো লিখুন—নতুন বছরের শুভেচ্ছা তাই জানাই।

আপনাকে বাঙলায় চিঠি লেখা একটা দুঃসাহস, ফাইজলামি, বোকামি সব কইথে পারেন'। সেই যে ছোটোবেলায়, চতুর্দিক বন্ধ পুলিশের এক গাড়িতে ঢাকা ছেড়েছিলাম, তারপর দেশে থাকা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গেই বা কতোটুকু সময় কাটিয়েছি? ভাষায় মরচে পড়ে গেছে। তবু কেন এ' ভাষায় লিখছি? বিজাতীয় 'জবানি'তে কি আমাদের দেশের জলের শান্ত দীঘি, সবুজ ঘাস, বাঁশবন, নারকোল, সুপুরি, পানের লতার স্মৃতি আনা যায়? পাটকাঠি বা শটীর ফুলের (কতোকাল পর আপনার কল্যাণে এ নামটি শুনলাম) কি কোনো ইংরেজী আছে? ধানক্ষেতের স্নিগ্ধতা যে `rice field` এ নেই তা' আমার থেকে ভালো আপনি জানেন। তাই আমার প্রচুর বানান ভুল একটু 'ক্ষমাঘেইন্না কইরা দ্যাখবেন'।

BanglaBook.org

'বিষাদ বৃক্ষ' নতুন ক'রে পড়লাম। পড়লাম বলাটা বোধহয় ভুল কারণ শুধু পড়ার মধ্যে একটু আবছা আলগোছা ভাব আছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে পিছিয়ে প্রতি শব্দ, প্রায় প্রতি অক্ষর বারবার পড়ে একটা নতুন অনুভূতি পেয়েছি। খুব কম লেখাকে আলিঙ্গন করতে ইচ্ছে করে—এ' বই সেই অল্প সংখ্যকের একটি। মনকে বড়োই নাড়া দেয়। জানতে ইচ্ছে করে আরো অনেক কিছু। এ'বই তো শুধু জীবনকাহিনী নয়—এ তো একটি পুরো সমাজের একটি সংস্কৃতির লুপ্ত হ'য়ে যাবার কাহিনী। সে সমাজ আমারও—তাই হয়তো বেশি করে দাগ কেটেছে মনে।

আপনি তো জানেন ২০০২র শেষে আমি ও ভাই গৈলা আমাদের গ্রামে গিয়েছিলাম। বড়ো সুন্দর আমাদের গ্রাম। গৌরনদির মিষ্টির স্বাদ আলাদা। তবে বর্ধিষ্ণু গ্রাম এখন প্রায় কঙ্কাল। জনসংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। হিন্দু যাঁরা আছেন, আমাদের জ্ঞাতি, তাঁরা অবিশ্যি শান্তিতেই আছেন—গৈলাতে কোনদিন হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ হয়নি। পাকিস্তানি ফৌজিদের অত্যাচার হয়েছে—তা' বাঙালিদের বিরুদ্ধে। ধর্মবিচার করে নাকি হয়নি।

আমাদের পারিবারিক বাড়ি—সবই খণ্ডর— কোথাও ভাঙা দেওয়ালে গাছপালা, কোথাও জঙ্গল। বংশপরম্পরায় চত্বরটি, যার ভগ্নাবশেষে স্টেজ বেঁধে আমার বাবা জ্যেঠারা নাটক করতেন তার কিছুই নেই। ওটা প্রায় 'বংশের তিলক'বলেই রাখা থাকতো। তা' তিলক' রা তো আজ এক যুগ ধ্বে শিকড়হীন, ঘরছাড়া। ডাব-সুপুরি আজও রক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে—এ' ডাবের জলের স্বাদ আলাদা। কিন্তু বৃদ্ধ বললেন, 'আমরা আপনাগো প্রজা'। আমাদের কোনো জমিজমা ছিলো ব'লে জানি না—অনেকেই সরকারি চাকরি করতেন বরিশাল, ঢাকা ইত্যাদি শহরে থেকে। প্রায় 'ভেনিসে'র মতো বাইরের রোজগারে গ্রাম উন্নয়ন হতো।

আমাদের প্রধান দীঘিটি আছে—নেই ঘাট, সিঁড়ি বা কালিমন্দির যার দিকে পেছন ক'রে আমার ঠাকুর্দামশায় ধ্যান করতেন। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন না তবে মূর্তিপুজোয় বিশ্বাস করতেন না। ঘাটের একদিকে যে সমাধির সার ছিলো, তা-ও নেই। বাড়ির চতুর্দিকে কতো যে পুকুর ছিল।

আপনার যেমন 'পিছারার খাল', তেমনি আমাদের পিছনের পুখইর—যা জান, খাল দিয়ে নদীপথে যেতো। এখান দিয়েই ৬০ বছর আগে আমাদের দিদি, বাড়ির বড়ো মেয়ে, মুকুট পরে, আট ভরি সোনার 'কান', পাঁচ ভরির টিকলি,

BanglaBook.org

ময়ূর লাগানো জড়োয়ার নেকলেস আর বেগুনি রঙের বেনারসি পড়ে ছোট্ট নৌকাতে তাঁর শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন। এ'সব গয়না ও-বাড়ি থেকেই এসেছিল—শুনেছিলাম এঁরা বাসণ্ডার জমিদার। আমার ৫ বছরের মনে রূপকথার রাজ্য মনে হয়েছিল— সেভাবেই রয়ে গিয়েছে।

বাসণ্ডাতে দিদি সুখেই ছিলেন। ৪৭-এ আসেননি। পরে, হয়তো ৫১-র দাঙ্গার সময়, পালিয়ে এসে কলকাতার কোনো উদ্বাস্তু পল্লি বা অন্য কোথাও টিনের চালের কুঠুরিতে বাকি জীবন কাটিয়ে দিলেন। জামাইবাবু জমিদারি না থাকলেও কোনো কাজ কোনোদিনই করতে পারলেন না। দিদির মুখে হাসিটি কিন্তু কোনোদিনই মিটে যায়নি, আশ্চর্য্য।

সেই পেছনের পুকুর আজ আর নেই। আশপাশের অনেক পুকুরই শুকনো, আগাছায় ভরা বা ঘোলাটে। 'জান' নেই, মাছের চাষ করতে হয়। তবু গ্রাম সুন্দর, সিগ্ধ—পায়ে চলা পথ ইতিহাস জড়িত। বাবা, ঠাকুর্দা, তাঁদের পূর্বপুরুষরা এই পথেই চলেছেন। আমাদের বংশের ৪০০ বছরের ইতিহাস।

যতোই দেশবিভাগ হোক বা বাড়ি খণ্ডর হোক, ওই খণ্ডর, ওই গৈলা-বক্সিবাড়ি আমার পরিচয়। আমার ঘরে বাবা-মায়ের ছবির পাশে বক্সি বাড়ির মাটি রাখা রয়েছে। মাঝে মাঝে বলতে ইচ্ছে করে, '(তবু) তুমি থেকো, দুটো কথা ক'এয়ো, ভুলে যেন দূরে যেও না।

এ' চিঠি প্রায় আপনার তপনদাকে লেখা চিঠির[১] কলেবর নিচ্ছে। তাই দাড়ি টানবার সময় এলো। 'বিষাদ বৃক্ষ' অনেক লুকিয়ে থাকা ক্ষত প্রকাশ ক'রে দিলো—অনেক চিন্তা মনে নিয়ে এলো। কোনো লেখক যদি তাঁর লেখাকে আমার আয়না ক'রে দিতে পারেন—নিজেকে চিনতে পারার, নিজের পারিপার্শ্বিক, সমাজকে চিনতে, বুঝতে পারার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেন—তাঁকে আমি অসাধারণ লেখক মনে করি। 'বিষাদ বৃক্ষ' অসাধারণ বই।

আপনার সঙ্গে দূরভাষে পরিচয় হয়েছে, চাক্ষুষ পরিচয়ের অপেক্ষায় আছি। চিঠির আদান-প্রদান থাকলে খুসি হবো। চিটি পড়তে হয়তো অসুবিধে হবে—শুধু বানান নয়—হরফও ঠিকমতো আসে না। পাঁচ পাতা (এখন দেখছি ছ'পাতা) বাঙলা বহুকাল লিখি নি। লিখে কিন্তু বড়ো ভালো লাগছে।

আপনারা সবাই নববর্ষের স্নেহ-শুভেচ্ছা নেবেন।

ইতি—

অলকনন্দা

BanglaBook.org

আমি ২৪শে এপ্রিল দু'মাসের জন্য বিদেশ যাচ্ছি—ফিরে এসে আশাকরি আপনার চিঠি দেখতে পাবো। 'ডাকঘর' যেতে যেতে সেই নববর্ষই এসে গেল। ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন।

'অ'

(১. আহ্লাদে ফাউকানো বা ভাটিপুত্রর পত্র বাখোয়াজি)

শ্রীমতী 'অ' এর চিঠিখানা পাওয়ার আগেই ফোন মারফত আনন্দ পুরস্কারের খবরটি তাঁকে জানাই। ইতিমধ্যে বাসুদা যে আগে ভাগেই খবরটি তাঁকে দিয়ে রেখেছেন তা জানার কোনো উপায় ছিল না। কারণ বাসুদা কখনোই অলকনন্দা বিষয়ক কোনো খবর আমাকে দেননি। বোধহয় বিখ্যাত লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় বা আত্মীয়তার কথা প্রকাশ করা তাঁর অভ্যাসেই ছিল না।

'অ' দিদি কিন্তু আগের অর্থাৎ প্রথম চিঠিটির পিঠে পিঠেই, আমার ফোন পেয়ে, 'পোষাকি' আলাপের বাহুল্য ছেড়ে দেবার সুযোগটি হাতছাড়া করেননি। অবশ্য পোষাকিয়ানা ছাড়ার অনুরোধটা প্রথম দূরভাষ-সংঘর্ষের সময় করেই রেখেছিলাম।

এই প্রসঙ্গে বলে নিই, নিয়ত এবং ত্বরিৎ যোগাযোগের ব্যাপারে টেলিফোনের বিস্তৃতি আমাদের যত সুবিধেই প্রদান করে থাকুক না কেন, তা একটি ব্যাপারে যে আমাদের নিরতিশয় ছোটলোক বানিয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। চিঠি আদানপ্রদানের মতো একটা সদগুণ আমরা পরিত্যাগ করেছি। উপরন্তু মোবাইলের আধিক্য এই ছোটলোকোমিকে আরো উন্নততর মাত্রা দিয়েছে। তা চিঠিপত্রের মতো একটা সুন্দর স্বাভাবিক সাহিত্যের ভাষাকে পর্যন্ত নোঙরা 'কীচরে' পরিণত করেছে। অধুনা প্রেমপত্রও নাকি S. M. S-এ চলে। তা চলুক, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু আমরা যারা প্রাচীন হয়েছি, তাদের বয়স, প্রেমাসক্তির মানসিকতা ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াকিবহাল না হয়েও আন্দাজে যেসব S. M. S. নিক্ষিপ্ত হয় তার হেতু বা ভাষা কোনটাই বুঝি না। শুধু মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতে সাধ হয়, "এতদিন কোথায় ছিলেন?" বা, অবেলায় জ্বালাচ্ছেন কেন?

যাক্ সেসব। মোদ্দা বক্তব্য হলো, দিদি এখনো ছোটলোক হননি। তাঁর নিয়ত দীর্ঘ চিঠি লেখাটাই সে বিষয়ে প্রমাণ। সত্যি বলতে কী এরকম চিঠি পেতে বেশ লাগে। কিন্তু উত্তরটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঐ ছোটলোকী যন্ত্রেই দিয়ে থাকি। যুগধর্ম এড়াতে পারি না। এবারে এই চিঠিটি দেখুন।

BanglaBook.org

বরোদা, ৯ই বৈশাখ ১৪১২

স্নেহাস্পদেষু,

পোষাকি সম্বোধন ছেড়ে দিলাম, 'তুমি'ও বলছি—দিদি ব'লে ডেকেছো যে।

তুমি নিজে ডেকে আমাকে সুসংবাদটি দিয়েছো, তাতে কতোটা খুসী হয়েছি বুঝতেই পারো। আজ শনিবার, অনুষ্ঠানের দিন—তুমি ব্যস্ত। কাল আমি বরোদা ছাড়ছি, আমিও ব্যস্ত—তাই ফোন না করে আবার চিঠি দিচ্ছি।

অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই খুব সুন্দর হবে। পরে সময় করে কে কী বললেন, সর্বোপরি তুমি কী বললে, জানিয়ো। ভালো লেখো—আমাদের মতো পাঠক পাঠিকারা তোমার লেখার অপেক্ষায় বসে থাকি।

'বৃহত্তর বরিশালের ইতিহাস' এই আমার হাতে এলো ক'লকাতায় বলে এসেছিলাম। খোসাল চন্দ্র রায়ের বই বহুকাল ধরে পড়ার ইচ্ছে—এবার পূর্ণ হবে। চমৎকার কাজ তোমাদের—অনেকেরই উপকার হবে। শুধু গবেষণা নয়—নিজেদের ঠাঁই জানতে পারবো।

[দিদি লিখেছেন, 'চমৎকার কাজ তোমাদের'। ভূমিকায় কমলদা অর্থাৎ কমল চৌধুরি আমার নামটা উল্লেখ করেছেন বলে দিদি হয়তো ভেবেছেন যে বইটির ব্যাপারে আমারও কিছু কৃৎকর্ম আছে। বস্তুত, সেসব কিছুই নয়। কমলদাই যা করার করেছেন, তাঁর সঙ্গে দুচারদিন ফোনে কিছু আলাপ আলোচনা এবং বীজগ্রন্থ আদানপ্রদানেই আমার বাহাদুরি শেষ। সুতরাং গৌরবটা নিতে পারলাম না।]

'ধানসিড়ি' নিয়ে ভেবেছি। 'ধানসিদ্ধি'র (ধানসিদ্ধাও লেখা হয়, ভুল কী?) হয়তো অপভ্রংশ, হয়তো উত্তর পূর্বের নদী। আমার মনে হয় জীবনানন্দ 'সিড়ি' শব্দটির ধ্বনিতে মুগ্ধ ছিলেন—তাই ধানসিড়ি, জলসিড়ি (আমি যদি হতাম—বনলতা সেন)—আর ধান, জল নিয়েই তো আমাদের দেশ—আমাদের বরিশাল।

[কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে, ধানক্ষেতের কাছে। সেদিন টেলিভিশনের চ্যানেল ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ দেখলাম সৌমিত্র আবৃত্তি করছে, 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা ...' বড়ো সুন্দর আবৃত্তি করে ও। আমাদের কলেজ জীবনে ও কবিতা বড়ো ভালবাসতো। আজও দেখছি তা রয়েছে। তবে একটু পরেই সাবিত্রী চ্যাটার্জী তাঁর বিশাল চোখ দুটি নিয়ে (ড্যাব ড্যাব চোখ বলা উচিৎ—চলতি ভাষায়) পুরোনো প্রেমের চাউনি দিয়ে বললেন,

BanglaBook.org

আচ্ছা শঙ্করদা ... অমনি ছন্দপতন হয়ে গেল। অভিনয় শুরু হয়ে গেল।

আবার লম্বা চিঠি হয়ে গেল। শুভেচ্ছা, অভিনন্দন আর স্নেহ জানিয়ে—দিদি।

—দিদির এই চিঠিখানার উত্তরে একখানা সুদীর্ঘ চিঠি তাঁকে দিয়েছিলাম। স্বভাব কুঁড়েমির জন্য তার কোনো কপি রাখিনি। চিঠিখানা সরস ছিল। কিন্তু ঐ সময়টাতে হঠাৎই তার জীবনের চূড়ান্ততম দুর্যোগটি নেমে আসে, ফলে প্রায় বছরকালেরও বেশি আমাদের কোনো যোগাযোগ থাকে না। সময় তার অনিবার্য এবং কল্যাণকর স্নেহস্পর্শে তাঁকে স্বাভাবিকত্বের সমে প্রতিস্থাপিত করলে তিনি নিম্নোক্ত পত্রটি লেখেন। আমিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরটি পাঠাই। একদিকে দিদি সদ্য পতিহারা, অন্যদিকে আমি ভাইকে নিয়ে হারার-লড়াই করছি। মৃত্যু পেড়ে ফেলতে পারছে না আমাদেরকে, এই যা অহংকার। কিন্তু অসহায়তা? তার প্রকোপ এড়াই সাধ্য কী? যাহোক, ইতিমধ্যে এই চিঠি এলো।

স্নেহের মিহির,

বহুদিন যোগাযোগ নেই। আমার নিঃসঙ্গতার কথা কাগজেই দেখেছো গত বছর। বছর ঘুরে এলো। আমি December-এ ফিরেছি। কাজকর্ম করে, নিজেকে ব্যস্ত রেখে দিন কাটাই।

তুমি ঠিক হিসেব করেই গত জুনে চিঠি দিয়েছিলে। যদি বিধাতা তাঁর বিরক্তি না দেখাতেন, তা'হলে জুলাই প্রথমেই এসে যেতাম। তোমার চিঠি আমাকে New York-এ পাঠিয়েছিল—বেশ ক'মাস পরে। বলা বাহুল্য, সাহিত্যিকের চিঠি প'ড়ে খুব ভালো লেগেছিল। নিঃসঙ্গতার মধ্যে ভাইদের প্রীতি-শুভেচ্ছা ছোঁয়া চিঠি পেয়ে ভালো লাগে—তখনও তো তুমি আমার জীবনের তুফানের কথা জানো না। এ'রকম চিঠি লিখো—ভালো লাগবে—দেশের মাটির ছোঁয়া পাবো।

আমি এই গত সপ্তাহে আমার বাবার 'Collected works' ৩ Volume-এ—edit করা শেষ করলাম। Press-এ দিয়ে এসেছি দিল্লিতে। Biography লিখতে গৈলা বরিশালের কথা নতুন করে মনে এল। একটা মস্ত কাজ শেষ হ'লো—সামনে আরো দুটি Project আছে—একটা একটি ইউরোপীয় সংস্থার সঙ্গে, আরেকটি আমার নিজের। সুতরাং কাজ প্রচুর।

তুমি জানো নিশ্চয়ই, আমার বোনপো এবং নিকট বন্ধু, বাসুদেব (দাশগুপ্ত)

BanglaBook.org

আর নেই। সে-ও গত August-এ চলে গিয়েছে। ওর জন্যই তো তোমার সঙ্গে কথা হলো। ওর একটি ভক্ত ছেলে—খুবই ভালো, আমাকে বাংলা recordings পাঠায়—গানের— সেই শুনে বেশ মগ্ন হয়ে যাই। আগে বাসু বই, Cassette, CD পাঠাতো, মাসি, মেসোর জন্য। কলকাতা কবে আসা হবে জানি না—তবে Cassette ও বইর মাধ্যমে যোগাযোগ থাকে। তোমার নতুন বই বার হলো কি?

লম্বা চিঠি হলো। তোমার চিঠির মতো নয় যদিও—অতো সারসম্পূর্ণও নয়। চিঠি দিয়ো—কলেবর যা-ই হোক। দিদিদের একটু বয়স হ'লে, আর একা হয়ে গেলে, ভাইরা আরো কাছের মানুষ হয়ে যায়।

ভালো থেকো

স্নেহ জেনো—সবাই,

দিদি।

এরই মধ্যে ফোনে এক আধবার পারস্পরিক ব্যক্তিক বিধূরতা আর নিঃসঙ্গতা অপনোদনের প্রয়াস। তারপর আমার এই চিঠি। খুব সচেতনভাবেই পরস্পরের দুঃখের পাঁচালির পাঁচকাহন ধামাচাপা দিয়ে, বেশ খানিকটা ছ্যাবলা কেত্তন গাইলাম। আসলে মনের মধ্যে গুঞ্জনরত ছিল একটা গানের চরণ, 'দুখের কথা তোমায় বলিব না দুখ ভুলেছি ও কর পরশে ...।" কিন্তু তাঁকে গান শোনানো একটা ভয়ঙ্কর দুঃসাহস। তাই লিখলাম—

শ্রীচরণেষু দিদি,

আপনার চিঠিটি পাওয়ার আগের দিনই কথা হচ্ছিল আমাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আপনার বিষয়ে। সেদিন ১৯/৭ তারিখ। ২০/৭-এ চিঠিটি পেলাম। আর আজ, অর্থাৎ ২২/৭-এ তো সকালে (ফোনে) আপনার সঙ্গে দিব্য এক সুখ দুঃখের আড্ডা হলো। 'দিব্য' বলছি একারণে যে, আমাদের সব কিছুইতো এখন দিব্য হিসাবেই নিতে হয়, তা কী সুখ, কী অ-সুখ। আসলে বুদ্ধই সঠিক বুঝেছিলেন, 'সব্বম্ দুঃখম্'। প্রতিকারের উপায় যা বলে দিয়েছিলেন, তাঁর চেলারা তা বোঝেননি বলে, তাবড় তাবড় কিতাব লিখে আমাদের দুঃখ এবং শ্রম আরও বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন, এখনও থামার নাম নেই। আসলে তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে একজনও 'বইরশাল্ইয়া' ছিল না তো। থাকলে, তৎক্ষণাৎ ভগবান তথাগতের গতর জ্বালানো ভাষায় একটি উচ্চারণ অযোগ্য 'খামার' দিয়ে বলত, 'ওয়া ফালাইয়া থো। ওয়া যা কও, হেয়াতো বেয়াকই ফাট্কি ঠেহি।'

BanglaBook.org

তথাগত 'সকায় নিরুত্তিয়া'র যথার্থ আদর করলেও, এই চান্দ্রদ্বীপি নিরুক্তিতে কতটা পুলক অনুভব করতেন বলতে পারি না। (তথাগত শিষ্যদের অনুজ্ঞা করেছিলেন, বাছারা, সাধারণ্যে আমার এই সোজাসাপটা কথাগুলো তোমরা দেবভাষার অংবং-এর আংরাখা চাপিয়ে বলতে যেও না। 'সকায় নিরুত্তিয়া পরিপূর্ণিতম্। আপ্না জবানে বাত্ কর।')

আপনার উপর আমার আজ সকালের ফোনকালে একটু গোসাভাব হয়েছিল। সিদ্ধিগঞ্জের মোকামের ভাষা বিস্মরণ হয়েছে বলেছিলেন কী না, তাই। আর ওরকম বলবেন না। বরং নতুন করে চেষ্টা চালিয়ে যান, যাতে মহান মাতৃভাষা পুনরায় জিহ্বায় ভর করে। এই মর্মে একটি গল্প বলছি, শুনুন। ১৯৬৪ সালে আমাদের বাবা, তখনও পর্যন্ত বাড়িতে যেসব ভাইবোনেরা ছিল, তাদের এবং মাকে নিয়ে চিরতরে চলে আসেন। কারণটা ৬৪-র কুখ্যাত দাঙ্গা নয়। আপনাদের গৈলার মতো আমাদের অঞ্চলেও কোনওদিন দাঙ্গা বা গণহত্যা ঘটেনি। কারণটা ছিল রুজিরুটি সংক্রান্ত। বাবা তখন শিক্ষকতা থেকে অবসর নিয়েছেন। সুতরাং অন্নচিন্তা চমৎকারা। খুব যে একটা আহ্লাদে এসেছিলেন এমন নয়। চিরদিনের জন্য আসা!

সবকিছু ছেড়ে কেটে, শূন্যহাতে এদেশে এসে ছেলেদের উপর নির্ভরতা। সব সময়ই তাঁর মেজাজ খিঁচড়ে থাকত। মুখে একটি মাত্র 'খামার' সর্বদা মজুদ, 'হালার পো, হালার গুষ্টি'। কাকে উদ্দেশ্য করে যে বলতেন, বোঝা যেত না। আমরা তাঁর ছেলেরা, একদিন তাঁকে উৎপল দত্তের 'কল্লোল' দেখিয়ে রাতের গাড়িতে ফিরছি। নাটক দেখে বাবা গম্ভীর। কোনও কথা নেই, মন্তব্য নেই। গাড়িতে বেদম ভিড়। এক আপিস-ফেরৎ ভদ্রলোক নানান গেরস্থালি জিনিসপত্র নিয়ে ভিড়ের মধ্যে হিমসিম খাচ্ছিলেন। তার মধ্যে একটি ফুলঝাড়ুও ছিল আর সেটা বারবার বাবার মাথায় ঠেকছিল। একসময় বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, 'পিছাহানও কইলকাতার থিকা কিনতে অয় না কি?'

'আজ্ঞে আপনার কথাটা তো ঠিক বুঝলাম না।' ভদ্রলোক খাস ঘটি। পিছা শব্দটি জানেন না।

—বোজবেন ক্যামনতারা? এসব কথা বোজতে অইলে তো বহুভাষী অইতে অয়। হেয়া যাউক। এহন পিছাহান আমার মাথার উপর দিয়া সরায়েন দেহি।

ভদ্রলোক সত্যিই 'পিছা' শব্দটির মানে জানতেন না। ঘটিরা আজকাল

BanglaBook.org

যেমন বাঙালদের প্রায় সব শব্দ বাধ্য হয়ে বোঝে, তখনও পর্যন্ত বাঙাল আধিপত্যবাদ ততটা গাঢ়ত্ব পায়নি। তাই তিনি পুনঃ ভাষেন, 'পিছা, পিছা মানে?'

—ঐ যে, যেডা আমার মাথায় লাগাইতে আছেন বারবার। হেইডারেই আমরা পিছা কই। পিছাও বোজেন না? এ ছাতার কোন্ দ্যাশে আইলাম!

—তা এটা তো ঝাড়ু, ফুলঝাড়ু!

—ফুলঝাড়ু? তয় আর কী পিডায়েন আমারে হেই ফুলঝাড়ু দিয়া। পিছা আবার ফুল হেঃ!

খানিক চুপচাপ থাকার পর, নিজের মনেই বলে উঠলেন, 'হালার পো, হালার গুষ্টি'। ভদ্রলোক এ বাক্যটিও বুঝলেন না, তবে অনুমান করলেন। বিড়িবিড়ি আওয়াজ কেটে বললেন, 'কী যে সব বলেন, গাল দিলেন না কি তাও বুঝলাম না।' বাবা বললেন, 'গাইল? হ, গাইলই তো দিলাম, তয়, আপনেরে না। নাটক দেইখ্যা আইলাম তো। পোলারা দেহাইয়া আনলে, হেই কথা মনে করইয়া, গাইলডা পিছলাইয়া বাইর অইয়া গেল। আসলে নাটকের মইদ্যে স্বাধীনতার কথা আছেল কিনা। ঐ যেডারে আমরা দ্যাশভাগ কই।

—তা আমরা বুঝতে পারি এরকম ভাষায় একটু বললে তো পারেন।

—না। হেয়া পারি কিন্তু কমু না। ক্যান কমু? ঠ্যাকলাম কীসে? বেয়াক কিছুই তো ফ্যালাইয়া আইছি হেপারে, লগে আনছি খালি ভাষাডুক। হেহডুক লইয়া আর টানাটানি করবেন না। হেউডুক অন্তত আমাগো লইগ্যা থাউক। চেষ্টা করেন, একসময় যাতে বোজতে পারেন। নাইলে কিন্তু পরে পস্তাইবেন।

কালেদিনে পশ্চিমবঙ্গে কথাটা সত্য হতে দেখেছি। বাঙালরা বোধহয় এপারে এখন, ঘটিদের চাইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং শত্তুরের মুখে 'বাসি আহালের ছাই নিক্ষেপ করইয়া' গোটাভাষা ঘটিসুলভ মৃদুতা পরিত্যাগ করে বেশ ঋজু আর দৃঢ় হয়ে উঠেছে। তথাপি নাকি আমার লেখার অনেক শব্দ এখানের অনেকে বুঝতে পারেন না। তা আমিও ঠিক করেছি ফুটনোট দেব না। পাঠকেরা একটু পরিশ্রমী হোন।

প্রসঙ্গত, ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'ঝাড়ু' শব্দটির তৎসম গোত্র পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। কিন্তু 'পিছা' শব্দটি যে সংস্কৃত 'পিচ্ছিকা' শব্দের বাঙাল/বরিশালি-বাঙাল পরিণতি, এ বিষয়ে ভাষা-শব্দতত্ত্ববিদেরা একমত হতে বাধ্য। বিশ্বাস না

BanglaBook.org

হয় জয়ন্ত ভট্টের 'আগমডম্বর' নাটকটি পশ্য। সেখানে সংলাপে একটি সুন্দর ব্যবহার পাবেন শব্দটির। 'কলকেতা' বা 'পশ্চিমবঙ্গীয়' বিভিন্ন জিলার ভাষা, শব্দ ইত্যাদি নিয়ে মশকরা যথার্থভাবে করিনি, যতটা আমাদের বাঙাল, বিশেষত, বরিশালি বাঙাল শব্দ নিয়ে এপারে করা হয়েছে। আমার ঘাট হয়েছে এই যে, বড়ো দেরিতে আমার টনক নড়েছে। নচেৎ, হুগলির গুগলিতে এমন ছক্কা-চৌকো মারতাম যে 'একেনের গিইলুম, কইল্লুম-ওয়ালা ড্যাগরা, অলপ্পেয়ে মিনসেদের সোজা গঙ্গা, সরস্বতী, কুন্তির তিরপুনির ঘাট পাইয়ে' দিতাম। ব্যাটারা বাক্‌লাই-বাঙালদের বাক্যবিক্রম বিলক্ষণ বুঝত। অনেক দেরি করে 'ফেলিচি দিদি সামনের জন্মে, এমনটি আর হবেনিকো।' দেখলেন হুগলির ভাষাটি কেমন? তবে মনের কথাটি গোপনে কই, বাংলার সব স্থানের বাগ্‌ধারাই আমার প্রাণের বস্তু।

আসলে এতসব কথা যে বক্‌বকাচ্ছি, তার কারণ কিন্তু ঐ আপনার উপরে যে গোসাটুকু কাল টেলিফোনিকালে (ক্যালি) জেগেছিল, তারই বাষ্পবিমোচন। কাল রাতে তাই আপনার চিঠিখানা আবার পড়লাম, 'ঘরের জোনকে' পড়ে শোনালাম এবং তারপর যখন বুঝলাম যে সকালের কথাটা আপনার 'ফাট্‌কি কথা', তখন মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হল। তবু যে বাষ্পটা জমে-ছিল, তার নির্গমন তো চাই। এজন্য চিঠির গতরটা অলস 'নাইওরি মাথারিগো ল্যাহান' বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে পাক, সেখানে তো স্নেহের প্রশ্রয় লিখিতভাবেই পেয়ে গেছি। তবে, সিদ্ধিগঞ্জের ভাষা আপনি ভুলে গেছেন, একথা মানতে পারলাম না। তার প্রমাণ আপনার প্রথম পত্র, আর সেকারণে কী খুশিই না আমি! আহা, 'বিনে' বইশ্‌শালইয়া 'ভাষা' মেডে কী 'তৃষা'?

আমার 'ছ্যাব্‌লা' চিঠিটা আপনার বিপর্যয়ের সময়ে যে পৌঁছবে সে-কথা কি ভাবতে পেরেছিলাম? যুক্তি দিয়ে ঈশ্বর, ভাগ্য ইত্যাদি আমিও মানি না, কিন্তু যুক্তি বুদ্ধিরও যে সীমাবদ্ধতা আছে, তা তো কে যেন কানে-ধরে স্বীকার করিয়ে নেয়। ঘটা করে প্রার্থনা, উপাসনা করি না ঠিকই, তবে কারণে-অকারণে প্রার্থনা তো স্বতঃউদ্‌গীথ হয়ই, তা স্বীকার না করি যদি মিথ্যে বলব। ঘুম ভাঙলেই বুদ্ধবাণীর স্বতোৎসারণ তো ঘটেই, সব্বে লোকা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্‌ঝা হোন্তু, সুখি অত্তানং পরিহরন্তু। কিন্তু কচুপোড়া, কিছুইতো হয় না। আমার সব চাইতে দুর্ভাগ্য এই যে, যাঁদের সঙ্গে অনেক অনেক আগে আমার

BanglaBook.org

পরিচয় হওয়া উচিত ছিল, তাঁদের সঙ্গ পেলাম, এমন কী স্নেহ লাভ করলাম এমন একটা সময়ে যখন তাঁদের এবং আমারও ছায়া পূর্বদিকে দ্রুত প্রলম্বমান। এর জন্যেও দেশভাগকেই আমার দায়ী মনে হয়। বিষাদবৃক্ষ পড়ে নিশ্চয় জেনেছেন আমার শিক্ষাক্ষেত্রে বৃহস্পতির স্থানে শনি, রাহু এবং কেতুর কী বিপুল আনাগোনা। ফলে, 'কিছুই তো হল না।' আকাঙ্ক্ষা ছিল আকাশছোঁয়া, কিন্তু দরজার সামনেই উত্তাল-তরঙ্গ-প্রচেতঃ আকাশের চাইতেও উঁচু প্রাচীর তুলে সগর্জনে সারাক্ষণ ফুঁসেছে। তারপর একসময় যখন সে দূরে সরে গেছে, দেখি, অসহায় আক্রোশে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে আকাঙ্ক্ষা পাখিটা মরে পড়ে আছে ঘরের মধ্যেই। বাইরের আকাশে উড়বার সুযোগটাই সে পেল না! বড়ো আফশোষ হয়। কত জায়গায় যে যাওয়ার ছিল, কত মানুষের সঙ্গে যে কত কথা এবং কাজ ছিল, কত কিছু যে শেখার ছিল, তার কিছুই তো হল না। যা না হলেও চলত, শুধু তাই হল। মা বলতেন, চপালের চাড়া অইল।

আপনি আমার চিঠিটাকে সাহিত্যিকের চিঠি বলেছেন বলে আমার ভারি মজা লেগেছে। সত্যি কথা বলতে কী এরকম কথা শুনলে আমার ভীষণ লজ্জা বোধ হয়। বিশেষ করে আনন্দবাজারী ব্যাপারটার পর থেকে আমার শুধুই মনে হয়েছে যে, এটা খুবই একটা বাড়াবাড়ি, বেমানান ব্যাপার হয়ে গেছে। কেমন যেন একটা অপরাধী-অপরাধী ভাব মনে। কত ভালো ভালো লেখক কত চমৎকার সব লিখছেন, তার মধ্যে আমি? বইটা তো একটি হতভাগ্য মানুষের জীবনের ছাইভস্মের দলিল। তাকে আপনি বা আপনার মতো মানুষেরাও সাহিত্য বলবেন? আপনি আমার দিদি, স্নেহভরে তাকে অনেক কিছু বলতে পারেন। কিন্তু অন্য যাঁরা? বিশ্বাস করুন আমি এরকম বিনয় করছি না। বরিশাল সন্তানদের আর যা কিছুই থাকুন না কেন, বিনয় নামক ব্যাপারটা যে নেই, সেটা মানবেন তো!

(২৫/৭/২০০৫)

আপনার ৮/৪/২০০৫ এর চিঠিটা যেদিন এল, সেদিন বাড়িতে মোচ্ছব। প্রায় সব ভাইবোনরা এই ভদ্রেশ্বরের বাড়িতে, উপলক্ষ—বুঝতেই পারছেন আনন্দ পুরস্কারের প্রাপককে পারিবারিক সংবর্ধনা। আমাদের সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা আয়োজিত এই উষ্ণ সম্মিলনীতে অনেক ছোটোখাটো মান-অভিমান, ভুল বোঝাবুঝির ঝুলকালি, যা অনেক ভালোবাসায় নিমগ্ন, অনেক ভাইবোন-সমন্বিত

BanglaBook.org

একটা বড়ো পরিবারে প্রায় নিয়তি-নির্দিষ্ট থাকেই, তা উবে গিয়েছিল। সেই আসরে আপনার চিঠিখানা বড়ো সুখপাঠ্য হয়েছিল সবার কাছে। আমার কাছে হয়েছিল এক প্রকাণ্ড শ্লাঘার বিষয়। দেশের বাড়ির ছবিগুলো আমার মগজের ক্যানভাসে সবসময়ই টাটকা থাকে বলে, চিঠির ছবিগুলো বড়ো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আর তার সঙ্গে যে অন্তরঙ্গ ভাটিয়ালি সুরটি স্বাভাবিক ছন্দে ও লয়ে আপনি নিহিত করে দিয়েছিলেন, তার সুষমা তো কাব্যরসাশ্রয়ী। আপনি হয়তো আমার এই বক্তব্যটিকে ভাবালুতা বলে উড়িয়ে দিতে চাইবেন, কিন্তু সেদিন, আমাদের বড়ো-ছোটো জনেদের, সবার আলোচনায় বড়দির ছবি, গৈলার বাড়ির খণ্ডহরের ছবি, পুখইর, দিঘি ইত্যাদি, আহা! সে তো 'আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে, কী জানি পরাণ কী যে চায়'-এর সেই না-পাওয়া বস্তুটিই। যদিও জানি গ্রামীণ জগতেও এর কিছুই আজ আর কোথাও বাস্তবে নেই। না ওপারে না এপারে। তবু সেসবের জন্য 'কেন প্রাণ কাঁদেরে?' কতকাল একটা বিস্তীর্ণ ঘাস ভরা গোপাট দেখিনি, অথবা একটা অধর্ষিতা তৃণভূমি। ঘাস, কিম্বা তৃণ নিয়ে কেউ আজকাল আর কিছু বলে না। তার যে কত বার্তা আছে আমার জীবনে।

দিদি, সাহিত্য টাহিত্য বুঝি না। সাহিত্য করার জন্য বুড়ো বয়সে যে কলম রগড়াচ্ছি এমন আদৌ নয়। 'ট্রম্যা'র দলিল রাখার একটা তাগিদ আছে, তাই লেখার চেষ্টা করছি। স্বাধীনতার নামে আমাদের উপর ঘোর অন্যায় এবং অবিচার করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদ শিক্ষা দিতে গিয়ে আমাদের সাম্প্রদায়িকতাবাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, এখনও হচ্ছে। পাশ্চাত্য জাতি-রাষ্ট্রের আদলে যে রাষ্ট্র তৈরি করা হয়েছে, তা আমাদের পরম্পরা নয়। আমাদের পরম্পরা 'দেশ' নামক একটা বোধের পরম্পরা। সেখানে নাগরিকেরা বাস করেন না, দেশের মানুষেরা থাকে। সেখানে সীমান্ত বলে কিছু থাকে না, সঙ্গীনধারীরা থাকে না, আলাদা পতাকার মিথ্যে দেমাগ থাকে না, শুধু হৃদয়ের বিস্তৃতি থাকে। আমাকে, আমাদেরকে সেই দেশ থেকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে মিথ্যে রাষ্ট্রগৌরবের স্বার্থপর সীমাবদ্ধতায়। এখন আমার না আছে রাষ্ট্র, না আছে দেশ। আমি কখনও উদ্বাস্তু, কখনও অনুপ্রবেশকারী। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে কখনও প্রকৃত ভোটার, কখনও মিথ্যে ভোটার। এটাই এখন আমার নিয়তি। আমার লেখা এই ট্রম্যারই দলিলায়ন করতে চায়, তাতে তার সাহিত্যগুণ থাকুক বা না থাকুক।

এতক্ষণে আপনি নিশ্চয় বিরক্ত হয়ে পড়েছেন। তা হোন গে। আমি

BanglaBook.org

আঠারো আনা খাঁটি ভাটিপুত্র, বকবকানিতে আমার জন্মগত অধিকার। কিন্তু এবারে থামব। এই চিঠির সঙ্গে বইখানা পাঠালাম। প্রাপ্তি সংবাদ জানাবেন এবং পড়ার পর সম্ভব হলে, একটা লিখিত প্রতিক্রিয়াও। ভালোয় মন্দে আছি। আপনি ভালো থাকুন।

প্রণামসহ

মিহির

পুঃ-বরোদা/আহমেদাবাদ ভ্রমণের ইচ্ছে আছে যত শিগগির পারি। যাবার আগে বিস্তারিত জেনে নেব, কোথায় কী দেখা যাবে, কোথায় সস্তায় হোটেল পাব বা ওখান থেকে আর কোথায় যাব ইত্যাদি। তার অবশ্য এখনও দেরি আছে। এতদিনে চিঠি ও বইখানা পাঠাবার ফুরসৎ হল। এর প্রধান কারণ আলস্য বটে, তবে অন্য কারণও আছে। আশেপাশে যতগুলো শরীর—সবই ব্যাধিমন্দির। কিন্তু সেকথা থাক। ভালো থাকুন। ইতি ৫/৮/২০০৫।

।। সাত ।।

২০০৫ সালটা আমার লেখক জীবনের সৌভাগ্যের শীর্ষতম বছর, যার চূড়ান্ত বিন্দুটি অবশ্যই আনন্দ পুরস্কার লাভ। পুরস্কার ছাড়াও এই বছরেই আমি লাভ করেছি কিছু দুর্লভ মানুষের বন্ধুত্ব, সাহচর্য এবং স্নেহ। সেসব যে আনন্দ পুরস্কারের 'ন্যাজ' ধরেই এসেছে এমন নয়। বস্তুত, আমার 'বিষাদবৃক্ষ' প্রকাশ হবার পর থেকেই (২০০৩) আমি অসংখ্য নতুন, সাধারণ, অসাধারণ মানুষের চিঠি, টেলিফোন, এস. এম. এস ইত্যাদি পেতে শুরু করেছিলাম এবং তার স্রোত অদ্যাবধি বর্তমান। বহু সভা সমিতিতে বড়ো চেয়ারখানা, বইমেলা বা সাংস্কৃতিক মেলার উদ্বোধন, কলেজ বা বিদ্যায়তনের ছোটোবড়ো সাংস্কৃতিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করার আমন্ত্রণ এবং নানাবিধ সম্মান তদবধি আমার লাভ হয়েছে, হয়ে চলেছে। সাংস্কৃতিক জগতে এত কম কাজ করে এত ব্যাপক খ্যাতি এবং সম্মান পাওয়া সত্যিই দুর্লভ। আমারও জীবনটা অতি শৈশবকাল থেকে ছিল একান্তই দীন এবং অকিঞ্চন। তার হয়তো কারণও ছিল যা বিষাদবৃক্ষের পাতায় বিভিন্ন পঙক্তিতে পাওয়া যাবে। সেই আমি কেন বা কীসের সুবাদে এতো সম্মান, যশ বা ভালোবাসা লাভের অধিকারী হব তার সম্যক কোনো কারণ বুঝে উঠতে পারছিলাম না বা এখনো পারছি না। ব্যাপারটা এখনো

BanglaBook.org

আমার কাছে সহজ হয়ে ওঠেনি। সদাই মনে হয় যে আমি যেন ফাঁকি দিয়ে বা অন্যকে বঞ্চনা করে এই ঐশ্বর্য ভোগ করছি। বাস্তবিক আমি এত ভালবাসার যোগ্য নই। অবস্থাটা কাউকে বললে ভাবে বিনয় করছি।

কিন্তু এর বেশিরভাগ আমন্ত্রণেই আমি যোগ দিতে পারিনি, অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি অনেক অনুষ্ঠানেই। কারণ এই দু-হাজার পাঁচ সালই আমার আর আমার ব্যাপক পরিবারের জন্য নিয়ে এসেছিল একটা মর্মান্তিক অভিশাপ এবং তা এসেছিল আনন্দ পুরস্কারের কয়েকটা মাত্র দিনের মধ্যেই। সেই দুর্ভাগ্যের আনুপূর্ব বিবরণ দিতে হলে আমাকে আরেকখানি 'বিষাদবৃক্ষ' লিখতে হয়। কিন্তু তা আমার বা আমার পাঠকদের পক্ষে আদৌ রোচক হবে না। আমার পাঠকেরা জানেন, জীবনের কাছ থেকে সুস্থির এবং স্বস্তিকর সময় আমি খুব কমই পেয়েছি। বেশির ভাগ মানুষেরই বোধহয় সেটাই বিধিলিপি। মানুষের জীবন স্বাভাবিক এবং সাধারণ ভাবেই সুখদুঃখের মিশেলে কাটে। কিন্তু তার মধ্যেই, কারো কারো জীবনে, ভাগ্যবশতই বলতে হবে, একটা smoothness থাকে। সেটা আমার ভাগ্যে আদৌ ঘটেনি। যাহোক, তবু জীবনটার আনাচ কানাচ থেকে, টুকরো টুকরো ভালবাসা, স্নেহ-মমতা কুড়িয়ে পথ চলছিলাম। কিন্তু যখন এইসব নিয়ে থুয়ে একটা জায়গায় এসে পরিপার্শ্বটা উজ্জ্বল হল, অর্থাৎ সাধারণ্যে একটা পরিচিতির স্তরে পৌঁছলাম, আমাদের সর্বকনিষ্ঠ ভাইটির ফুসফুসের ক্যানসার ধরা পড়ল। আগেই আভাস দিয়েছি, এ বিষয়ে আমি বিশদ হব না, তবু এইটুকু বলি, আমাদের এই প্রিয়তম ভাইটিকে, আমরা প্রায় 'যমে মানুষে টানাটানি করে', তিন বছর অমানুষিক লড়াই করে, ২০০৮-এর ৫ই মার্চ তারিখে বিদায় দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করেছিল সে।

অলকনন্দার এই প্রথম চিঠিটি আসার কয়েক দিনের মধ্যেই ওর রোগ পাকাপাকিভাবে নির্ণীত হয়েছিল, যদিও তার সূত্রপাত, অর্থাৎ শারীরিক কিছু কিছু জটিলতা, ২০০৫-এর মার্চ-এপ্রিল থেকেই শুরু হয়েছিল।

অলকনন্দার এই চিঠিটি পাই যেদিন ওবেরয় গ্র্যান্ডের ব্যাঙ্কোয়েট হল্-এ আমার সংবর্ধনা হয় সেদিন। তার আগের দিন আমি সস্ত্রীক আনন্দবাজারের অতিথি হিসাবে নির্ধারিত অতিথিশালায় চলে এসেছিলাম বলে চিঠিখানি বাড়িতে ভাই রিসিভ করেছিল পরের দিন। সেদিন আমার পরিবারের অধিকাংশ সদস্য, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ নির্বিশেষে, সংবর্ধনা উৎসবে হাজির হয়েছিল। সেখানেই ভাই চিঠিটি আমার হাতে দেয়। বলা বাহুল্য, চিঠিটির জন্য আমি নিজেকে ভীষণ

BanglaBook.org

সম্মানিত বোধ করি। এত আবেগ-বিহ্বল এবং আন্তরিক একখানা চিঠি ওইরকম একজন মহিলার কাছ থেকে পেলে কে না উজ্জীবিত বোধ করে? চিঠিটির একটি উত্তরও আমি দিয়েছিলাম। কিন্তু তার আগেই তিনি তাঁর দুমাসের জন্য বিদেশ সফরে যান। তবে এর মধ্যেই একদিন টেলিফোনে যোগাযোগ করে, বৈদ্য-জাতকীয় অভ্যাসটা একেবারে কাটান দিতে না পেরে, আমরা উভয়েই আবিষ্কার করি আমাদের পারিবারিক আত্মীয়তা। অলকনন্দা সোৎসাহে জানালেন যে 'প্রীতিভাজনেষু'টা পর্যন্ত পত্রে যথাযথ ছিল, কিন্তু নামের সঙ্গে একটা বাবু যোগ করাটা নিতান্তই অযোগ্য পাত্রে হয়েছে। তিনি বয়সে তো আমার চাইতে বড়োই, সম্পর্কেও দিদি। কারণ তাঁর বাবা, প্রয়াত অমিয় দাশগুপ্তমশাই আমার পিসেমশাই-এর ছোটোভাই। আমি বরিশালি প্রবচনে বলতে চাইলাম, 'মামার শালা পিসার ভাই, তারগো লগে কোনো সম্পর্ক নাই'। কিন্তু তাঁর উচ্ছ্বাসের তোড়ে তা আর টিকল না। আর হবেই বা না কেন? যিনি স্যার পার্থ দাশগুপ্তর সহেদরা 'দিদিত্বে' বহাল তবিয়ত, আমার মতো নেংটি ইঁদুরের দিদি হতে তাঁর এমন কী 'ল্যাডা'? পারিবারিক এবং ব্যক্তিক যে বিদ্বৎক্ষেত্রটিতে তিনি বিরাজ করেন, সেখানে তো তাঁর 'ছোটোগল্প', থুক্কুরি, বর I.G-রই উচিত তাঁকে 'বদ্দি'(বড়দি) বলে সম্মান জানানো। তাঁর সঙ্গে আমার রসের সম্পর্ক হলেও, চোখে চোখে বা কানে কানে (মানে ফোনে ফোনে) দেখা হয়নি বলে, অনুরোধটা জানাতে পারিনি। যাহোক, ওই এক ধাক্কায় আমাদের সম্পর্ক দিদি-ভাইটির এবং তদবধি, দিদিরা ভাইয়েদের নিয়ে যা যা ভোদেখলেপনা করেন, তিনি তা করে যাচ্ছেন। তার কিছু নমুনা উদ্ধৃত চিঠিগুলিতেও নেহাৎ কম নেই। কিন্তু চিঠিতো এডিট করতে পারি না।

চিঠিটি নিয়ে সবচাইতে আড়ম্বর করল ভাইটি। অন্য কারণেও বোধহয় তার মনে হয়েছিল, দাদার কৃতিত্বটা সপরিবারে উদ্‌যাপন করাটা আবশ্যক, তাই সে 'গুষ্টির' সবাইকে এক ছাতার নীচে জড়ো করে একটা পেল্লায় মোচ্ছব করল। পারিবারিক এই সম্মেলনে সে চিঠি খানা খুব আবেগ দিয়ে পাঠ করল। তার কবিতা আবৃত্তি করার সখ এবং অভ্যাস ছিল। গদ্যপাঠও, বিশেষ বিশেষ আড্ডার আসরে আমরা তাকে দিয়ে করাতাম। সেদিন এই চমৎকার পত্রটি পড়া শেষ হলে, আমাদের ভাইবোনদের (আমরা অনেকজন ছিলাম, এখন এক-এক করে বিদায় নিচ্ছি)। সবার চোখেই ধারা নেমেছিল। সেই ধারা আনন্দ এবং বিষাদের, যদিও ভাই-এর ব্যাধিজনিত বিষাদটা তখনো অনাবিষ্কৃত।

এরপর থেকেই ফোন, চিঠি, চিঠি আর ফোন সমানে চলছে। আমার

BanglaBook.org

চিঠিখানার প্রাপ্তি সংবাদ এবং উত্তর পেতে দেরি হচ্ছিল। হঠাৎ একদিন কাগজে দেখলাম I. G. নেই। তাঁর অবিচুয়ারি বেরিয়েছে খবরের কাগজে। এইসব ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারস্থ ভাগ্যহীন-ভাগ্যহীনাদের ফোন করা সঠিক বলে আমি মনে করি না। প্রিয়জনের শোক প্রশমিত করার ক্ষমতা মানুষের নেই, সেটার একমাত্র অধিকর্তা সময়। তার উপরেই ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া উচিত। তবে আমরা সবাই, ঘটনাটায় ভীষণ মর্মাহত হয়েছিলাম। ঘটনাটা ঘটেছিল নিউইয়র্কে। সুতরাং ফোনটোনের মধ্যে না গিয়ে কয়েকদিন বাদে সমবেদনা জানিয়ে একটা চিঠি লিখলাম বরোদার ঠিকানাতেই। সেই চিঠি এবং প্রথম চিঠিটার উত্তর একসঙ্গেই এল, এর প্রায় মাস ছয়েক পরে। প্রথম চিঠিখানার উত্তরে লেখা আমার চিঠিখানার কপি না থাকায় এখানে দিতে পারছি না। তাঁর চিঠিটি দীর্ঘ, যেমন সাধারণত তিনি লেখেন। I.G. আশি বছর পুরো করেছিলেন। সাধারণভাবে এই বয়সটাকে পরিণত বয়স বলা হয়। আমি জানি না, মৃত্যুর জন্য পরিণত বয়সটা কী! কেউই কী জানেন? বলতে পারব না। যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাঁর ধারণা জানার উপায় নেই, আর যাঁরা প্রিয়জন, তাঁদের কাছে, তাঁদের ছেড়ে যাওয়া মানুষটিকে কোনো বয়সেই কি মৃত্যুর জন্য 'পরিণত' বলে মনে হওয়া সম্ভব? এটা তো জীবনের আর পাঁচটা ঘটনা বা event-এর মত একটা event নয়, এটা যে একটা পূর্ণচ্ছেদ, end। I.G. মানুষটিকে আমরা শুধু নামেই চিনেছিলাম, দেখিনি কখনো। তিনি মহাবিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে অনেক উঁচু পদে তিনি সততা এবং সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। সবচাইতে বড়ো কথা, তিনি নাকি বয়স এবং গোত্র নির্বিশেষে অসামান্য বন্ধুবৎসল ছিলেন। সেই বন্ধুবৎসলতার প্রসাদ আমার অনেক পরিচিতের ভাগ্যেই জুটেছে। আমিই বঞ্চিত হলাম। কিন্তু মানুষের স্বভাব এই যে তারা পরিচিত না থাকলে স্বজন-বিয়োগের শোকও অনুভব করে না। তবে এক্ষেত্রে এত কথা বলছি কেন? অবশ্যই তাঁর অভাব আমাদের হয়তো সেভাবে আসেনি। কিন্তু আমাদের এই নতুন পরিচিত হওয়া পুরোনো দিদির কথা ভেবেই আমাদের মন খারাপ হয়েছিল। এভাবেই তো আমরা আত্মীয়তা, সম্পর্ক দৃঢ় করি।

এভাবেই ২০০৫ থেকে আজ ২০০৯, দিদি দিনে দিনে আমাদের প্রকৃত আত্মজন হয়ে উঠেছেন। মাঝে মাঝে তাঁর পুরোনো 'বাউকুইণ্ঠা বাতাসের' রোগটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বুঝতে পারি, যখন দেখি টেলিফোনের ওপার থেকে সুরেলা মিষ্টি গলায় হ্যালোর পরিবর্তে, বাড়ির গুজরাতি কাজের মাসির

BanglaBook.org

ভীষণ কর্কশ গলায় 'হাঁআআআ?'— ভেসে আসে। তার সান্ধ্যবচনের মধ্য থেকে দুএকটি শব্দ ধরে আন্দাজ করি 'ছে' না 'নেইছে'। কাছেপিঠে কোথাও গেলে ছে, দেশের বাইরে গেলে নেইছে। যখন 'নেইছে' তখন বুঝি নিঃসঙ্গতার ভার এড়ানোর জন্য 'নিউইয়র্ক' পাড়ি দিয়েছেন, একমাত্র সন্তান ঋষিপর্ণার কাছে। অবশ্য সব মায়েদের মতোই তাঁরও কন্যার ব্যাপারে একবস্তা অভিমান আর অনুযোগ। কী? না মেয়েটা থিতু হল না, কথা শোনে না, বাউন্ডুলে স্বভাব। কিন্তু সে বেটির বা দোষ কী? যেমন মা তেমন ছা'। আসল কথা, মেয়েকে ছেড়েও বেশিদিন থাকতে পারেন না। আবার তার কাছে গিয়েও যে বেশিদিন থাকবেন, মন টেকে না। কারণ, ওখানে নিজের করণীয় তো কিছু নেই। যা আছে এখানে। কী কাজ? Splitting hairs of blanket—কম্বলের লোম বাছা। কম্বলটি অর্থশাস্ত্রীয় তন্তুর। কথাটা তাঁরই মুখে শোনা, তাঁর বাবার বিষয়ে তাঁরই মায়ের অনবদ্য উক্তি। আমি মেয়ের বিষয়ে quote করলাম। তবে এইসব নিয়ে আছেন বেশ।

আর আছে গান এবং ওরকম কণ্ঠ আর শিক্ষা আর রকমারি গানের সংগ্রহ যাঁর আছে, তাঁর তো সাম্রাজ্য আছে। কিন্তু হায়, রবি ঠাকুর বলেছেন, 'একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুইজনে। একজন গাবে ছাড়ি গলা, আরেকজন গাবে প্রাণে।' তাঁর গান তো শুধু গান নয় তাতো অমিয় সঙ্গিত লহরী। যিনি প্রাণে গাইতেন, তিনি তো এখন 'গানের ওপারে'। তবু 'অলকনন্দা' পার্বত্য স্রোতস্বিনী, উপল সংঘাত যত বেশি, কলস্বনও ততই।

মাঝে মাঝেই জানাচ্ছিলেন, কলকাতা আসলে সামনা-সামনি সাক্ষাৎ হবে। ভাইটি আমার তখন অনেকটাই কাতর। রোগ ভেতরে ভেতরে তাকে পেড়ে ফেলতে চাইছে, আমাদের ইচ্ছাশক্তির সাথে পেরে উঠছে না। দিদি প্রায়ই ফোনে খোঁজ নেন। ভাই-এর স্ত্রী (ভারতি), তাদের একমাত্র পুত্র স্যমন্তক—সবার খবর, আমার স্ত্রী-সন্তানদেরও। দাদাদের অর্থাৎ পরিবারের তাবৎ জনেদের খবর নিয়মিত নেন। স্যমন্তকের নাম রাখেন নতুন করে 'আনন্দ'। সত্যিই, আমাদের নিরানন্দ আলয়ে সে-ই আনন্দ বটে। মেয়েরা তো সব শ্বশুরবাড়িতে। যতই বলি বা চেষ্টা করি ভাইএর ব্যাপারটা এসেই যাচ্ছে। নাহলে দিদিকে ঠিক উপস্থিত করতে পারবই না। ব্যাপারটা এই চিঠিটি পড়লে পাঠক বুঝবেন। তিনি আমাদের ব্যাপারে কতোটা concerned।

বরোদা

BanglaBook.org

১৭ই এপ্রিল ২০০৬

স্নেহের মিহির,

তোমরা সবাই আমার শুভ নববর্ষের স্নেহ ভালবাসা জেনো। আশাকরি নতুন বছরে সব সুখবরই পাবো। টুনুকে, তিতির-অনির্বাণকে[১] আমার অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ো।

মন্টুর জন্য বড়ো চিন্তা হয়। দেখতে দেখতে আবার একটা chemoর সময় এসে যাচ্ছে। ছোটো ভাই—এমন স্বভাব যে দেখলে না ভালোবেসে পারা যায় না। প্রার্থনা করি ও ভালো হয়ে যাক সবার মুখেই হাসি ফুটুক। ভারতী, মুনকে আমার স্নেহ জানিয়ো। মন্টুকে তো বটেই।

ভেবেছিলাম নতুন বছরে আগের বছরের মতো ফোন ক'রবে। চিঠি লেখার তো সময় হয় না। হয়তো ব্যস্ত আছো। বা দিদিকে আর অতোটা মনে পড়ছে না! অভিজিৎ কেমন আছে? আমি ওর চিন্তা, পড়াশুনার (জ্ঞানই বলতে হয়) পরিধি দেখে অবাক হয়ে যাই। এতো গভীরে, এত details-এ কত শত বছরের কথা ও লেখে। অনুভূতি, persistence দুটোই প্রচুর।

আমি নানা ঝামেলা নিয়ে আছি। একই কথা বারবার মনে হয়—'বেলা বৃথা যায় রে'। খুব একটা ভালো নেই তা' নিজের কাছে অন্তত স্বীকার করতেই হবে একদিন না একদিন।

তপনদাকে চিঠি লেখা হয়নি। বাংলানামা ('বাঙালনামা') সমাপ্ত হ'য়ে এল বোধহয়—নাকি ভুল দেখছি? সমর সেন আর বুদ্ধদেবের ওপর যে বই তাতে সমর সেনের অনেক চিঠি আছে—আমি প'ড়ে খুব খুসি—এতো বানান ভুল! নিজের বানান নিয়ে আর সঙ্কোচ করব না।

৪৩° গরমে—বাগানেও যেতে পারি না। AC থাকলেও, না থাকলেও দমবন্ধ হয়। অরুণ সরকারের অনুকরণে লিখতে হয়, "লিখলুম ভাই মিহিরকে, বহুদিন দেখিনি আকাশকে"। মিললো না ঠিকই তবে আমার তো কোনো 'বিচিত্রা দাশ' নেই! চতুরঙ্গে 'খেলাধুলা'র সমালোচনা বার হ'চ্ছে। তুমি অনুষ্টুপে লিখবে একটা?

স্নেহ জানিয়ে—

দিদি

একটা মজারগল্প শোনো। সুখরঞ্জনদা নববর্ষে ফোন করেছিলেন। কথায় কথায় বললেন 'চতুরঙ্গে' ওঁর আত্মকথায় অসন্তুষ্ট হ'য়ে এক বুদ্ধিজীবী (আমি তাঁকে চিনি) একটি চিঠি লিখেছেন—কিন্তু চিঠিটি 'পরিচয়ে'র পাতায়। 'পরিচয়'

BanglaBook.org

এটা বার করলো কি করে? চিঠি না হয়ে সমালোচনা হলেও তো চতুরঙ্গেই হওয়া উচিত। আমি তো বাইরের লোক—অর্থ বা ethics বুঝতে পারলাম না। দুনিয়াটা পাল্টে গিয়েছে।

১. টুনু আমার স্ত্রী, তিতির-অনির্বাণ : আমার ছোটো কন্যা আর জামাতা।

২. সুখরঞ্জনদা—প্রখ্যাত সাংবাদিক।

বরোদা, ১২ই জুন ২০০৬

স্নেহের মিহির,

তোমাদের সঙ্গে কথা ব'লে সেদিন খুব ভালো লাগলো। আমার মায়ের ভাষায়, 'মনে হ'লো, আমারও কেউ আছে'।

কলকাতা থেকে ফিরে প্রথমে তো অসুস্থ হলাম—প্রায় মার্চের শেষ অবধি। তারপর থেকে সময়টা ভালো যাচ্ছিল না—নানা দুশ্চিন্তায় দিন কাটছিলো। শারীরিক, মানসিক অনেক কিছু। নির্জীব হয়ে যাচ্ছিলাম। কন্যা এত দূরে যে একটা চিন্তা লেগেই থাকে। যাক—এখন শারীরিক ব্যাপারটা সব ঠিক আছে—একা হওয়াতে হয়তো খুব ভয় বেড়ে গিয়েছে। কিংবা এটা হয়তো বয়সের ধর্ম। তোমাদের সঙ্গে দুটি সোনালি দিন খুব মনে পড়ে।

আমার এই লেখাটা তোমাকে অনেকদিন ধরে পাঠাবো ভাবছি—এতদিনে হলো। আর কোনোদিন বাড়ি যাবো না, গৈলার সবুজ দেখবো না—ওখানকার মানুষগুলোর আন্তরিকতার ছোঁয়া কাছ থেকে পাবো না। খাল, বিল, দিঘি—কিছুই দেখবো না ভেবে কষ্ট পাই। আবার ভাবি একবার তো গিয়েছিলাম। স্বপ্নের মতো মনে হয়।

আমি এখন সবভাবেই ভালো আছি, চিন্তা করো না। একমাসের ওপর হলো একটা লেখা শেষ করে পাঠিয়ে দিয়েছি। নতুন কিছু শুরু করতে পারছি না—কী যে অসহ্য গরম।

মন্টু, ভারতী, মুনকে স্নেহ-ভালোবাসা। তুমি, ভ্রাতৃজায়া, তিতির, অনির্বাণ সবাই স্নেহ ভালোবাসা নিয়ো। আনন্দর বিয়ে কবে?

তোমাদের ভাইদের কলকাতার প্রথম জীবন সম্বন্ধে পড়ে থ' হয়ে যাই। তাও ভেঙে পড়ো নি। তার ওপর তোমার ও অভিজিৎ এর এতো বিচার-বুদ্ধি নিয়ে লেখা। অবশতার কোনোই আভাস নেই। অবাক লাগে। অভিজিৎকে বলো আমরা আবার 'মগের মুলুকে' আছি। দেশের যা অবস্থা! ভালো থেকো।

BanglaBook.org

ভাইবোনদের সবাইকে ভালোবাসা। ইতি—

দিদি।

পূ:- হঠাৎ ইলিশ মাছ, মাংস, আর কত কিছু মনে হল—বড়দি শুধু পড়ানোতে বড়দি নয়—রান্নাতেও। তুমি তো জানো হাতের কাছে যে কাগজ আছে তাইতেই আমি প্রথম লিখি। এটা বড়োই বাজে—অথচ লীলার। Taste জিনিসটা পৌঁছায় নেই।

১. টীকা দিতেই হলো। 'বড়দি' বলতে আমার স্ত্রী। যেহেতু ইস্কুলে এবং এলাকায় 'বড়দি' বলে পরিচিত, আমিও নিজ পরিচয় প্রকাশ মানসে তাঁকে বড়দি বলেই উল্লেখ করি। বড়দির বর হিসাবে সংশ্লিষ্ট জানেরা আমাকে চেনেন জানেন। আসলে ইস্কুলের হেড মিসকে সবাই বড়দি বলেন এপারে।

বরোদা

৫/১/২০০৭

স্নেহের মিহির,

বহুদিন যেন তোমার খবর পাইনি—আমিও বোধহয় খোঁজ নিইনি। দিন, বছর চলে যায়—কিছুই করা হয়ে ওঠে না। দৈনন্দিন জীবনে বাজে কাজে সময় চলে যায়। আজ সকাল থেকে বাড়ি-ঘর গুছিয়ে, bank-এর কাগজপত্র দেখতে দেখতে হঠাৎ দেখছি দুপুর এগিয়ে এসেছে।

পুরোনো বাংলা গান শুনছি। 'তুমি এসেছিলে জীবনে আমার...'। ফিরোজা বেগমের 'এমনি বরষা ছিলো সেদিন, শিয়রে প্রদীপ ছিলো মলিন, তব হাতে ছিলো অলস বীণ...'—(অনেক পুরোনো গান) শুনে মনে হচ্ছিলো 'মলিন' আর 'অলস' কী দারুণভাবে ব্যবহার হয়েছে। আশ্চর্য্য ছবি এনে দেয়।

আমি ফেব্রুয়ারিতে আসার অপেক্ষায় আছি। আচ্ছা ৩, ৪ মার্চ তো হোলি, পশ্চিমবঙ্গে কি সেদিন ট্রেনে চড়া যায় বা গাড়িতে কলকাতা শহরে ঘোরা যায়? অর্থাৎ তোমার ওখানে কি তখন আসা যায়? নাকি Fcbর ২১/২২ আসবো? জানিয়ো আমাকে।

এখানে বেশ সুন্দর ঠাণ্ডা পড়েছে। শীতের বাতাসে খুব ভালো লাগে বাগানে ব'সে পড়াশুনা ক'রতে। বাড়ির কলা, নারকোল, পেঁপে, চিকু নিয়ে খুব excited আছি। সেই গৈলার ছোঁয়া আর গেলো না, যাবেও না—ভাগ্যিস।

তুমি যে কী—বছরখানেক আগে যদি শান্তিনিকেতনের বাড়িটার কথা বলতে তা' হ'লে সত্যি তোমার নামে করে দিতাম। তুমি হিমসাগর, ল্যাংড়া

BanglaBook.org

নিয়ে আছো ভেবে আনন্দ পেতাম। তবে university থেকে lease land কর্তৃপক্ষ রাজি হতেন কিনা জানি না। তা'ছাড়া ও-বাড়ি নতুন করে তৈরি করতে হবে—প্রচুর খরচ আছে। যাক্ গে—'আফশোসের কলা' ভেবে বা দেখিয়ে লাভ কি!

কেমন আছো তোমরা? ভাবছিলাম তোমাদের সঙ্গে একবার বরিশাল গেলে কতো আনন্দ হতো। এ'জীবনে আর দেশে যাওয়া হবে বলে মনে হয় না। তবে স্বপ্ন দেখতে দোষ কী? এখন এতোই একা, যদি পুরোনো কথা ভাবি তো বড্ড মন খারাপ হয়ে যায়—সামনের স্বপ্ন দেখে কাটিয়ে দেওয়া ভালো।

ভালো থেকো। আমার কাজকর্ম চলে—যেটা নেহাৎ না করলেই নয়—অর্থাৎ deadline আছে—তা' হয়ে যায়। বাকি সবই তোলা থাকে তাকে। তা'নিয়েও স্বপ্ন দেখি। গতবারে এটা পাঠাতে ভুলে গিয়েছিলাম—সেই অজুহাতে চিঠিও লেখা হ'য়ে গেল। স্নেহ জেনো। সবাই—দিদি।

আমার চিঠি পড়ে চিন্তা কোরো না—আমি ভালো আছি। হয় কি, মাঝে মাঝে হৃদয়ের কথা বলিতে নারি-র জায়গায় পারি হয়ে যায়। দিদি।

12, AMEE SOCIETY, DIWALIPURA
OLD PADRA ROAD, BARODA-390015

৩/৮/০৮

স্নেহের মিহির,

'ফ্যালাইনা কথা থো ফ্যালাইয়া' প'ড়ে নানা পুরোনো কথা মনে এলো। মা ব'লতেন এটা। আর 'অ্যাপ্যাচাইল্যা কথা আর কইস না।' একটা ছিল 'ওইদিক থাক।' উদাহরণ—ধরো তোমার লেখা প'ড়ে, "মিহির এতো চমৎকার লেখে, 'সুনীলরে কয় ওইদিক থাক'।" (উদাহরণটা না দিলেই পারতেন— লেখক।)

'বিদুর' অনেকদিন আগে পড়েছিলাম। আবার পড়ে দেখলাম, এতো একেবারে হুবহু। 'মহাভারতের মহারণ্যে' কবে লেখা। বইটা একজনকে পড়তে দিয়েছি—না ভুল লিখলাম, কন্যা বাংলা বই প'ড়তে চেয়েছিল, ওকে দিয়েছি—তাই কবে বই হিসেবে প্রথম প্রকাশ হয়েছিল জানি না। 'বিদুর' এবং 'ধানাসিদ্ধি...' তে প্রকৃতি সংরক্ষণ সম্বন্ধে যা লিখেছো, তা' ব্যবহার করব। তোমার সুন্দরবন সম্বন্ধে রসদ পাবার অপেক্ষায় রইলাম।

'আগুন পাখি' পড়েছি। ওঁর মায়ের চরিত্র অসাধারণ। 'মান্টো'র 'Toga

BanglaBook.org

Tek Singh' জাতীয় নামের একটি গল্প আছে—মনে পড়িয়ে দিলো একই রকম bewilderment। আশ্চর্য্য মহিলা। বোধহয় বাঙালির মধ্যেই হয়। তবে উপন্যাস হিসেবে খুব উঁচুদরের মনে হল না। উনি প্রবন্ধ অনেক ভালো লেখেন। (মন্তব্যটির সঙ্গে সহমত নই লেখক।)

তোমার সঙ্গে বইমেলাতে অনুষ্টুপে 'দেশভাগ, দেশত্যাগ' (সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়) কিনেছিলাম। অনেক তথ্য আছে তাতে। তবে মাঝে মাঝে ভাবি—এই তথ্য নিয়ে তোমার-আমার-টুনুর কি হবে? আমরা নিজেরাই তো এক-একটি তথ্য।

জানতে ইচ্ছে করে টুনু' কিভাবে পড়াশুনা ক'রে পাকিস্তানে বড়ো হল। কতোটা সংগ্রাম ছিলো। আমার গৈলার দাশগুপ্তরা কিন্তু মনের আনন্দে জীবন-যাপন করেছেন ও করছেন। ওঁদের অনেকেরই পশ্চিমবঙ্গে আসতে ভয় করে। ভয় করবেই বা না কেন? ভারতবর্ষের যা অবস্থা। মনে হয় একটি বোমার ওপর বসে আছি।

ভালো থেকো। ভারতীকে বলো ওর কথা খুব মনে হয়।

তোমরা সবাই স্নেহ জেনো—

দিদি।

[১. 'বিদুর' মহাভারতের মহারণ্যের বেশ কিছুকাল আগের লেখা এবং প্রকাশিত। অল্পের জন্য বেঁচে গেছি।

২. টুনু আমার স্ত্রী।]

পূ:-এ চিঠিটা তুমি কয়েকবারই চেয়েছিলে, বোধহয় আমার চিঠি-তোমার চিঠি মিলিয়ে কিছু লেখার জন্য। পাঠাতে বড্ড দেরি হলো।

বেশ কিছুদিন পর চিঠিখানা পড়ে মনে হলো আগে তুমি আমাকে কত সুন্দর চিঠি লিখতে। গত বছর এই সাদামাটা দিদিটিকে দেখবার পর সেই চিঠির স্রোত একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ভেবে কষ্ট পাই।

গুজরাটিতে ঝাড়ু বা পিছাকে 'পিছি' বলে—এর source একই। আগে বুঝি না বুঝি তোমার সব বই পড়ে আমার নিজের দেশের আপন ভাষা বুঝতে কোনোই অসুবিধে হয় না।

'আগুনপাখি'র ভাষা, একেবারেই অপরিচিত এবং পশ্চিমবঙ্গের, তাই

BanglaBook.org

বোধহয় পড়তে কিঞ্চিৎ কৃত্রিম মনে হয়েছে। আশ্চর্য—ভাষা কিরকম শেকড় গেঁথে দেয়— সে ভাষা যতো আঞ্চলিক ততো বেশি।

ভালো থেকো—দিদি।

[১. আগে উদ্ধৃত আমার চিঠিটি দিদি কপি করে পাঠিয়েছিলেন। আমি কপি রাখি না।]

।। আট ।।

সেবার অর্থাৎ ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে দিদি এসেছিলেন। শান্তিনিকেতনে একটা উপলক্ষ্য ছিল। অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্তর শান্তিনিকেতনের বৃহৎ বাসভবনটি বিশ্বভারতীকে দান করার একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছিল। তিনি চেয়েছিলেন এ ব্যাপারে আমি তাঁর সঙ্গে থাকি। আমি গিয়েওছিলাম, কিন্তু অনুষ্ঠানে সঙ্গে থাকিনি। আসলে ফেরার পথে আমার বাড়িতে তাঁকে নিয়ে আসার কারণেই আমি গিয়েছিলাম। দিদির কোলকাতা আসা খুব একটা হয়ে ওঠে না। অথচ, এখানে তাঁর ব্যাপক বন্ধুবান্ধবের অবস্থান। সেসব মানুষেরা প্রায় সবাই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে একেকজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। কেউ তাঁর বাবার ছাত্র—যেমন অশোক মিত্রমশাই, কেউ সেই পিতৃসূত্রেই তাঁর পিতৃব্যতুল্য, যেমন রবি দাশগুপ্তমশাই এবং এক সময়ে তাঁদের ঢাকার ৫ নং পুরানা পলটনের বাসার নিয়মিত আড্ডাধারী, প্রয়াত কবি সাহিত্যিকদের প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া সন্তানেরা, তাঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ। এর সঙ্গেই সদ্যপ্রাপ্ত একটি ভাইয়ের সঙ্গে সামনাসামনি আলাপ তথা 'দ্যাশের বাড়ির' রোমন্থন। এইসব কারণেই আসা।

প্রয়াত কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, পরিমল রায় (ইদানীং-এর লেখক) এবং তৎকালীন রথী মহারথীদের কে নয়? ঢাকাতে পিতৃভবনে আড্ডাসূত্রে সবার সঙ্গেই তাঁর গভীর সম্পর্ক, সবার সাহচর্যই তিনি লাভ করেছেন।

বোধহয় পয়লা মার্চ তারিখ শান্তিনিকেতন থেকে তাঁকে নিয়ে আমি ভদ্রেশ্বরে আসি। মার্চের তিন এবং চার তারিখে হোলি ছিল সেবার। হোলির দিন দিদিকে নিয়ে আমাদের ব্যাপক খাওয়া-দাওয়া এবং গান-বাজনার মাইফেল হয়েছিল ভাইয়ের ঘরে। ভাই তখন ব্যাপক অসুস্থই। তবু তাকে খানিক জীবনের

BanglaBook.org

উত্তাপ আর আনন্দ দেবার উদ্দেশ্যেই ছিল সেই আয়োজন। ভাই সেই আনন্দে অতি কষ্ট স্বীকার করেও যোগ দিয়েছিল। আর ঠিক তার এক বছর পরেই সে ছেড়ে গেল আমাদের।

দ্বিতীয় দোল অর্থাৎ তিন তারিখে দিদিকে দুপুরের পর কলকাতায় পৌঁছে দিয়েছিলাম ভাই-এর গাড়িতে। পথে একটা বিচ্ছিরি দুর্ঘটনা হয়। পেছন দিক থেকে একটা ট্যাক্সি বেশ জোরেই এক ধাক্কা মারে আমাদের গাড়িটার পিছনে। দুজনে অক্ষতই থাকি। দিদি বলেছিলেন, ভাই বোন একসাথে থাকলে বিপদ বলে 'আমি ভিন্ন পথে যাই।' আমি বোধহয় বলেছিলাম, স্নেহ অতি বিষম বস্তু, তা শুধু অকারণে আশঙ্কার জন্ম দেয় না, অসম্ভব বিশ্বাসেও দীপ্ত করে। ভাগ্যিস এই পোড়া জীবনে এসবের আয়োজন ছিল!

শান্তিনিকেতন থেকে আসার দিন আমরা একটা গাড়ি (প্রাইভেট) নিয়েছিলাম। বোলপুর ছাড়ার পর থেকে গোটা রাস্তায়ই দিদি একের পর এক গান গেয়েছিলেন। জার্নিটা দীর্ঘ হলেও আদৌ ক্লান্তিকর মনে হয়নি। প্রাণোচ্ছলতায় দিদি, দেখলাম, বয়সকে প্রায় 'পিছা' মেরে তাড়াতে পারেন। ভাই-এর অসুস্থতাজনিত আমার সর্বক্ষণের আতঙ্ক এবং বিষণ্ণতাকে, সাময়িক ভাবে হলেও কী চমৎকারভাবেই না সেদিন তিনি কাটিয়ে দিতে পেরেছিলেন। জীবনকে এভাবে নিঙড়ে তার নির্যাসকে দামী মদের মত তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে খুব বেশি মানুষকে আমি দেখিনি। অথচ, তিনি নিজেও কী বিপুল দুঃখ এবং বিষণ্ণতার বোঝা বহন করে চলেছেন—তা তো ততদিনে আমি জেনেছিলাম। কিন্তু তবু 'একী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে'!

এইসব কথা লেখার আদৌ কোনো প্রয়োজন কিন্তু তাঁর বা আমার কারুর দিক থেকেই হয়তো নেই। তথাপি লিখছি এ কারণেই যে এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাপ্তিগুলো জল, হাওয়া বা নিসর্গের অন্যে স্বাভাবিক প্রসাদের মতই আমরা জীবনের কাছ থেকে শুধু গ্রহণই করি, কিছুই মনে রাখি না। কখনো মনে মনে বলি না, হে জীবন, তুমি আমাকে এত দিয়েছে, এজন্য আমি ধন্য। না, আমরা শুধু রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর পাঁচকাহনে কথা বিন্যাস করে এই দানের চমৎকারিত্ব থেকে দূরে সরে থাকি। তারপর যখন বেলা আঁধার হয়ে আসে, কেউ সেই আঁধারের ওপারে চলে যায়, কেউবা এপারে বসে স্মৃতিমন্থন করে, তখন বোধে আসে বড়ো ভুল হয়ে গিয়েছিল, আরেকবার, আহা আর একটি

BanglaBook.org

বার মাত্র যদি সেই উদাসী হাওয়ায় ধুলি ওড়ানোর দিনগুলি ফিরে পাওয়া যেত, তবে ওই ভুল আর করতাম না। কিন্তু তা তো আর পাওয়া যায় না। যেমন দেখতে দেখতে এই যে সুন্দর ব্যাপারগুলো ঘটল, বা এখন ঘটে চলে, সেসব তো ক্রমশ স্মৃতি হয়ে চলেছে। তারই মধ্যে আমার ভাই এর ব্যাধি ও মৃত্যুও আছে। আই. জির অকস্মাৎ প্রস্থান আছে, আছে বাসুদার প্রায় "তাহলে আসি হে" বলে চলে যাওয়ার মত অনিবার্য ঘটনা। কিন্তু সেইসব মর্মান্তিক ব্যাপারগুলো, কী আশ্চর্যজনকভাবেই না তাদের তীক্ষ্ণতা হারাচ্ছে আর জেগে থাকছে জীবনের আনন্দময় ক্ষণগুলির মোহময়তা। সময় কী অদ্ভুত নিয়ামক!

।। নয় ।।

জীবনের মর্মান্তিক ব্যাপারগুলোর তীক্ষ্ণতা সময়ের ক্রম অপসরণতায় সহনীয় হয় এবং সময় অবশ্যই এক অদ্ভুত নিয়ামক, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিঃসঙ্গতা যে মানুষকে কী পর্যন্ত বিবশ করে তা এইসব চিঠিগুলোর দিকে একটু মনোযোগ দিলেই বোঝা যায়। বিশেষ করে সর্বশেষ এই যে দুটি চিঠি উপস্থাপিত করছি তার বয়ানের বিশৃঙ্খলতায় এবং অন্তর্নিহিত গভীর দীর্ঘশ্বাসের নিঃশব্দ গুমড়োনোর হাহাকার ব্যক্তি মানুষের অসহায়তার, চূড়ান্ত কোনো আশ্রয় লাভের সম্ভাবনা না থাকার অভিব্যক্তি স্পষ্ট। আবার প্রাকৃতি বিশ্বে ঋতুরঙ্গের যাদুমন্ত্রের ছোঁয়ায়, সঙ্গীতের স্বতোৎসারিত বা উদ্গীথ ঋকের মোহনতায় যে জীবনধর্মে জেগে ওঠার অলৌকিক-প্রায় প্রতিস্পর্ধা, তা তো লক্ষ্যণীয়। এর সবটাই সত্য। 'কী যে সত্য এইসব!'

অলকনন্দা নামক একজন মেধাবীনি, বিদুষী এবং সঙ্গীত কলায় পারঙ্গমা নারীর জীবন কাহিনী লেখার উদ্দেশ্যে এতক্ষণের এই আয়োজন করিনি। ২০০৫-এর একটা সময় থেকে, আজকের এই ২০০৯-এর মধ্যকাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার ফোন, বিক্ষিপ্ত কয়েকটি পত্র এবং সামনাসামনি বার তিনেকের আলাপকে উপলক্ষ্য করে এই আলেখ্যটির উপস্থাপনা। উদ্দেশ্য, একটু পরখ করে দেখা একেবারে টাটকা টাটকা মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের স্বাদ কেমন করে মধুর স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়।

এবারে আর দুটি পত্র উপস্থাপিত করছি, তার প্রথমটির তারিখটি

BanglaBook.org

গোলমেলে। বস্তুত দুটি চিঠিই তাই। প্রথমটিতে ঠিকানা এবং তারিখের স্থানে সবই ঠিক আছে শুধু তারিখটি লেখা আছে ২৩শে। কোন্ মাসের বা কোন্ সালের অন্তর্গত সেটি, তার কোনো উল্লেখ নেই। অথচ এসব ব্যাপারে অলকনন্দা খুব অসতর্ক তাও নন। তিনি সাধারণত চিঠির জেরক্স রেখে মূল লেখাটিই বরাবর পাঠান। এবারে একই খামে দুটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তার অপরটির তারিখ ১লা অক্টোবর, ২০০৮। অবাক ব্যাপার দুটি চিঠিরই জেরেক্স পাঠিয়েছেন। একটিতো রীতিমতো দুষ্পাঠ্য। ২৩শের চিঠিটির বয়ান অনুসারে অনুমান হলো যে সেটি সেপ্টে ম্বরের। কারণ মাঝে এক জায়গায় জানাচ্ছেন, 'পুজো এসে গেল'। সেই চিঠিটিতেও দুষ্পাঠ্যতা আছে দু-এক জায়গায়। আমি দুটিই তুলে দিচ্ছি। মনে হয়, 'পুজো এসে যাওয়া', 'শরৎ' এর আগমনী, এসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নস্ট্যালজিক আবহ এবং বিশেষ বিশেষ গান, সেইসব গানের সঙ্গে সম্পর্কিত নিকটজনের স্মৃতি, যাঁরা এগুলো গেয়ে থাকেন অথবা গাইতেন এবং এখন নেই—এই তামাম ব্যাপার-স্যাপার মিলে তাঁর নিঃসঙ্গতাকে বড়ো এলোমেলো করে দিয়েছিল।

জীবনের এই সময়টার জন্য হাজারো মানসিক প্রস্তুতি নিলেও মানুষ এর থেকে অব্যাহতি পায় না। বয়সকে যতই অস্বীকার করা হোক সে ছেড়ে কথা কয় না। সে যে মহাকালের প্রবাহ, সব কিছুকে জীর্ণ করাই যে তার ধর্ম। সেই জীর্ণায়নের কালে বিশেষ বিশেষ ঋতু, তাকে ঘিরে 'স্মৃতিবেদনা'র যে নির্মাল্যটি রচনা করে, দিদির মতো, আমার মতো আবেগ-স্বভাবী মানুষদের বড়ো ক্লেশ-ক্লিষ্ট করে তা।

পাঠক, এবার এই বিক্ষিপ্ত চিঠিটি পড়ুন।

১লা অক্টোবর
২০০৮

স্নেহের মিহির, গুন্ গুন্ করতে হঠাৎ মনে হলো—'বঁধু' কথাটা কি দারুণ! কতো কিছু বোঝায়, প্রাণের আকুলতা, আত্মার ডাক। তিনটে গান মনে পড়লো।

বঁধু, কোন্ আলো লাগলো চোখে।—রবীন্দ্রনাথ

এসে দাঁড়ায়ো দাঁড়ায়ো বঁধু হে, আমার জীবন নদীর ওপারে—পুরাতন বাংলা গান।

বঁধু, তোমার আমার এই যে বিরহ

BanglaBook.org

এক জনমের নহে

—কাজী নজরুল ইসলাম।

আর কোনো ভাষায় কি এ আছে, নাকি এর অনুবাদ করা যায়? এর যা অনুভূতি তা তো অনুবাদ করা যায় না। আমি তাই অনুবাদ সাহিত্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ থাকি। কিন্তু অনুবাদ নাহলে তো Tolstoy, Dostoyevsky, চীনে (?), জাপানি, Marquez কিছুই জানতে পারতাম না।

এর মধ্যে একটা Seminar হলো— 'Friendship in Classical Indian Literature'. অর্থাৎ কৃষ্ণ সুদামা ইত্যাদি। কিন্তু এমন নতুন কথা শিখতে পেলাম না। বৈষ্ণব, সুফিরা তো Friendship নিয়েই ধ্যান করেন—ভগবানের সঙ্গে বন্ধুত্ব। বঁধু তো মিতা, পরমাত্মা, জীবাত্মা সবই। আমি বললাম Sanskrit Literature জানি না—তবে রবীন্দ্রনাথ বন্ধুত্বকে নানাভাবে দেখেছেন। তাঁর ছোটগল্প, উপন্যাস—প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। আর গানতো ওঁর প্রায় এই নিয়েই—ও গো মিতা, ও গো মিতা ...।

অনেক কথা লিখছি। ভাইরে লিখমু না ক্যান্? কারে কী কমু? কেডা কয় ভাইর লগে অ্যাপাচাইল্যা প্যাচাল কইরো না?

সত্যি, হঠাৎ বঁধু কথাটা যেন নতুন করে কানে বাজলো। গান শুনেই চলি, শুনেই চলি। তুমি নজরুলের কবিতা বা গান ভালোবাসো বা পছন্দ করো? আমার ওঁর গানের প্রতি একটা পক্ষপাতিত্ব আছে। বোধহয় ভাষার Experimentation, নানারকম ছন্দের ব্যবহার—কথার ওজন, sentiment তো বটেই। বারবার শুনি—কখনও একঘেয়ে লাগে না। কবি নরেশ গুহ বলেন, 'নজরুল অত্যন্ত নিকৃষ্ট কবি, শুধু রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করেছেন।' প্রায় plagiarism এর অভিযোগ। আমি তাতে আপত্তি করে নানাকিছু বলেছি। উনি মনে করেন রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ এর অনেক নীচে নজরুল। ক্ষুণ্ণ নয়, খেইপ্পা গেছি। একটু সমালোচনা করে আমার দিকটা বলাতে মনে হলো উনি খুসি হলেন না। তবে ভাগনি বিবি[২] কে বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না। (বাকি অংশ অস্পষ্ট)।

রজনীকান্ত খুব ভালো লাগে। আহা, 'আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম করে মোরে দাওনি।' যেমন কথা তেমন সুর। আর ইফফাত যা গেয়েছে। তুমি পান্নালাল ভট্টাচার্যের 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে'

BanglaBook.org

শুনেছো! কথা, সুর, মর্ম—মন মাতানো গান! অন্তরাত্মা অবধি সুর পৌঁছে যায়। এই শুনছি। 'আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া, বসি' আঁধারে মরিব কাঁদিয়া। বসন দিয়ে নয়ন চিরকাল বাঁধাইত রইল—যাকে বলে (অস্পষ্ট) করেই তো জীবন কাটে। আমার এক বন্ধু আছে, মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু বেণু রহমান London-এ থাকে— কী যে গানপাগল, এ গানটা দারুণ গায়। আমি Phone এ ওর গলায় এ গানটা শুনি। শুধু London বড্ড দূরে। এই বন্ধুই বললো, 'স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি স্বপনে রেখেছি ঢাকিয়া' (রজনীকান্ত)—দিদি, এ গানতো বাঙালির প্রাণ—বাঙালি তো স্বপ্ন দেখেই বেঁচে আছে।

তোমার সঙ্গে Phone-এ কাল ভাষা Internalise করার কথা হচ্ছিল। গুজরাটিরা যেভাবে ইংরেজী তাদের ভাষায় Internalise করেছে তুমি ভাবতে পারবে না। প্রথমে আমি হাসি সংবরণ করতে পারতাম না। এখন এদের ইংরেজী ব্যবহারে অবাক হয়ে যাই—অত্যন্ত বুদ্ধির ব্যাপার। নিরক্ষর, ক খ গ ঘ জানে না এরাও আমাকে অনেক সময় ইংরেজী ভাষা শেখান। একবার মাখন কিনে আনতে বললাম, সারা শহরে শুনলাম 'মাখ্খ্ন' পাওয়া যায় না। দিনের ক্লান্তির পর জিজ্ঞেস করলাম Amul এর মাখনও পাওয়া যায় না?' বাজার সরকার বুদ্ধিমান ছেলে, আমার দিকে একটু অবজ্ঞার হাসি দিয়ে বললো, 'আরে বটার বলো না—তোমার বটার চাই, মাখ্খন কেন বলছো—ওকে তো বটার বলে। I stood corrected.

কাল একটা নতুন খবর শুনেছি—জানাতেই হবে। একটি অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক, বিয়ে থা হয়েছে আর ছেলে বলা যায় না—শুধু ছেলেবেলা থেকে জানি। বরোদায় থাকেন, পুনা বেড়াতে গিয়েছেন। তাঁর অনেক কটি অভিজাত বংশের কুকুর আছে বরোদায়। হঠাৎ পুনাতে Phone এলো, সাহাব, অমুক কুকুর মারা গেছে।' সাহেব তো অবাকই নয়—খুবই কষ্ট পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হলো, কি করে মারা গেলো?' ভৃত্য জবাব দিলো (গুজরাটিতে) 'পতা নেই সাব, আটোমাটিক মরে গেলো'। এর আগে কি কিছু বলার আছে? ল্যাডা চুইক্যা গ্যালো।

[ভাষা Internalise করার ধরণ একই রকম প্রায় সর্বত্র। সাধারণ বর্গ নতুন শব্দকে অধিগ্রহণে, যদি বিশেষ করে তা ভিন্ন ভাষার শব্দ হয়, প্রায় একই রকম স্বাধীনতা গ্রহণ করে এবং শিক্ষিত সমাজে ব্যাপারটা হাসির কারণ হয়। এই অভিজ্ঞতাটা সব জায়গায় প্রায় একই রকম। কারণটা বোধহয় এই যে, সব

BanglaBook.org

জায়গায় সাধারণ মানুষই স্বভাবগতভাবে একটা সরলরেখা ধরে চলে। উদাহরণ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় = ইউনিভার্সিটি, বাজার = মার্কেট, হিন্দিভাষী অঞ্চলে মার্কিট, মাখন = বটার অর্থাৎ বাটার, ইত্যাদির উল্লেখ করা যায় এবং এনিয়ে গল্পগুলো ও স্বাভাবিক কারণে একই রকম। আমরা শিক্ষিত শ্রেণি সাধারণত এগুলো—অনুসরণ করি না, বরং মজা পাই। কিন্তু সাহেবরা যখন গঙ্গাকে গ্যাঞ্জেস, চুঁচুড়াকে চিনসুরা, বর্ধমানকে বার্ডওয়ান, ঢাকাকে ডাক্কা (Dacca) বা কলকাতাকে ক্যালকাটা উচ্চারণ করতো, অথবা বসু = বোস, ঘোষ = ঘাউস, বসাক = বাইস্যাক, আহমদ = আমেড ইত্যাদি তখন ব্যাপারটা হতো ঠিক উল্টো। ওগুলো অনুসরণ করা ছিল বা এখনো আছে আধুনিকতার নিদর্শন। এটা বোধহয় ঔপনিবেশিক সভ্যতার দুষ্পাচ্যতার ফল। ব্যাপারটা নিয়ে দিদিকে খোঁচাচ্ছি না, ভবিষ্যতের জন্য একটা বিতর্কের রাস্তা খোলা রাখছি। কারণ ভিন্ন গোঠের পুঙ্গবরা সুযোগ বুঝে তাঁকে এবং এই আলেখ্যর লেখক হিসাবে আমাকেও আক্রমণ করতে পারে। —লেখক।]

আজ তৃতীয়া [পুজোর সময়ের তিথি বলেই বোধহয় উল্লেখ করেছেন—লেখক]—সকাল থেকে মেঘ করে আছে। শিউলি, মায়ের পেতলের না কাঁসার বোধহয়—থালায় সাজিয়ে তুলে রেখেছি। সেই সাজিগুলি কী সুন্দর—দুদিকে সিঁদুর, চন্দন রাখার একটু বাটি মতো। ঝুমকো তো বর্ষাকালের—তাও ফুটছে। প্রকৃতির সীমান্তরেখা এতো বদলে গিয়েছে তা আঁকাবাঁকা হয়ে গিয়েছে। বর্ষা শরতের ফুল সব একসাথে ফোটে।

[আমিও বিগত কয়েক বছর ধরে খেয়াল করেছি যে স্থলপদ্ম যা শৈশব কাল থেকে শুধু শারদী পুজোর সময় ফুটতে দেখতে অভ্যস্ত তা এখন শরত এবং বসন্ত উভয় ঋতুতেই ফোটে। অবশ্য দুটি ঋতুই তাদের নিজস্বতা হারিয়েছে—লেখক]।

হাসান আজিজুল হক-এর যে লেখাতে আমি আঞ্চলিক ভাষার গণ্ডগোল—অর্থাৎ বোধহয় বর্ধমানের ভাষায় 'কেজ' এসে গেছে বলেছি—কবের লেখা জানি না। হয়তো মুক্তিযুদ্ধের অল্প পর—তখনও লেখক হিসেবে নিজের স্বত্তা (বানান একেবারেই জানি না—চলন্তিকা কে দেখবে—আর আবারতো ক, চ, ট, ত, প চিন্তা করতে হবে) হয়তো খুঁজে পাননি।

একেবারেই আবোলতাবোল চিঠি। মেঘলাদিন, শরতের মৃদু বাতাস, পুজোর ঢাক, ঢোল নেই, নাইবা থাকলো একটু আবোল তাবোল চিন্তা করতে আপত্তিটা (আপইত্য) কী? আমিতো গৈলার মেয়ে যেখানে আয়ুর্বেদ, ভাষা ব্যাকরণ সবের

BanglaBook.org

সঙ্গে এই ছড়াটিও আছে,

এপারেথথা মারলাম ছুরি
পরলো কলাগাছে
আড়ু বাইয়া রক্ত পড়ে
কার বাপের সাইধ্য?

ঐতিহ্য ছাড়তে নেই। Logic ছাড়াও জীবন থাকে। স্নেহ জেনো সবাই—দিদি।

১২ অমি সোসাইটি
দেয়ালিপুরা,
বরোদা-৩৯০০১৫
২৩শে

স্নেহের মিহির,

মন্টুকে হারানোর দুঃখ, শোক চিরকাল থাকবে—কোনোদিন যাবে না। ছোট ভাই, তাকে তুমি বড়ো করেছো, সে তোমার ছায়ায় এতো বছর থেকেছে, তুমি তাকে পাশ ছাড়া থাকোনি, হয়তো তোমার কিছু স্বপ্ন ওর মধ্যে পূর্ণ করেছো—আজ ও কাছে নেই, এ ব্যথা কি কখনও যায়? এই গভীর দুঃখ নিয়েও মানুষ জীবন কাটায়—ক্ষত কোনোদিনই মেটে না—একটা নিত্য সঙ্গীর মতো আঘাত দিতে দিতে সাথে চলে। দৈনন্দিন সবই হয়—হাসি, খেলা, আনন্দ—কিছু অন্য মাপে। সেই প্রাণখোলা দিনগুলো তো চলে যায়।

তুমি বয়োজ্যেষ্ঠ না হলেও সেরকমভাবেই থাকো পরিবারে। হয়তো মন খুলে কাউকে কিছু বলোই না। আমাকে লিখেছো—যখন ইচ্ছে করবে লিখবে বা ফোন করবে। দিদির সঙ্গেতো কিছু আড়াল করতে হয় না।

'দেশ' পত্রিকা আজই এসেছে। তোমার লেখাটি খুবই চমৎকার তবে ভাষাটি আমার পক্ষে কিঞ্চিৎ উচ্চাঙ্গ! ঠিকই বলেছো এসব কথা/কাহিনীর সমালোচনা করা যায় না। 'দয়াময়ীর কথা' পড়তে ইচ্ছে করছে। কলকাতা এলে কিনে নেবো—পাঠাবে এমন কেউ নেই। আমার পরিচিত সবাই বৃদ্ধ। সম্ভব হলে এক কপি আমার জন্য কিনে রেখো। ভারতী রায়ের পাঁচ প্রজন্মের ভূয়সী প্রশংসা পড়েছি। সাদামাটা গল্প এক পরিবারের—এতো প্রশংসার কিছু পেলাম না।

BanglaBook.org

তোমাদের থেকে কিছু senior, ভারতীদি এতো চঞ্চল ছিলেন যে বসে এতোটা লিখলেন কীকরে ভাবছি। তবে দারুণ brilliant ছিলেন।

তোমার বইর ওপর যা (অর্থাৎ যে লেখা) পাঠিয়েছো তার খানিকটা কাজে লাগবে। তবে আমার সারাংশ প্রয়োজন তা নেই। তুমি লিখে পাঠাবে? দেওয়ালীর আগে পাঠালে হবে—বাঙলায় লিখো—আমি আমার মতো করে নেবো।

পুজো এসে গেল। মা চলে যাবার পর পুজোয় যাবার আনন্দ এমনিতেই চলে গিয়েছে। মেয়ে তো কত দূরে থাকে— রোজ ফোন বা e-mail এলেও একসঙ্গে পুজো দেবার আনন্দ তো থাকে না। এখনতো একা—তোমার ভগ্নিপতি বিশেষ পুজো বাড়ি যেতেন না। তবু তখন সেজেগুজে অঞ্জলি দিতে যাবার একটা আনন্দ ছিলো।

এখানে ক' দিন প্রচুর বৃষ্টি হলো। হঠাৎ শরৎ এসে গেছে—সোনালি সকাল, শিউলিতে ভরা ঘাস। ঝুমকোলতা আজও আছে—আর আছে অপরাজিতা। আমার দেশের মাটির কিছু না কিছু ফোটে। সবেধন নীলমণি নারকেল গাছে এবছর বেশ নারকেল হয়েছে—তাও তো গ্রামের একটু স্বাদ। বাঁশবন নেই—গৈলা তো বাঁশবনে ভরা—শুক্‌নো দেশে পুকুরই বা কোথায়?

গান শুনি—ওয়াহিদ ভাইর কণ্ঠে। 'আমি তোমায় যতো' শুনে মনে পড়ে মা গাইতেন এই গান। আর 'কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও'। (এরপর লেখা একেবারেই অস্পষ্ট)।

'হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা, আমি যে পথ চিনি না'। মা যাবার পর হঠাৎ বাসু। কিছু না জেনেই ইফ্‌ফাতের গাওয়া এই গান আমাকে (অস্পষ্ট) হয়তো তাই ইফ্‌ফাতকে এতো ভালবাসি। মনে পড়ে আমি কোনো একটা গান শুরু করতেই মন্টু বললো, 'এতো মায়ের গান'। (মন্টু আমার সেই অসুস্থ কনিষ্ঠ ভাইটি, যে ২০০৮-এর মার্চে থেমে গেছে) —লেখক।]

এখন শেষ করি। দেয়ালীর পর আসার ইচ্ছে। বেশ কবারই যেন দেখা হয়। ভালোবাসা নিয়ো সবাই—দিদি।

জীবনের এইসব খুঁটিনাটি, পাওনাগণ্ডা, যা নিয়ে থুয়ে কিছু হওয়া বা না হওয়া, হৃদয়ে অবস্থানকারী বিষাদবৃক্ষের দোলন, তার পাতা ঝরানো, আর বিষাদ। সেই বিষাদের মধ্য থেকেই গুন্ গুন্ করে আবার ভেসে আসে গান, "শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ, পথপ্রান্তে বসে একী খেলা! আজি বহে অমৃত সমীরণ,

BanglaBook.org

চলো চলো এইবেলা। তাঁর দ্বারে হেরো ত্রিভুবন দাঁড়ায়ে, সেথা অনন্ত উৎসব জাগে, সকল শোভা গন্ধ সঙ্গীত আনন্দের মেলা।।" গোটা গানটা উদ্ধৃত না করলেও চলতো। কিন্তু লোভাতুর মন, এই সুযোগে বিষাদের মধ্য থেকে ঠেলে জেগে ওঠার অনিবার্য অদম্য আনন্দের আস্বাদ ছাড়ে কী করে?

জীবন তার স্বতোৎসার আনন্দ নিয়ে যেন এক নির্লজ্জ বেড়াল। যতোই লাথি ঝ্যাঁটা খাক্, হার মানবে না। 'বেড়াল ছেঁচি' বলে একটা কথা আছে না? জীবন হলো সেই বিড়াল ছেঁচি। সব বিষাদ বিষণ্ণতার মধ্যেই যেন আনন্দের উৎসার।

—— o ——

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অ-দেখা উত্তর পুরুষের পত্র পিতামহীর স্বদেশ যাত্রা

পত্রাকারে যে কাহিনীটি উপস্থাপিত করছি, তা পুরোটাতো গল্পকথা নয়ই, বরং বলা যায় যে এর মধ্যে গল্পাংশটাই গৌণ। ব্যাপারটা অনধিকারচর্চা কিনা জানিনা, তবে আমি সামান্য লেখালেখি করি। আমার লেখার ধরণটা, পাঠকেরা জানেন যে ঠিক লেখকজনোচিত নয়। লেখ্য বিষয়বস্তুর বেশিটাই আমি যাদের সঙ্গে মিশি বা যেসব জায়গায় যাতায়াত করি তাদেরই মুখের কথা, বা সেইসব স্থানের কথা। এরকম লেখালেখির চর্চা, আমার ধারণা যে কেউই করতে পারেন, তার জন্য কোনো বাড়তি প্রতিভা বা গুণের দরকার হয় না। সে যাই হোক, এতদ্‌সত্ত্বেও, আমার বেশ কিছু গুণগ্রাহী পাঠক আছেন, তাঁরা আমাকে প্রাণ-ঢেলে ভালবাসেন এবং আমাকে প্রায়শই চিঠি লেখেন, এস. এম. এস পাঠান এবং ফোনও করেন। আমার একখানা বই পাঠক সমাজে ব্যাপক আদৃত হয়েছে এবং তার বিক্রয় অর্থের যদি যথাযোগ্য স্বত্ব ভাগ আমি পেতাম, সেটা আমার পেন্সনহীন অবসর জীবনে নিঃসন্দেহে বড় স্বস্তিদায়ক হতো। শুনতে খারাপ লাগলেও বেশিরভাগ লেখকই বোধহয় আমার সঙ্গে সহমত হবেন যে বাংলাবই-এর বাজারে তেমনটা বড়ো একটা ঘটে না। শুনি, যে বাংলা বই নাকি বিক্রি বাটা হয়না, তা সে কথা যাক্‌গে।

আমার এই অভিজ্ঞতাটা একটু ভিন্নধরণের যা, যে কোনো লেখকের পক্ষে অবশ্য আনন্দের। আমি প্রায় নিয়মিত পাঠকদের কাছ থেকে সাড়া পাই। তাঁদের মধ্যের একটা বড় অংশ আবার ফোন করেন দূর দূরান্ত থেকে। চিঠিও লেখেন বেশ বড়োসড়ো করে এবং বুঝি তাতে তাঁদের খরচখরচাও বিলক্ষণ হয়। আই এস. ডি বা এস. টি. ডি-তে কথা বলতে, বা ছ' আট, দশ পৃষ্ঠা একটি চিঠি পাঠাতে তো কম খরচ হবার কথা নয়। কিন্তু এই সৌভাগ্যটা আমার এই স্বল্পায়ত লেখক জীবনে প্রায় প্রাকৃতিক দাক্ষিণ্যের মতোই আমি দীর্ঘদিন ধরে পেয়ে আসছি। টাকা না হলেও ভালবাসার স্বাদটা নেহাৎ তুচ্ছ নয়।

সম্প্রতি বিলাসপুর (মধ্যপ্রদেশ) থেকে এক ভদ্রলোক (যদিও বয়সের কারণে, তাঁকে ছেলেটিই বলা উচিত) এক রাতে আমায় প্রায় ঘণ্টাখানিক ধরে তাঁর বাবা, জেঠা এবং বিশেষ করে তাঁর ঠাকুমার বিষয়ে কিছু কথাবার্তা

BanglaBook.org

শোনান। আমি বর্তমান আলেখ্যটিতে সেই কথা পত্রাকারে রাখছি। ছেলেটি বা ভদ্রলোক বলেছিলেন যে, তিনি আমাকে একটি পত্র দেবেন। কিন্তু পত্রটি এখনও পাইনি। গোটা বক্তব্যটা দেশত্যাগ বিষয়ক। আমার পাঠকেরা জানেন, দেশভাগ এবং দেশত্যাগ বিষয়টি নিয়েই আমি বেশিরভাগ লেখা লেখি করি। কপালক্রমে, এই লেখাটিও তাই-ই হলো। পত্রটি লিখলে সম্ভবত এরকম ইতো, যেমনটি নীচে দিলাম। কারণ টেলিফোনে বক্তব্যটা এরকমই ছিল।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,
বিলাসপুর
৫ই জুলাই ২০০৮

আপনি আমাকে চিনবেন না। সে অর্থে আমিও আপনাকে চিনিনা। তবে চিঠিটা লিখছি কেন. সে এক দুঃখের কথা। কিছুটা মজারও। ব্যাপারটা আপনাকে পত্রাকারে জানবার হেতু আছে। গল্পটা শুনলেই তা বুঝতে পারবেন।

আমি আপনাকে চিনি না বটে, তবে আপনার লেখা একখানা বই মারফত আপনাকে জানি। শুধু আমি নই, আমার বাবা, মা, বোন এবং সর্বোপরি আমার ঠাকুমা (বয়স এখন ৯৩), যিনি নিয়তই শয্যাশায়ী, তিনি পর্যন্ত আপনাকে জেনেছেন, আপনার ঐ বইখানার মারফত। বইখানা নিয়ে আমাদের বাড়িতে প্রায় রোজই একটা বৈঠক হয় ঠাকুমাকে কেন্দ্র করে।

বইখানার লেখক পরিচিরিতির মাধ্যমে, আপনার জন্ম তারিখ, গ্রামনাম এবং যে দুটি ইস্কুলে আপনি পড়শোনা করেছেন, সবই আমরা চিনেছি। আমার বাবার নাম শ্যামাপদ পাহি দাস। বয়সে আপনার চাইতে বছর খানেক, বছর দেড়েকের ছোট। সে কারণে আমি আপনাকে জেঠামশাই হিসাবে, মনে মনে ধরে নিলাম। একথাটি জানবার হেতু, যদি ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গে আবার ফোন মারফত যোগাযোগ হয় বা সাক্ষাৎ, আপনি যাতে আমার সঙ্গে আপনি করে কথা না বলেন।

আমার এই চিঠিখানার আসল উদ্দেশ্য আমার ঠাকুমার কিছু কথা আপনাকে জানানো। আমাদের দেশের বাড়ি ছিল আপনাদের গ্রামেরই কোণাকুণি পশ্চিম দক্ষিণে গজালিয়া বা গাবখানের নদীর (আসলে দোন, অনেকে খালও বলে।) কুল ঘেঁষে। গ্রাম নাম প্রতাপ। কিন্তু শুধু প্রতাপ বললে, সহসা লোকে বুঝতে

BanglaBook.org

পারেন না বলে, পাশাপাশি দুটি গ্রামের নাম একসাথে বলে। বলে, পেরতাপ-শীরযুগ বা শীরযুগ- পেরতাপ। আমি অবশ্য কোনোদিন সেই গ্রাম দেখিনি। বাবা এবং ঠাকুমার কাছে গল্প শুনে শুনে, তার রাস্তাঘাট, খালবিল পুকুর, গজালিয়া দোন বা নদী, মেঠো পথ, ছোটখাল বড় গাছপালার বিবরণ, অনুপুঙ্খ সব প্রায় মুখস্থ। দেশের বাড়ির কথা উঠলে বাবা আর ঠাকুমাকে কেউই দাবায়ে রাখতে পারে না। সুতরাং কাজে কাজেই, ওসব আমার, আর আমার বোনের 'একছের' মুখস্থ। ভাষাটাতেও তাঁর দৌলতে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি। এতদিনেও তা কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয়নি। আমাদের এখানে 'ছত্তিশগড়ি' ভাষার আঞ্চলিক উচ্চারণও আমরা আপনার নামায়িত চান্দ্বীপি প্রকরণে করে থাকি। এখানের শিক্ষিত ভদ্রজনেরা যাঁরা উচ্চবর্ণীয়, ভুমি পুত্র, তাঁরা তা শুনে রগড় করেন। কিন্তু ভূমি সংলগ্ন ভূ-সন্তানেরা, কী কারণে জানিনা, খুব স্বাভাবিকভাবেই তা গ্রহণ করেন, বোঝেনও।

চৌষট্টির হুল্লোড়ের সময় নাকি বাবা এবং আমার জেঠামশাই হরিপদ পাহিদাস সপরিবারে এপারে, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু বা 'রেফুজি' হিসাবে আসেন। ঠাকুমার ভাষায় তখন নাকি, এ দ্যাশের রাজা গান্ধি আর হ্যার মন্ত্রী জহরলাল, হ্যারগো জবরদস্তি ঠেল্‌ইয়া গুঁতাইয়া দণ্ডকবনে পাডাইয়া দেছেলে। সেই যে ঠাকুমার রাগ, অদ্যাবধি তার উপশম হয়নি। এমন দিন যায়না যে বুড়ি গান্ধিজিকে শীতলাসোগা' অত্তিসারইয়া' মড়া ইত্যাদি গাল না পেড়ে জল খান। দণ্ডকারণ্যে থুক্কুরি দণ্ডকবনে আমরা বেশিদিন থাকিনি। মানে, থাকতে পারিনি, কারণ ঐ ঠাকুমা। তাঁর একটাই কথা, এহানের মাডি শক্ত-ঝামা। লাউগাছ, কুমড়া গাছ বা পুঁই শাগের লতাড়া পজ্জন্ত জন্মে না। এহানে থাহন নাই।' বুঝি নরম মাটির মেয়ে, সেই কোমলতা ফিরে চান। কিন্তু তাতো হবার নয়।

বাবা তখন সদ্য যুবক। পড়াশোনা আই, এ পাশ। দেশে থাকতে ভূমিনির্ভরতা এবং প্রাইমারি ইস্কুলে শিক্ষকতা ছিল রুজিরোজগারের উপায়। জেঠামশাই দেশে মোক্তারি করতেন। স্বভাবে আপনার বইয়ের জেঠামশাইয়ের মতই সাতিশয় ধড়িবাজ। এখানে এসেও তাঁর ব্যবহারজীবি সুলভ কুবুদ্ধি কুশলতার জন্য অতিদ্রুতই দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর সংসার ছোট। নিজে আর ছেলে একটি। জেঠিমা অকালে গত হয়েছিলেন। বয়স থাকা সত্ত্বেও, জেঠামশাই আর ঝামেলা বাড়ান নি। চরিত্রে একটু 'ইদিক সিদিক' ছিল, সমস্যা

BanglaBook.org

হয়নি। ঠাকুমা তাঁর 'চরিত্তির' এবং টাউট স্বভাবের জন্য, তাঁকে দেখতে পারতেন না, এমন কি, কথাবার্তা পর্যন্ত বলতেন না পারত পক্ষে। তিনি এখানে আসার মাস দুয়েকের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের একটি মফঃস্বলে শহরে চলে যান, এবং সেখানকার মহকুমা আদালতে ঐ মোক্তারিকে পেশা করেই অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেন। আমাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক তিনি রাখেননি, আমরাও না। দেশ ছাড়ার সময়, জমি-জমা বিক্রিবাটা নিয়ে বাবার সঙ্গে কিছু মনোমালিন্য হয়েছিল, বাবা, তাঁর মিথ্যাচারের জন্য খুবই আহত হয়েছিলেন, ফলে সম্পর্ক আর জোড়া লাগেনি। কিন্তু এইসব বৃত্তান্ত শুধু ঠাকুমার কথায় পৌঁছোনোর সূত্র হিসাবেই বললাম, মূল গল্পের সঙ্গে এর বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই।

ঠাকুমা তখন যথেষ্ট কর্মক্ষম। বাবার হাতে পুঁজিপাটা যেটুকু ছিল, সেটুকু থাকতে থাকতেই, ঠাকুমা তাঁকে এবং মাকে নাকি একেবারে পাখিপড়া করিয়েছিলেন যে, বাঁচতে গেলে, হাতে দুটো পয়সা থাকতে থাকতে ভবিষ্যতের 'গতি পইদ্য' ঠিক করে নিতে হবে। এটা দেশ না, দেশ হলে কথা ছিল না। কিছু করো না করো, জমির ধান ঘরে উঠবেই। তারপর, 'ডোবা, ব্যাড়ে, চ্যাং, শিং, কইমাছ, বা সোঁতা খালে ঘুঁসা চিঙ্গইর, চ্যালা পুঁডি কিছু ধরন যাইবেই। খ্যাতে না থাউক, বোনে জঙ্গলে শাক, সব্জি, কচু মচু, কলাডা মূলাডার অভাব নাই। দিন চলইয়া যাইবে, এ হানে তো হেয়ানা। এহানের মাডি বাজা। নাই কইতে কিছু নাই, বাসি আহালের হুগ্না ছাই। সুতরাং বাঁচার উপায় বার করো। বাবা তেমন উদ্যোগী মানুষ নন। কিন্তু ঠাকুমার বাক্যবাণে উত্যক্ত হয়ে তাঁকে নড়ে বসতে হলোই। কিন্তু করবেনটা কী? রিলিফের ব্যবস্থা সরকার করেছে, কিন্তু তার যত গর্জন, বর্ষণ সে তুলনায় প্রায় কিছুই না। জমি কিছু অবশ্য দিয়েছে, তাকে চটিয়ে চাষযোগ্য করার যোগ্যতা বাবার নেই। দেশে জমি ছিল, কিন্তু চাষ করার বিদোটা তো আর অভ্যাসে ছিল না। চাষতো 'হালুয়োরা' করতো, করে। ভদ্দর লোকরা হেয়া করে নাকী?

এসব কথা বাবা প্রায়ই বলতেন। বলতেন, আই এ পাশের আজ কাল কোনো মূল্য নেই। কিন্তু আমরা যেখানকার মানুষ, সেখানে গ্রামে গাঁয়ে, আইএ, বি. এ. হামেশা পাওয়া যেত না সেসব দিনে। তাই তাঁদের কদর ছিল। আমরাও সেই গৌরবে চাষ করাটাকে কোনো বিদ্যে বলেই মনে করতাম না, যারা চাষ করে, তারা চাষা। চাষাভূষোরা মুর্খ হয়। অশিক্ষিত ছোটলোক। আমরা ভদ্রলোক

BanglaBook.org

শিক্ষিত। কিন্তু দণ্ডকারণ্য প্রবাসে থেকে চেতনা হয়েছিল, আইএ পাশ মাস্টারমশাই না হয়ে যদি চাষা ভুষোই—হতাম, আজ এত অসহায় বোধ করতাম না। কিন্তু চাষ করার বিদ্যে জানা থাকলেও কী এই পাথুরে জমিতে কিছু করতে পারতাম? বোধহয় না। দেখছিতো জাত চাষিদেরও অবস্থা।, এ কোথায় পাঠালো আমাদের।

ঠাকুমা বলেছিলেন নাকি, আগে এ জায়গাটা ছাড়াতেই হবে। বলেছিলেন, মাইনসেগো লগে একটু কথাবার্ত্ত কইয়া, খোঁজ খবর নে এ দ্যাশে ছোডো খাডো শহর নগর কোথায়। তারপর হেহানে যাইয়া এটটা মুদির দোকান দিয়া ফ্যালা। এছাড়া তুই অইন্য কাম কিছু করতে পারবিনা।' তাই খোঁজ খবর করতে করতে এই বিলাসপুরের উপনিবেশ। তখনও এখানে বাঙালি, বিশেষ করে বাঙালরা কেউ আসেনি। সস্তা গণ্ডার জায়গা। অন্য বাঙালি উদ্বাস্তুরা যখন দণ্ডকারণ্য ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গ পালাবার মতলবে, ঠাকুমার বুদ্ধিতে বাবা এলেন এই বিলাসপুরে এবং সেই মুদির দোকান দিয়েই বসলেন। তাওতো তাঁর দ্বারা হওয়ার উপায় ছিল না। ঠাকুমা সেখানেও হাল ধরলেন। বললেন, আমার বাবা ভদ্দরলোকের পোলা হইয়াও দাড়িপাল্লায় ওজন করইয়া সদয় পত্তর বেচতে। কায়দাডা আমায় কিছু রপ্তে আছে। চিন্তা করিস না, আমরা তিনজনে মিলইয়া ঠিক চালাইয়া নিমু। কষ্টরে কষ্ট ভাবলেই কষ্ট। হেয়ার লইগ্যা হাত-পাও প্যাডের মইদ্যে ঢুকাইয়া বইয়া থাকুম। তো ঠাকুমার মনের জোরেই বাবা আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রথম দিকে নাকি কষ্টের অবধি ছিল না। এই জায়গাটা তখনও ঠিক শহর নয়। আশে পাশে মাঠ ঘাট, ঝোপ-ঝাড় ছিল। ঠাকুমা তখন বুড়ি নয়, মাঝবয়সী স্বাস্থ্য বেশ ভাল। ভোর চারটেতে উঠে, মাকে নিয়ে আশ-পাশ মাঠময়দানে ঝোপঝাড় থেকে শাক-পাতা এটাওটার জোগাড় দেখতেন। এখনও সেই সব দিনের গল্প বলেন। বলেন, মাইন্‌সে বিপদে পড়লে না করে কী? বড় পোলাডাতো ভস্‌সো, আর তোর বাপটা অইছে বল্‌দা। বড়তো হ্যার আখের গুছাইয়া লইয়া আইছেলে দ্যাশ থিকাই। রাজাপুরের শ্যাহেগো মইদ্যে কিছু আছিলে বজ্জাত। পোঞ্চাশ বাহান্ন সনের রায়টেও হ্যারা জলিম গিরি করতে চেষ্টা করছেলে। আমাগো এলাকার শ্যাখ আর, পাকমরের খানেগো দৌলতে সুবিদা করতে পারে নায়। কিন্তু চৌষট্টির চেতাচেতির সোমায়, আরে, ঐ যে কী ইসে লইয়া হিন্দু মোছলমানে কাডাকাডি অইলে যেবার, হেবার তো দ্যাশ

BanglaBook.org

ছাড়তেই অইলে। হেবার তো কুট্টি মেয়ায় নাই। হ্যার লইগ্যা। কয়েক বছর আগেই হ্যার মিত্যু অইছেলে। কাডাকাডিতো হেহানে অয় নায়। দ্যাশ ছাড়লাম তোর জেডার লইগ্যা।

ঠাকুমা এখন অতি বৃদ্ধা বলেই নয়, আগে যখন চলাফেরা করার অবস্থায়, তখনও দেখেছি, কথার খই রাখতে পারেন না। যেখানে শুরু করেন, গল্প বলতে বলতে পিছলে গিয়ে ঠিক পড়েন দেশ ছাড়ার সময়কার কথায়। লড়াই, ঝঞ্ঝাট করে থিতু একসময় হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু দেশ ছাড়ার হুতাশ তাঁর একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি। এখানে কোনো কিছুই তাঁর দেশের বাড়ির 'লাখান' মনে হয় না। কোনো খাদ্যবস্তুর স্বাদ নেই, গাছ-পালার ছিরিছাদ নেই,। মানুষগুলোও যেন ক্যামন। বাবাও তাঁর সঙ্গে এসব ব্যাপারে সদা সহমত। তারপর দেশের বাড়ির বাগান, পুস্কন্নি মঠ 'চাইল্‌তা গাছটা' জাম্বুরা গাছটা' ইত্যাদি সব সবিস্তারে বলে, শেষ করেন তাঁর বড় ছেলে হরিপদর মুণ্ডপাত করে। তাঁর সবচাইতে রাগ নিজের বড়ছেলে হরিপদের উপর। কী? না হেডা ঐ রাজাপুরইয়া বজ্জাত শ্যাখগুলার থিকাও জালিম।' ঠাকুমা কিছু মুসলিম সাধারণ-জনেদের গালি-গালাজের বুলি দেশে থাকতে রপ্ত করেছিলেন এবং সুযোগ পেলেই সেইসব শব্দ ব্যবহার করেন এখনও। জিজ্ঞেস করলে বলেন, ওয়া আমাগো দ্যাশের কথা। ওয়ার আবার হিন্দু মোছলমান আছে নাকি. তা তাঁর বক্তব্য হল (এখনও), মোছলমানেরা যে হিন্দুগো জমি বাড়ি দখল করইয়া লইতে চায়, হেয়া হ্যারগো মর্জি, হেয়ার এট্‌টা অথ বুজি। কিন্তু হরইয়াতো হিন্দুর পোলা, হে হ্যার বাপ মরা ছোড ভাইডারে ঠগাইয়া জমি জিরাত বেচইয়া যে বেয়াকরে আনইয়া উদ্‌ব্যস্ত (উদ্বাস্তু) ক্যাম্পে ফ্যালইলে হেয়ার অথ কী? নাইলে চৌষট্টির চৈঠ্যেও আমাগো ওহানেতো কিছু অয় নায়। হরইয়াই তো রাজাপুরের এজাজ গুণ্ডারে লইয়া, ভয় টয় দ্যাহাইয়া কইলে, এদ্যাশে আর থাহন নাই, লও যাই। এজাজও কইলে, হ, রাঙ্গাঠাইরইন, গেরামে হুন্‌ছি অনেকেই বেশ গরম গরম বাত্‌ কয়। তয় বোজো। হে কারণেই তো এই দণ্ডক বনে কপাল পোড়াইতে আইলাম। তোর দাদু আছিলে এট্‌টা আভোদা মনুইষ্য। নাইলে, আক্কোলবান মানুষ কেউ আচুক্‌কা ঐ বয়সে মরে? হে বাচইয়া থাকলে কী হরইয়া এইরহম্‌ এট্‌টা টাউট্‌ গিরি করতে পারতে? না হেয়া করলে হ্যার পিডের ছাল আছাড়ানইয়া রাখতে তোর দাদু?

দাদু নাকি মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন হঠাৎ। কারণ-

BanglaBook.org

সন্ন্যাস রোগ। সেও ঠাকুমার এক রাগের কারণ। বলেন, রোগের দোষ কী কও ভাই। ডাক্তারে কইয়া দেছেলে, মাংস, ঘি, আলু, মাখন এইসব খাওয়া চলবে না। হে কইলে, তয় খামু কী, ঘাস ঘুড়া? মাংস হেনার রোজ চাই, হেয়াও একটু আধটু না, স্যার দুই, দোবেলা, কোম করইয়া তিন হাতা ঘি লাগতে হেয়া পাক করতে। ডিম খাইতে রোজ এক হালি, লগে আটদশ পিস্ পাওরুটিতে পছন্দ মতন মাখন চিনি মাহাইয়া, সকালের জলখাবার। অত খাইলে মানুষ বাঁচে? বেলাড় পেশারে তিন বার পড়ছেলে মাথা ঘুরাইয়া, চৌথা বারে আর ওডলেনা, মাথার শিরা ছিড়ইয়া রক্তপাত। ডাক্তার আইয়া কইলে, এডা রোগের মিত্যু না, আপ্তহয়ত্যা। রোগডাতো হে নিজে পালছে।

তখন হরিপদর বয়স পনেরো, শ্যামাপদ দশ। সংসার ধরেছিলেন ঠাকুমা শক্ত হাতে। মুরুব্বি মেনেছিলেন পাকমহরের খান সাহেবকে। তাঁর মুরুব্বিয়ানার ভয়ে, আশপাশ গ্রামের বিশেষ করে রাজাপুরের যারা বদমাশ প্রকৃতির লোক, তারা কোনোদিনই নাকি ঠাকুমার দিকে চোখ তুলে তাকাতে সাহস করেনি। ঠাকুমা দেখতে প্রকৃতই সুন্দরী এবং সুস্বাস্থ্যবতী ছিলেন সেই বয়সে। একথা তিনি নিজেই বলেন এখনও। বয়স তার তখন বছর পঁয়তিরিশের। দেখে নাকি মনে হতো বছর পঁচিশেকের মত। ঠাকুমার জবানে, হেয়া এট্টা অনেয্য কাণ্ড। আমি রাড়ি মাথারি, বয়স দুকুড়ি অইতে চল্‌লো, আমার রূপ যৈবন লাগবে কোন্ ছাতার কামে? এয়া খালি উদ্বাগ বাড়াবার লইগ্যা। পিছামার।' কাকে যে পিছাটা' মারেন বোঝা শক্ত। কখনো মনে হয় ভগবানকে কখনো তাঁর রূপ-যৌবনের অনেয্য বাড়াবাড়িকে কখনো মনে হতো দাদুকেই। কিন্তু ভগবান নিয়ে তাঁর বাড়াবাড়ি কিছু দেখিনা এখনও। তবে গুরুর কথা বলেন মাঝে মাঝে। গুরু ছিলেন কাছাকাছি গ্রাম রণমতির বীরেন সাধু। তাঁর ওপরেও রাগ তাঁর ভক্তির চাইতে অধিক। শুয়ে শুয়ে গজরান, মরা, তুমি আমার বেয়াক কিছু নিলা। এহনতো বিছানায় ফেলাইয়া রাখছো, আমার কথা তোমার মনেও নাই, মোস্তর দিয়া মাংস খাওন বন্দো করইয়া থুইছিলা হেই কবে, খাইতাম এটটু মাছ, হেয়ারও পাইন মারইয়া দেলা আদা বয়সে রাড়ি করইয়া। তুমি আবার পার করবা আমারে। পার করবা না কাফা করবা। আছিলাম সোনার জাগায় মনের সুখে। আন্‌ইয়া ফ্যালাইলা ঝামা কঙ্করের দ্যাশে। আইজ তামাইত এটটা খাল পজ্জন্ত দ্যাখলাম না এহানে ঘোলা জলের। পুস্কন্নি গুলায়তো ওয়া জল না মূত কিছু ঠাহর করতে পারি না। আর মানুষগুলাতো কালা কুষ্টি, ইহি। তয় এ্যাম্‌নে বেশ ভাল।

BanglaBook.org

খান্ সাহেব নাকি দাদু মারা যাবার পর একদিন এসেছিলেন। সঙ্গে একটি বছর বিশ বাইশের জোয়ান বলিষ্ঠ চেহারার ছেলে, নাম অছিমদ্দি। উঠোনে বসে পাড়ার এবং তফাতের হিন্দু মুসলমান যারা ছিল, তাদের ডেকে জানিয়ে দিয়েছিলেন এই মহিলারে আমি ধম্ম বুইন বলইয়া কসম খাইলাম, আপনেরা বেবাকে সাক্ষী থাকলেন। অছিমদ্দি তহন থিকা এই বাড়ির পাহারদার, হালইয়া, রাখাল এবং অনেক কিছু। 'পোলাডা ইমানদার আমি জানি। ইন্‌শাল্লা, আমার এই দিদির যদি কিছু ক্ষেতি করায় বদ মতলব কেউ করে, অছিমদ্দির উপায় হুকুম রইল, হ্যারে খুন করলেও আমি অরে বাচামু। আপনেরা জানেন, আল্লার কুদরতে হে ক্ষ্যামতা এ বান্দার আছে। ব্যাস্, আর কোনদিন তিনি এবাড়িতে আসেননি। প্রয়োজনমত অছিমদ্দি তাঁর কাছে শলা পরামর্শের জন্য যেত ঠাকুমার নির্দেশ নিয়ে। কিন্তু কপালে সে সুখ সইল না। খান্ সাহেব মারা গিয়ে ঠাকুমার যেন সত্যিই আপন ভাইয়ের মৃত্যু শোকের আঘাত লেগেছিল। অছিমদ্দি অবশ্য শেষ পর্যন্ত থেকেই গিয়েছিল এ বাড়িতে , যতদিন বাবারা সবাই না দেশ ছেড়েছেন। সে ঠাকুমাকে নাকি বলেছিল, রাঙ্গামা, এই কামডা মোন লয় ঠিক অইতে আছে না। রাজাপুরইয়াগো মইদ্যে যারা বদমাইশ, মুই হ্যারগো খোঁজ খবর রাহি। বড় চাচা মেঞায় মোরে হেয়ার সুলুক সন্ধান কইয়া গেছিলেন। পোঞ্চাশের রাজাপুর আর আইজগার রাজাপুরের মইদ্যে ফারাক আছে। হেহানে যারা থাকে হ্যারগো মইদ্যেও এবার কৈলোম দুইডা দল। নতুন জামানার ছাওয়ালেগো মইদ্যে আগেরগো ল্যাহান জালিমি ভাব তেমন নাই। মোনলয়, হরিভাইডি কিছু বদ মতলব হরতাছে। মোর কৈলোম শ্যামের লইগ্যা ডর লাগতাছে। কিন্তু কিছুই করা যায়নি। মোক্তার হরিপদ গোপনে সম্পত্তি নিজের নামে করে নিয়েছিল তালেগোলে অনেক আগেই। কেউ বুঝতেই পারেনি। ঠাকুমা পরে বলেছেন, ঘরের শত্তুর বিভীষণে যদি মারে, তয় ভগবানও বাচাইতে পারে না। ওডা মোন্ লয়, তোর দাদুর পোলা না ধুস্ ছাতা, কীযে কই, হুঁশও থাকে না।

অছিমদ্দি তখনো প্রতাপ গ্রামে আমাদের বাড়িতে আছেন। বয়স হয়েছে তথাপি ভিটে বাড়িটটা আগ্‌লে আছেন তিনি। ঘরটা অবশ্য নেই। খান সাহেবের অনুরোধে ঠাকুমা তাঁকে, আমাদের দক্ষিণের পুকুরপারের সংলগ্ন দুবিঘে ধানি জমি এবং পুকুরটার কিনারে ঘর তুলবার মত খানিক জায়গা দানপত্র করে দিয়েছিলেন। সেখানে ঘর তুলে তাঁর বাসস্থানের পত্তন করেছিলেন কিন্তু বিয়েটা

AMARBOI.COM

করেননি। বলতেন, কোথাকার কোন মাথারি আইয়া মায়-পোয়ের মইদ্যে কুচাইল চালবে। ওথে মোর দরকার নাই। আমাদের চৌচালা বাড়িটা গোপনে এজাজ ব্যাপারিকে জেঠামশাই বিক্রি করেছিলেন। এই নিয়েই বাবার সঙ্গে বিরোধ। সে অর্থাৎ এজাজ সেখানে বসবাস করতে পারেনি। অছিমদ্দি মামলা করেছিলেন তার নামে পরে। এজাজের কাগজপত্র ঠিকঠাক ছিল না। সেটাও জেঠামশাইয়ের মোক্তারি বুদ্ধির প্যাচ্। যাতে এপারে এসে কাঁদুনি গাইতে পারেন যে মোছলমানের অইত্যাচারে সব ছাড়ইয়া ছুড়ইয়া, এক কাপড়ে চল্ইয়া আইছি।' পঞ্চাশের দাঙ্গার সময়ের অনেক পরিবার এরকম চাতুরি করে, এখানে যে কিছু বাড়তি সুবিধা করতে পেরেছিল, জেঠামশাই তা জানতেন। এজাজ শুধু ঘরটা বিক্রি করতে পেরেছিল। ভিতটা এবং সংলগ্ন খানাবাড়ির জমি পড়েছিল একটা শ্মশানের চিতার মত। সেটা, তখন, প্রথমে শত্রুর সম্পত্তি, পরে অর্পিত সম্পত্তি হয়ে এখন অছিমদ্দির দখলেই। এসব কথা জানা গেছে ১৯৭৩ সালে যখন তিনি প্রথমবার ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করতে এদেশে এলেন, তাঁর কাছ থেকেই। এসবও আমার শোনা কথা।

আমার জন্ম ১৯৭৮ সালে। একটু বড় হয়ে যখন ইস্কুলে পড়ি, তখন দেখতাম ঠাকুমার কাছে অছিমদ্দির চিঠি পত্তর আসত। আমি তাঁর কথন মারফত উত্তরও লিখে দিতাম। তখনও আমি তাঁকে দেখিনি।

সেইসব চিঠিপত্র বড় অদ্ভুত। ঠাকুমার বয়ানে যে চিঠি আমি লিখে দিতাম, তাতে যে কত খোঁজ খবর তাঁর জানার থাকত, তার আর ইয়ত্তা নেই। ততদিনে ঠাকুমার ফেলে আসা গাছ-পালা হয়ত স্বাভাবিকভাবেই পড়ে, মরে বা অন্যভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু ঠাকুমার কাছে তারা তেমনটিই রয়ে গিয়েছে, যেমনটি তিনি দেখে এবং রেখে এসেছিলেন। পুকুর, ডোবা, নালা, খাল, মাঠ, ঘরের পিছনের ঝোপ-ঝাড়গুলোর মধ্যের পাতি শিয়াল বা খটাসের গর্ত, তার একধারের বন বাঁটালির ঝোপ, অন্যধারের শটিবন। তাদের আশপাশের খানা খন্দে ডাহুক, গোসাপ, পুকুর কিনারের ভাট ফুলের জঙ্গল, কচুবনে শজারুর নৈশ অভিযানের ঝম্‌ঝম্ শব্দ, গরু ঘরের পোতার পিছনে কোনো একটা বুড়ো দাঁড়াস সাপ, পিছনের ধানক্ষেতের ওপর ওড়া কুড়ইল পাখি, কোনো কিছুর বিষয়েই খোঁজ নেওয়ার ত্রুটি থাকতনা তাঁর। উত্তরে অছিমদ্দি জেঠাও তার অনুপুঙ্খ খবর জানাতেন। বাবা বলতেন, হ অইছে যেমন তুমি, তেমন তোমার ধম্ম পোলা

BanglaBook.org

অছিমদ্দি দাদা। ঐসব আর এহন আগের ল্যাহান আছে নাকি? ঠাকুমা এখনও বাবার এরকম বেখাপ্পা বেয়াদপ এবং অলক্ষুণে প্রশ্নের উত্তর দেন, থকপেনা ক্যান্? আমি যদি থাকি, হ্যারগা মারে কেডা? হ্যারগো থাহনের তো কোনো বাদা নাই। নাকি হেয়ার মইদ্যেও হিন্দু মুসমলনি কাজইয়া শুরু অইছে? অইতেও পারে, কওনতো যায় না।

অছিমদ্দি জেঠা দ্বিতীয় এবং সর্বশেষ আসেন ১৯৯৬ সালে। তখন বৃদ্ধ। ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরে সেকি আকুল কান্না তাঁর। রাঙ্গামা মোর দুই খান হাউস, তুমি রাখবা কও? ঠাকুমা জিজ্ঞেষ করলেন কী হাউসরে? না, মুই এবার আজমীর শরীফ আশন তীখে যামু বলইয়া আইছেলাম। হেয়াতো সারইয়া আইছি। এহন ভাইডিরে কওছেন তুমি মোর লগে একবার, খালি একবার, মাইনে এই বারই কয়েক দিনের লইগ্যা বাড়ি যাবা। আমি নিজে আবার তোমারে এহানেই পৌঁছাইয়া দিয়া যামু। হ নিজে। মুই জানি বাড়ির লইগ্যা, দ্যাশের লইগ্যা তোমার মন পোড়ে। এই একখান হাউস, আর একখান হাউস অইলে এই মোচাডা, এডা তোমারে নেতেই অইবে। এডা তোমাগো হকের পাওনা। মোর এই দুইডা হাউস যুদি না পুরা করো তো মুই এই খামি দেলাম, এহান থিহা আর লড়মু না। বললেন বটে 'মোচাডা', কিন্তু দিলেন দুটি 'মোচা'। ঠাকুমা ত্বরিৎ তার একটি লুকিয়ে ফেললেন। কী আছে ঐ মোচাডায়? ঠাকুমা প্রশ্ন করেছিলেন। -দশ হাজার ট্যাহা। যুদি জিগাও কীসের ট্যাহা, তো মুই ছাপ হিসাব দিমু, বাড়ি সন্নিকটস্থ জমির ফসলাদির এতবছরের হিসাব বাবদ মালিকের পাওনা অয় পোনারো হাজার ট্যাহা। বাড়ির মাল কিনের ধম্ম-পালা হিসাবে আজমীর শরীফ তীখ দশ্শন করতে, না জিগাইয়া খরচা করইয়া ফ্যালাইছি পাঁচ হাজার টাহা। এই বাহি দশ হাজার টাহা ছিচরণে জমা দিলাম কয়েন, কবুল। না। কমুনা। তোরে আমি পিডামু, পিছা মারমু। লক্ষীছাড়া কুপুত্তুর, তোরে আমি মা অইয়া ভাসাইয়া দিয়া আইলাম, আর তুই আমারে ছাই-ছাতা টাহার হিসাব দেতে আইছ? —বলে ঠাকুমা তাকে জড়িয়ে ধরে হেঁসকি দিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন, তিনিও। বাবা এইসব দেখে নিজেও আর সামলাতে না পেরে, পাশের ঘরে গিয়ে ডাক ছেড়ে বলতে থাকলেন, ও দাদা দেইখ্যা যাও, তুমি নিজের মায়ের প্যাডের ভাই আইয়া যে পয়সার লোভে আমাগো তেয়াগ দিলা, হেই পয়সারে অছিমদ্দি দাদা কত তুইচ্ছ করইয়া, এতদূরের পথ পাড়ি দিয়া এহানে দেওনের লইগ্যা আইছে।

BanglaBook.org

জেঠামশাই, আমি দেশ বা দেশের মানুষ বলতে পরিবারের নিজেদের এই কয়জন, অছিমদ্দি জেঠা আর এই অঞ্চলে এসে ছিটকে পড়া দু'চারজনকে মাত্র দেখেছি। আমার কোনো পূর্ব স্মৃতি এ ব্যাপারে নেই। এই ঘটনাটিকে আমার মনে হতেই পারত বাঙালদের আবেগোচ্ছল অতিনাটকীয়তা। যেমন সবাই পশ্চিমবঙ্গে বলে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, তা হয়নি আমার। হৃদয়ের পথ বোধহয় এরকমই সরল রৈখিক গতিতে এক বুক থেকে অন্য বুকে সঞ্চারিত হয়। তবে এও বুঝলাম যে সেজন্য উপযুক্ত মাটিতে পুরুষানুক্রমের বসবাস চাই ও বেড়ে ওঠা চাই, চাই সেই মাটির নিজস্ব সরসতায় ভরপুর সব বুক। যা সর্বকালেই খুব দুর্লভ।

অছিমদ্দি চাচার একটি আকৈশোর আকাঙ্ক্ষার কথা ঠাকুমা জানতেন। সে মক্কা যাবে হজ করতে। হাজি হবে সে। গ্রামে সবাই বলবে তাকে আলহজ্জ অছিমদ্দি বিশ্বাস। জিজ্ঞেস করেছিলেন, আজমীর শরিফ গেলি, হজ করতে যাবিনা? হেইডাইতো, ঐ তোরা য্যারে কও আসল ছওয়াব। ওরেড্ডাহাতি। এক লাখ ট্যাহা লাগবে, পামু কই? হেয়া মোর পেরথম খাইছটা যুদি তুমি পুরা করতা, হেলেও তো একই ছওয়াব্ অইতে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়সাল্লাম কইছেন, বেহেস্ত মায়ের পায়ের সামনে। হজের ছওয়াবতো হেহানে তুইচ্ছ।

ব:, তুইতো শাস্তরাদি ভালই শেখছ। এতো জানলি ক্যামনে। খালি মুছল্লিগো লেকচার শুন্ইয়া? প্যাডে বিদ্যাতো কিছুই দিতে পারি নাই।

না। হেয়তো তোমারে কওয়াই অয় নায়। অইছে কী, তোমরা আওনের পর, পেরতাপের কয়েকজন হিন্দু মোছলমান গুড়াগাড়ারে লইয়া শীরযুগের মাষ্টের ফণী দেউরি এট্টা নৈশ বিদ্যালয় হরছেলে। বছর চাইর পাচ চলছে। মুক্তি যুইদ্দের সোমায় হ্যারগো তো বেয়াকরে গুল্লি দেছেলে রাজাপুরের শান্তি কমিটির আজরাইলেরা, ফণী দেউরিরে সহ এক লগে। তারপর আর চলে নায় হেয়া। তো হেই নৈশ বিদ্যালয়ে ছেষট্টি সন থিহা উনসত্তের সন পজ্জন্ত পড়ছিলাম ফণী মাস্টেরের ধারে। হেই সোমায় যা শিখছি, হেথেই মোর কাম চলে। এট্টা ভাল কাম করতে আছেলে মানুষগুলা। দেলে হ্যারগো শ্যাষ করইয়া। ফণীতো তোর ভাইডির লগে পেরাইমারি ইস্কুলেরও মাস্টের আছেলে। বয়সে অর থিকা অনেকটাই ছোড। এস. এস. সি. পাশ করইয়া আর পড়তে পারলে না। কী ভালই না আছেলে পোলাডা, আহা। হ্যারেও মারইয়া ফ্যালাইলে?

BanglaBook.org

হ। তয় হে কিন্তু পেরাইমারিতে মাস্টেরগিরি করতে করতেই বি. এ তামাইত পাশ করছেলে। আরও পাশ দেওয়ার হাউস আছেলে। ঊনসত্তেরের গোলমালে ঢাকা ছাড়ইয়া গেরামে আইলে। ভাবছেলে গোলমাল শ্যাষ অইলে, আবার ঢাকা যাইয়া এম. এডা শ্যাষ করইয়া ফ্যালাইবে। কিন্তু ঊনসত্তেরের গোলমালে জড়াইয়া, হেই ক্যাচাল কাডাইতে না কাডাইতে, আইয়া পড়লে সত্তের সনের ভোড, আর হ্যার পর তো জানোই। কেরমে কেরমে কীসব অইলে। তয় ফণীদেউরি বয়সে মোর ছোড অইলেও, মোর ওস্তাদতো। মুই যে এহন দুপাতা পড়তে হিক্‌ছি হেয়াতো হ্যারই মেহেরবানিতে, না কী কও? তয় মোগো ওহানের মুক্তি ফৌজের পোলাপানেরা যহন সুবিদা পাইলে খানিক, ঐ শান্তি কমিটির ব্যাক কয়ডারে একলগে বান্‌ধ্‌ইয়া, তিনডা বড় বড় মট্‌কির মইদ্যে ঢুহাইয়া, হেগুলা বোমা মারইয়া উড়াইয়া দেছেলে। বেয়াক কয়ডা একলগে জাহন্নামে।

অছিমদ্দি জেঠার কাছে সেবার মুক্তিযুদ্ধের অনেক খবর জানতে পেরেছিলাম। ঠাকুমা কিন্তু, যারা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে তাদের মৃত্যুতে যেমন হায় হায় করছিলেন, তেমনি, একইভাবে পরিচিত কেউ বা তাদের ছেলেদের যারা শান্তি কমিটি বা রাজাকারদের দলে যোগ দিয়েছিল এবং মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে মরেছিল, তাদের জন্যেও ব্যথিত হয়েছিলেন। 'আহা, রমজানইয়ারেও মারছে? ও বোধায় ভুল করইয়া, বা প্যাডের দায়ে রাজাকারেগো খাতায় নাম ল্যাহাইছেলে।' এরকম অনেকের নাম ধরেই ঠাকুমা দুঃখ করেছিলেন। যেন উভয় দলের ছেলেরাই তাঁর পোলাপান।

জেঠা এরপর তাঁর আসল আরজি, অর্থাৎ ঠাকুমাকে দেশে নিয়ে যাবার প্রসঙ্গটি ফের তুললে, বাবা বলছিলেন, অছিমদ্দি দাদা, মায়ের বয়স এহন আশি, একাশি। স্বাস্থ্য অবশ্য ভালই আছে, তয় এই বয়সে কী অদ্দুর যাওনের ধকল সামলাইতে পারবে?

মুই অছিতো? রাঙ্গামায় কয় কী? আছোতো দেহি টরটরইয়া।

বডারের কাছাকাছি থাকেল হয়তো কইতাম, ল' যাই, কিন্তু এ্যাদ্দুর থিকা ভস্‌সা হয় না। যাওনের হাউসতো আছেই। রোজই তো সপ্‌প্‌ন দেহি জানো?

অছিমদ্দি জেঠা ঠাকুরমার উত্তর শুনে খুশি হলেন না। মুখ গোঁজ করে বসে রইলেন। ঠাকুমা বললেন সাদ অয়না, কও কী? কিন্তু করমু কী ক'? পেরাণ তো

BanglaBook.org

পোড়েই। আহা, কত কথা যে মনে পড়ে। আমাগো আওয়ার দিনের তোর হেই কান্দন কী আমি এ জীবনে ভুলমু? ওরে, লোকাচার, দ্যাশাচারে দোষ ঘাড আমাগো দুই জাইতের মইদ্যেই আছে, তমো তো বুকের মইদ্যে দলা পাকায় কী যেন এট্টা, হেইডাই তো আসল বস্তু। আচার-বিচার নিয়ম বিদি তো আমরা কেউ বানাই নাই। ওয়া চল্ইয়া আইছে যুগ যুগ ধরইয়া। কোনোদিন চিন্তা করি নাই ওসব ভাল না মন্দ। সোমাজের মাথারা কেউতো কিছু শেখায় নায়। খালি ঐসব কুট্লামিতেই বাতাস দিছে। হ্যাষেতো আলাদাই করইয়া দেলে। সাদ আছেলে তোরে বিয়া দিয়া ঘরস্থ করইয়া দিমু। হারামজাদা হরইয়ার কুচককরে হেডা পারলাম না। তুইও নিজে কিছু করলি না। এয়ার ব্যাক কিছুর লইগ্যা দায়ি অইলে গান্ধি রাজা, জহর মন্ত্রী আর জিন্না নবাব। বেয়াক কয়ডাই শয়তাদের আডি। আমাগো কেউ কিছু জিগাইলেই না। এজাজ, হরইয়াও য্যান হ্যারগোই আওলাদ। ঠাকুমা কিছুতেই এঁদের উপর তাঁর অবিশ্বাস যেন ভুলতেই পারেন না।

অছিমদ্দি জেঠার মধ্যেও যেন ঠাকুমার বিষাদের ছোঁয়া লেগে গিয়েছিল। বললেন, এহনও বেয়াকে, হেইরহমই। কেউ জিগায় না কিছু। বাংলা দ্যাশ অইলে, সাদিনতা অইলে, মোরা ভাবছেলাম, অন্তত পাচপোট টাচপোটগুলার ঝামেলাডা উড্ইয়া গ্যালে, আওন যাওনের মইদ্যে মোরা এ্যাটটু সুখ শান্তি, সোয়াস্তি পামু। হেডাও অইলেনা। এহন তো মোরও বয়স অইছে, মুই যে তোমার ধম্ম পোলা, মোরও তো চুল দাড়ি দ্যাহ পেরায় বেয়াকই ধলা। মৌতের চিন্তা আইয়া পড়ছে। এই যে আইলাম, দ্যাখ্লাম, আর হেডা পারমু কীনা, আল্লায় জানে। যুদি বাচইয়া থাহি সামনের অগ্গেরানে আবার হয়তো আমু, না আইলে বোঝবা মুই নাই। না থাহনডা তো ওহানে এহন নিত্য ব্যাপার।

ধুর বল্দা, মায়ের ধারে ও ই রহম কথা কও, হুস্ নাই। তুই মরবি কিয়া, বালাই। তুইও মরবি না, মুইও শিগ্গীর যে ওপারে যামু এমন বাসি না। আমি কই কি, তোগো মইদ্যে তো এ বয়সে বিয়া সাদি করেই, তুই যাইয়া এবার এ্যাট্টা বিয়া সাদি কর, বড়োসড়ো এউক্কা মাইয়া দেইখ্যা। আমি শুন্ইয়াও সুখ পামু হ্যানে। জানমু, আমাগো পেরতাপের বাড়িতে এহনও গুড়া গাড়া দৌড়াদৌড়ি করে। সয়ন্ধ্যায় বাত্তি জ্বলে, নয়তো আজান পড়ে। ঠাকুমা যেন স্বপ্নালু হয়ে যান।

শ্যাম ভাইডি যুদি তোমারে লইয়া যায়, ব্যাক খরচা মোর। বিয়াডাও করইয়া ফালামু হ্যানে ইন্সাল্লা। তয় রাঙ্গামা, তোমারে হয়ত্য কই, দ্যাশে এত শত্তুর,

BanglaBook.org

কহন কী যে অয় জানি না। নানান ক্যাচাল তো আছেই হেয়া ছাড়া জমি ওদ্যাশে বড় শত্তুর বিয়ায়। যে জমি এতকাল জিন্দা রাখছে হেই জমিই এহন মৌতের কারণ অইছে।

জেঠামশাই, আমি রাষ্ট্রনীতির শিক্ষকতা করি। কিন্তু সেসব পুথি পুস্তকের দৌলতে। আমার মত মানুষের কাছে ঠাকুমা বা অছিমদ্দি জেঠারা আজও অশিক্ষিতপ্রায় পল্লীবাসী কূপমণ্ডুক। কিন্তু তাঁদের আলোচনা শুনে মনে হলো, এঁদের কাছেও আমাদের অনেক পাঠ নেওয়ার আছে। এঁদেরও যেন এক রাষ্ট্রচিন্তা, দেশভাবনা, কল্যাণচিন্তা আছে। সেসব আমাদের জানা, বোঝা অনেক আগে থেকেই উচিত ছিল। বড়ো বড়ো রাষ্ট্র পুরুষদের মত, আমরাও তা জানার প্রয়াস করিনি এবং এখনও তুচ্ছই করি। আমাদের বোধহয় এদের কাছে নতজানু হয়ে অনেক কিছু শেখার আছে।

।। দুই ।।

জেঠামশায়, চিঠিটা দুভাগে লিখতে হলো। কারণ, নইলে সবকথা একসঙ্গে বলতে গেলে আউল ঝাউল বেঁধে যাচ্ছে। অপনাকে ঠাকুমার যে কথাগুলো শোনালাম, তা আগের কথা। বর্তমানে তাঁর যা অবস্থা, সেসব আগের কথার দশ এগারো বছর পরের। শুরুতে যে কথা নিয়ে শুরু করেছিলাম, এ অংশে তারই বিস্তৃত কথনটি বলার ইচ্ছে। সুখের কথা এই যে, বর্তমানে শয্যাশায়ী হলেও ঠাকুমা আজও আমাদের মধ্যে আছেন। বয়স ৯৩। সেনালিটি বা ভীমরতি যাকে বলে, তার প্রকোপ খুব একটা কম নয়, অথবা যেটা এখন তাঁর মধ্যে দেখা যাচ্ছে সেটা সেনিলিটি, না অনিচ্ছায় দেশ ছাড়ার জন্য যে আক্ষেপটা সারাজীবন তাঁকে বয়ে বেড়াতে হয়েছে, যা তাকে কুড়েকুড়ে খেয়েছে, তার জন্য একটা অবুঝ জিদ, সেটা সবসময় বুঝে উঠতে পারছি না।

অছিমদ্দি জেঠা চলে যাওয়ার পরের বছর নির্ধারিত সময়ে আর আসেননি। অঘ্রাণ গেল ,পৌষ গেল এবং মাঘ মাসও যখন পার হলো, ঠাকুমা এক রাতে ঘুমের মধ্যে জোর কেঁদে উঠলেন। ঘুম ভাঙতে তাঁর কান্না আর থামে না। আমি ছোটবেলা থেকে, বিশেষ করে, বোনের জন্মের পর থেকেই তাঁর সঙ্গে ঘুমোই। আমি যত জিজ্ঞেস করি ও ঠাকুমা, কী হোল, কাঁদছো কেন? তিনি শুধু বলেন,

BanglaBook.org

আমি বাড়ি যামু। অছইয়া ডাকতে আছে। বুঝলাম, বুড়ি দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু সেই থেকে মাঝে মাঝেই তাঁর আব্দার, বাড়ি যামু। অছইয়া ইস্টিমার ঘাডে নাও লইয়া বইয়া আছে, আমার বাড়ি লইয়া যাইবে।

এর কিছুদিন পর বাবা গ্রামের পরিচিত একজনের কাছে চিঠি লেখেন, অছিমদ্দি জেঠার খবর জানার জন্য। মাস দেড়েক বাদে একটা বেয়ারিং চিঠি মারফত জানতে পারেন যে অছিমদ্দি জেঠা সে বছর এখান থেকে ফিরে যাবার মাস তিনেকের মধ্যেই ডাকাতদের হাতে খুন হন। ডাকাতিটা করিয়েছিল নাকি সেই এজাজ গুণ্ডা।, কারণ আমাদের প্রতাপ গ্রামের সম্পত্তি দখল নিয়ে অছিমদ্দি জেঠার উপর তার পুরানো আক্রোশ। সে গ্রেপ্তারও হয়েছে, হয়ত তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডই হবে অথবা ফাঁসি। তার বিরুদ্ধে আরও মারাত্মক সব অভিযোগও নাকি পুলিশের কাছে আছে। সে নাকি সন্ত্রাসীদের নিয়মিত মদত দেয় এবং আরো অনেক কিছু। তার বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র বেশ কিছু পাওয়া গেছে এবং ওখানকার আরো কয়েকজন লোকও ধরা পড়েছে। এই খবর শোনার পর থেকে ঠাকুমা শয্যা নিলেন। সেই থেকেএখনও তিনি শয্যাশায়ী। প্রথম কিছুকাল তিনি উঠে বসতেন টসতেন। এখন আর ওঠেনই না। অনর্গল এক্ইরকমের কথা বক্‌বক্ করেন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। অছিমদ্দি জেঠাকে চিঠি লিখতে বলেন বাবাকে। তিনি যে নেই, সেখথা বিশ্বাস করেন না। বলেন, অছইয়ারে লেইখ্যা দে, ওদ্যাশে থাহনের দরকার নাই। এইহানে চল্‌ইয়া আউক। এহানে কী শ্যাহেরা থাহেনা আবার কখনো কাঁদতে থাকেন, বাড়ি যামু। হেইতো কতোদিন অইয়া গেছে বাড়ি ছাড়া। কদ্দিন আর বিদ্যাশে থাকে মাইন্‌সে? ধান পান ওডার সোমায় আইছে। ধানঘরে, নবান্ন, পৌষ সংক্রান্তি, সোংসারে কত কাজ। গুরুগুলারে কতদিন দেহিনা, কোন্‌ডা আছে, কোনডা নাই, রবিশইস্যের সোমায় এহন। তিলের খ্যাত্‌টা এবার এটটু বাড়ান লাগে। ছোড অইয়া তোরা বিয়াথা করলি। হ্যার কথা কেউ ভাবলি না। আমিও এ্যামন মা, যে মায়ের কওব্যড্রও করলাম না। খান সাহেব থাকলে এমন অইতে না। অনর্গল এইরকম যখন চলছে, তখন আপনার বইখানা আমি প্রথম পড়লাম। বাবা কী করে যেন এক কপি জোগাড় করেছিলেন। নিজে আগে পড়লেন, পরে আমায় বললেন, পড়ইয়া দ্যাখ, আমাগো আমাগো দ্যাশের কথা, মায়রে এট্‌টু পড়ইয়া শোনা।

BanglaBook.org

মরার সোমায় মনে এট্টু শান্তি পাইবে।পারলে রোজ, না অয়, আমিই শোনামু হ্যানে। আহা! এয়াতো একছের আমাগো পুরানো কথা।

বাবার দেশের জন্য একটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর জায়গা আছে, যেটা আমার থাকার কথা নয়। তথাপি, আপনার বইখানা শুনে এবং পড়ে, আমিও যেন ঠাকুমার মত কেমন দিশাহারা হয়ে যাই। ঐ জায়গাটায় তাহলে আমার শিকড়? ঠাকুমার ইদানিং যা ভাব দেখছি, তাতে তাকে সেনিলিটি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বক্ বক্ করেই যাচ্ছেন। বাড়ি যামু। আমি মরলে খালডার পাড়ের আমগাছটার তলায় আমারে পোড়াবি। ওইহানেই তো চৈদ্দ পুরুষের চিতা। তোগো বাপ ঠাহুরদার লগে ওহানেই আমারে একটু জাগা করইয়া দিস । শুধু বইখানা পড়ে শোনানোর সময় চুপ করে শোনেন আর চোখের জলে বালিশ ভিজান। তবু অস্থিরতা তেমন থাকে না। মাঝে মাঝে হেচ্কি তুলে কাঁদেন।আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ঠাকুমা তুমিতো উঠতেই পারনা, এতদূর থেকে কীভাবে যাবে? ঠাকুমার উত্তর, ও বইথেতো বেয়াক পথঘাট রাস্তার খবর হে ছ্যাম্ড়া দিছে। খালি ইস্টিমারের সারেংরে কবি যে, মোর ঠাহুমায় বুড়া মানুষ, অথব্ব, 'পাকমরের' ঘাড়ে এটটু বেশি সোমায় যেন দাঁড়ায়। ফ্লোরিকান জাহাজের বাট্লারে তোর দাদুরে চেনে। হ্যার রান্দন অবইশ্য আমি খামুনা।

আজ কদিন ধরে দেখছি ভোরবেলা উঠে আপনার বইএ উদ্ধৃত মাঘমণ্ডলের ছড়াগুলো গাইছেন। ঠাকুমা অবিশ্যি মাঘমণ্ডল বলেন না। বলেন, 'মাঘুগুল।' বলেন, এট্টা মন্তোরও আছে, মাঘুগুল, মাঘুগুল সোনার কুণ্ডল...এইসব। হেয়া ল্যাহে নায়?' বলেই আবার গান জুড়ে দেন, 'পলাশ ফুলে দিলাম বারি, ফুল পইড়াছে সারি সারি, ডাল পইড়াছে নইয়া আ আ-কোথায় যাও মালীর ছাওয়াল পুষ্পের সাজু লইয়া । ডাল ভেঙোনো, ডাল ভেঙোনা ডালে, চইড়ে যাব। সোনার ডালি হাতে কইরে ফুল তুলাতে যাব। ও শ্যাম, বাবা আমি বাড়ি যামু। আমারে এটটু বাড়ি দিয়াহ। আমি ডালে 'চইড়ে' বাড়ি যাব। বাবা এইসব শোনেন, আর কাঁদেন। বলেন, ও মা, এতদূরের পথ, কী করইয়া তোমারে লইয়া যাই, কও? ওরহম করইও না।

ক্যান্, কী এমন পথ? অছইয়া আছে না? হ্যারে ডাক। হে অইয়া হ্যানে আমারে কোলে করইয়া নৌকায় উডাইয়া দেবে। নাইলে, ঐ ছ্যামড়ারডে জিগা, হে জানে।

জেঠামশাই। বাবা, ঠাকুমার মুখে দেশের বাড়ির কথায় নৌকা, স্টিমারের গল্প ঢের শুনেছি:। কিন্তু সেখানে রিক্সার উল্লেখ কখনো শুনিনি। ঠাকুমা এখন

BanglaBook.org

বলছেন তিনি রিক্সয় নদীর ঘাটে গিয়ে নৌকোয় উঠবেন। কীরকম যেন সব তাঁর এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। রিক্স ব্যাপারটা বোধহয় মাথায় ঢুকেছে আপনার আরেকটা বই-এর কল্যাণে। সেখানে তো আপনি জানিয়েছেন বন্দর শহর থেকে কাঁচা বড় রাস্তাটা, যেটা গ্রামের দিকে গেছে, সেটা এখন অ্যাসসল্টের হয়েছে, রিকশ, অটো এইসব চলে। সে বইটাও তিনি শুনেছেন। তবে ক্রমশ দেখছি, রিক্সাটা, পলাশের ডালটা, কিছুদিন বাতিক থাকার পর, তাদের গঠনটা ক্রমশ নৌকোর আকৃতি পাচ্ছে। এখন শুধু বলেন, এইতো, অছ্ইয়া আড়উয়া কোলে করইয়া আমারে নৌকায় শোয়ইয়া দিলেই পের তাপের খাল ধরইয়া একছের ছাইচের পুইইরের ঘাড তামাইত পছমু হ্যাসে। বুঝুন অবস্থা, কবে কোন কালে প্রতাপ নামের গ্রামে একটা নালা খাল ছিল যা ধরে বাড়ির পিছনের পুকুর অবধি যাওয়া যেত, সেটা এখনও বুড়ির বাড়ি যাওয়ার পথ। সে পথটি ভুলছেন না। কিন্তু স্টিমারের কথা, বড় নদী খালের কথা, এই বিলাস পুরের অস্তিত্ব কিছুই আর স্মরণে আসছে না। রাস্তা ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে একটা সরু খাল হয়ে গেছে। যে কথাটি ভুলছেন না কখনো, তা হলো, 'বাড়ি যামু।'

বাবা এখনও আপনার বইটি পড়ে তাঁকে শোনান। ওটা দৈনন্দিন ব্যাপার। শোনেন হয়ত কিছু কিছু। হয়ত বোঝেনও, নয়তো মাঝে মাঝে প্রশ্ন তোলেন কী করে - ও শ্যাম, ঐ ছ্যামড়ার জেডায়ও কী হরইয়ার ল্যাহান? আহারে, ওর তো দেহি দ্যাশের লইগ্যা পেরাণডা মোরই ল্যাহান পোড়ে। তয়, ও আইলে কিয়া? কিন্তু শ্যাম, ও তো এহনও নাকি ওহানে যায়। তয় অরে একবার ডাক এহানে। আমি হ্যার হাত দুইডা ধরইয়া কমু, ও ছ্যামড়া, তুমি আমারে এটটু পৌঁছাইয়া দেবা? হে, দেখফি, না কইতে পারবে না। আমি যখন পড়ে শোনাই, ঐ একইভাবে বলেন, বইহান পড়থে বওনের আগে মোর হাতে দুগাছ দুব্বা দে, বত্তের কথা শোনতে দুব্বা লইয়া বইতে অয়।

জেঠামশায়। আমার মনে হয়, আপনার বইখানার এর চাইতে বড় সমঝদার পাঠক আর কেউ নেই। আপনার পক্ষে কী বিলাসপুরে একবার আসা সম্ভব? তাহলে মাস খানেকের মধ্যে একবার আসুন। ঠাকুমা বোধহয় আর বেশিদিন নেই। আপনাকে দেখলে তাঁর বাড়ি যাওয়ার সাধ হয়ত খানিকটা মিটবে। নিবেদন ইতি, সুরঞ্জন পাহিদাস।

BanglaBook.org

উপসংহার

আমার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এখনও বিলাসপুর গিয়ে উঠতে পারিনি। জানিনা, সেই বৃদ্ধা ঠাকুমা, যিনি, আমাকে স্নেহভরে ছ্যাম্‌ড়া', বলে অভিহিত করেছেন এবং আমাকে তাঁর দেশের বাড়িতে পৌঁছে দেবার আদেশ করেছেন, আজও অপেক্ষায় আছেন কিনা, অথবা যে দেশে গেলে সব দেশে যাওয়ার সখ বা সাধ পূর্ণ হয়, সেখানেই পাড়ি দিয়েছেন কী না। শুধু জানি, তাঁর ঐ সাধারণ ইচ্ছাটুকুও পূরণ করার ক্ষমতা আমার নেই। যাঁদের সেই ক্ষমতা আছে, তাঁদের কানে এরকম লক্ষ ঠাকুমার কাতর আব্দার পৌঁছলেও, তাঁদের তাতে ভ্রূক্ষেপ করার সময় নেই, বা যে নিয়মের নিগড়ে তাঁরা আবদ্ধ, সেই নিয়মের বাধকতা ডিঙিয়ে তাঁরা তা করতেও পারবেন না। যদি কেউ তা পারতেন, তিনি তাঁর 'ধম্মপোলা' অছিমদ্দি, অছইয়া। কিন্তু তিনি তো তাঁর রাঙ্গামাকে জানিয়েই গিয়েছিলেন 'যুদি বাচইয়া থাহি', সামনের অগ্‌গেরাণে আবার আমু, না আইলে বোঝবা মুই নাই।' কেন? কারণ জমি ওদ্যাশে বড় শত্তুর বিয়ায়। আসলে, জমি পৃথিবীর সর্বদেশেইতো 'শত্তুর বিয়ায়', একথার আর ব্যতায় কী? ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়েও তো তা-ই জেনেছি।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সুরঞ্জন জানিয়েছিল অছিমদ্দি 'মোচা' দিয়েছিলেন সেবারে দুইটি। একটি তার মধ্যে ছোট। কিছু না বলে, ঠাকুমা সেটির বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ না করেই চট্‌জলদি তা বালিশের নিচে চালান করে দিয়েছিলেন। শুধু অছিমদ্দিকে পিঠে মাথায় বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করতে করতে এবং কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন তুই সয়ত্যই আমার বড় পোলা। জ্যাষ্ঠপুত্র। জ্যাষ্ঠপুত্রের কামডা তুইই করলি। এ্যারগো দিয়া আইতে না এয়া। কিন্তু বস্তুটি যে কী তা ঠাকুমা কিছুতেই বলেন নি। যেন সে তাঁর অতি গোপন কথা।

পরে একদিন, তখনও ঠাকুমা চলক্ষম, বাথরুমে গেলে সুরঞ্জন বালিশের তলা থেকে মোচাটি বার করে খুলে দেখেছিল। তার মধ্যে ছিল কিছু ছাই, খানিকটা মাটি আর পোড়া কাঠকয়লা - কয়েক টুকড়ো। সঙ্গে এক টুক্‌ড়ো কাগজে অছিমদ্দি জেঠার লেখা কয়েকটি কথা 'ইহা জান্নাতবাসী কত্তা মশায়ের চিতার ছাই, মাটি ও পোড়া কয়লা। যদি আমার নিকট হইতে কোনোমতে মোচাটি হারাইয়া যায়, যে কেহ তাহা পাইবেন, নিচের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে আল্লাই তাহাকে পরকালে এবং ইহকালে পুরস্কৃত করিবেন।' এইলেখাটির নিচে ঠাকুমা লিখে রেখেছেন, আমি মরিলে তোমরা আমার চিতার ছাই, কয়লার সহিত ইহা মিলাইয়া দিবা। ইহাই আমার দেশে ফেরার তুল্য হইবে।' লেখাটা ঠাকুমার সুস্থ অবস্থার সময়ের। সুরঞ্জন বলেছিল, তিনি বুঝতে পেরেছেন কিনা জানি না। আমি বলেছি, তোমার এই ইচ্ছাটা আমি পূরণ করব।

BanglaBook.org

আপ্যাচ্‌লা প্যানা-প্রেমের গল্প বিষয়ক

হুঁশিয়ার, হুঁণিয়ার লেখকেরা পাঠকদের বয়স বিবেচনা করে গল্প ফাঁদেন। এই কায়দাটার ফায়দা মেলা। তাঁরা আগেভাগে সম্ভাব্য পাঠকদের বয়স বিভাগ করে বিষয় নির্বাচন করেন। তারপর লঘু, লঘুতর, লঘুতম লেখাগুলি লিখে যান। সুকোমলমতি পাঠক, যারা প্রকৃত গপ্পোখোর, তাঁদের জন্য লেখার নানারকম উপকারিতা। প্রথমত এবং প্রধান যেটা তা হলো, এই ক্ষেত্রে লেখক বয়সের দিক থেকে ঐ একটা জায়গাই চির সবুজের মোড়কটি হয়ে গ্যাঁট মেরে থাকতে পারেন। দ্বিতীয়, জুৎসই একটা চরিত্র একবার চেষ্টা চরিত্তির করে খাড়া করতে পারলে আর দেখে কে? সিরিজে সিরিজ, পয়সায় পয়সা, খ্যাতিতে খ্যাতি, সে এক সর্বার্থ সাধক প্রকল্প। ব্যাপারটা এদানি টিভি, কম্প্যুটার ইত্যাদির দৌলতে খানিক মার খাচ্ছে বটে, তবে আরো কিছুকাল চলবে। সাধারণত, সদ্য বয়োসন্ধি পেরোনো পাঠকেরা এবং যাঁরা জীবনে কখনোই এই বয়সটা পেরোবেন না বলে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসে আছেন, তাঁরাই এইসব গল্পের গ্রাহক। এই কারণেই শিশুদের, কিশোরদের, পৌগণ্ড প্রাপ্তদের এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য হুঁশিয়ার লেখকেরা আলাদা আলাদা বন্দোবস্তের কথা মাথার ঘিলুতে দীর্ঘদিন খেলিয়ে তবে কলম ধরেন। তারমধ্যে মধ্যপর্ব, অর্থাৎ প্রেম বিষয়টাই প্রধান। মধ্যপর্ব বলছি বটে, আসলে এটিই সর্ববয়সের জন্য সাতরাজার ধন একমাণিক্য, শ্রেষ্ঠপর্ব। এটাই চিত্তায় ওঠার আগে পর্যন্ত একমেবাদ্বিতীয়ম। পরের ব্যাপারটা জানা নেই। মানে ও পারের।

প্রেম, সেকস্ বা যৌনতা, অন্য অন্য শারীর মানস ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মতো একটি প্রাকৃতিক নির্বন্ধ। কিন্তু এদেশীয় পরম্পরায় যৌনতার ব্যাপারে চারিত্রিক শুদ্ধাশুদ্ধির এমন একটা নিকট সম্বন্ধ যে তা নিয়ে উনিশ শতক থেকে আমাদের আর সাবধানতার শেষ ছিল না। সত্যমিথ্যা জানি না, তবে দেবী চৌধুরাণীর ব্রজেশ্বরকে দিয়ে প্রফুল্লকে চুমু খাওয়ানোর বৃত্তান্তটি লেখার সময় নাকী বঙ্কিমকে নৈহাটি থেকে ভট্টপল্লির ঘাটে গিয়ে বেশ কয়েকবার কলমটিকে গঙ্গাস্নান করাতে হয়েছিল। উবাচ ভট্টপল্লি নিবাসী জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। সংবাদ সূত্রটি তিনি অবশ্য বলেননি। তবে একথা বলেছেন গঙ্গাস্নানার্থী তত্রস্থ বা বহিরাগত 'পোণ্

BanglaBook.org

মশাইদের' স্নান সেরে ফেরার বা যাবার পথে স্ব স্ব 'জলপাত্র'দের কুঞ্জে বিশ্রামাদি স্মার্ত, নৈয়ায়িক বা ব্যাকরণবিধির প্রতিকূল ছিল না। সেই কারণেই বোধহয় দেবভাষায় সেন্সরশিপ নেই। যে যাক। এদানি সে বাধকতা বাংলায়ও নেই। তবে বঙ্কিম বোধহয় সেখানে বিশ্রাম নেন নি। আমি ঠিক জানি না।

প্রাগুক্ত হুঁশিয়ার লেখকদের মত ও পথের অনুসারী যে আমি হতে পারিনি, তার কারণ এই নয় যে এ ব্যাপারে আমার কোনো সক্রিয় ইচ্ছে কাজ করেছিল। বিপরীতক্রমে, তাঁদের এইসব লেখা পত্তর যখন যা পড়ি, বিশেষ করে প্রেমের গল্প, ইচ্ছে হয় ঠিক অমনটি করে লিখি। কিন্তু কুঁজোকে তো চিৎ হওয়ার আগে পিঠের কথাটা স্মরণ রাখতেই হয়। সুতরাং সংবরণ করতে হয় নিজেকে। এখন ফরমায়েস মতো এটা ওটা লেখার কসরৎ করি, যা ন দেবায় ন ধর্মায়। আমার জন্ম জিলার (খুবই বিখ্যাত স্থান। পৃথিবীতে অমন আর দ্বিতীয় নেই। পাঠকেরা জানেন।) একটি পদবন্ধ আছে, যা আমার লেখার জাতি নির্ণয় সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে রেখেছি। নইলে সমালোচক, পর্যালোচকদের সমূহ অসুবিধে। 'আ-প্যাচ-প্যানা'। অর্থে বাজে প্যাচাল পারা। উদ্দেশ্য যাতে এগুলো গল্প, না উপন্যাস, না প্রবন্ধ না ভস্‌সো-ইদৃশ বর্গীকরণে কারুর অসুবিধে না ঘটে।

বড়ো কাগজ বা বাণিজ্যিক পত্রিকায় লেখা পাঠাতে সাহস হয় না। ছোট ম্যাগাজিনের মধ্যে যারা ছোটতম, তারা অনেক সময় চায় 'একটা লেখা দিন।' তাও কালে ভদ্রে। বার দুয়েক সুযোগ জুটেছিল একটা বড়ো নামী-দামী বাজারি পত্রিকায় লেখার। তার সাধ শেষ। কারণ ছিল। কারণটা গোপন। বোধহয় কর্তৃপক্ষ লেখার মান দেখে খুশি হয়নি, তবে ছেপেছিল এবং দক্ষিণা পেয়ে আমি খুশি হয়েছিলাম। তারই একটা লেখা আজকের এই লেখাটির কারণ সূত্র। বলা হয়েছিল একটি প্রেমের গল্প লিখতে হবে। এক বিট্‌লেতম অধ্যাপক লেখক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হ্যাঁরে প্রেমের গল্প কীভাবে লিখতে হয় রে? বন্ধু বহুদর্শী। সে শলা দিল, অমুক পত্রিকা যদি লিখতে বলে থাকে তাহলে দাম্‌ড়া কাল থেকে আজতক্ যতো ছুঁড়ির সঙ্গে তোর কম বেশি 'জুরভাব' হয়েছে, তাদের মধ্যে ডব্‌গা-তমাটাকে মাথায় রেখে একটা ফেঁদে ফ্যাল' তোর তো এ ব্যাপারে ব্যাপক হাতযশ, দশে বলে, মায় তোর বৌ তক্। আর যদি নির্ধারিত শব্দ সংখ্যায় কুলোয়, বরং 'তাহাদের কথা' নাম দিয়ে পুরো জমাখরচের হিসাবটা দিয়ে দে। পরে ডাঙর একখানা কিতাব লিখবি না হয়। কিন্তু নিরিমিষ্যি চলবে

না। বাঙালি আজকাল ভারি লায়েক হয়েছে। অনঙ্গ আখ্যানে অঙ্গবিহীনতা আর পছন্দ করছে না। বন্ধু পণ্ডিত এবং রসিক এবং তদুপরি পাজির পাঝাড়া। তবে নিজে চরিত্রবান হলেও অন্যকে দুশ্চরিত্তির বলে সুখ পায়। সে সুখটার স্বরূপটা অবশ্য জানা নেই। সে থাকগে, আমার চরিত্তিরটা আমার তারটা তার।

পন্ডিত, রসিক এবং পাজির পা-ঝাড়া যে বললাম এই তিন গুণের সমাহারে তিনি ঠিক যেমনটি হওয়ার কথা তেমনিটিই হয়েছেন। শলাটিও সেই মাপেরই। কিন্তু কী আর করা, বন্ধুবান্ধব, রক্ষিতাতুল্য।

তা সাত পাঁচ চিন্তা করে, মনের আনাচ কানাচ তন্ন তন্ন করেও একটা 'ফ্লেশি' ঘটনা খুঁজে পেলাম না। বন্ধু মিথ্যে বলেনি, হাতযশ ছিল। কিন্তু যেটা ছিল না, তা হলো প্রেম সম্পর্কে ধারণা। ব্যাপারটা যে কী, সেটা বুঝে উঠতে উঠতে উৎসাহ যেতো তেতো হয়ে। আমার ছিল আবার একটা মস্তো ব্যামো। কোনো মেয়ের সঙ্গে পরিচয় একটু এগোল তো তাকে চিনতে বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় চিন্তা ঢুকতো—আমি এর সঙ্গে ফ্লার্ট করছি নাতো? অর্থাৎ ভগবান মীনকেতু ভস্ম হওয়ার আগের অবস্থায় ফিরুন, এমন আকাঙ্ক্ষা আমার মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কাট্ মারতাম। বলুন, এভাবে 'ফ্লেশি' প্রেম হয়?

একবার হল কী, তখন কলেজে পড়ি, সহপাঠিনী একটি বালিকার প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হল। মাঝে মাঝে তার বাড়ি যাই। ঐ যুগে সহপাঠিনীদের বাড়ি যেতে হলেও পোক্ত অ্যালিবাই এর দরকার হত। বান্ধবী কনসেপ্ট টা হয়তো এদেশীয় যুবা যুবতীদের মধ্যে চালু হতে শুরু করলেও সড়োগড়ো হয়নি। প্রেমিকা এবং বান্ধবীর মধ্যে আজকার দিনের মতো স্পষ্ট বিভাজন ছিল না। সে কারণেই বোধহয় আজকের প্রজন্মে এই বান্ধবী মানসিকতা এবং সেটাও শিক্ষার ফল। সে সময়ে কালচারটা ছিল ভাইবোনের। মনে ভাই বোনের মতো। প্রথমে 'মতো', তারপর মাসতুতো, পিসতুতো, সেসবও 'চোরে চোরে' হওয়ার পর থেকে সরাসরি ভাইবোন। তা শাস্ত্রেতো বলাই হয়েছে তেনারা জগজ্জননীর অংশ, ওখানেইতো কভারেজ ন সিকে। এ নিয়ে একটি রগুড়ে ঘটনার পুনরুল্লেখ করছি। 'পুনরুল্লেখ' বলছি একারণে যে ঘটনাটি আগে অন্য একটি লেখায় লিখে ফেলেছিলাম বলে মনে হচ্ছে। কাণ্ডটি আমার শোনা। ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের দর্শনের বিভাগীয় প্রধান ড. গোবিন্দ দেব অকৃতদার মানুষ ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় অলিন্দে আলাপরত যুবক যুবতী কাউকে দেখলে, চলমান অধ্যাপক তাদের

BanglaBook.org

অতিক্রম করে খানিক দূরে গিয়ে মেয়েটিকে কাছে ডাকতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, কী হয়?

আজ্ঞে ভাই হয় স্যার। তিনি আবার চলতে চলতে খানিক গিয়ে, পুনর্বার দুজনকেই ডাকতেন এবং একটু গম্ভীর স্বরগ্রামে উচ্চারণ করতেন, 'এইসব ভাইবোন সম্পর্ক ভাল নয়হে'—বলে আবার চিন্তামগ্ন ভাবে চলা শুরু করতেন। হয়তো এবিষয়ে কান্ট বা হেগেল কী বলেছেন, তাই চিন্তা করতেন।

তো এটা ছিল আমাদের প্রজন্মের ট্র্যাডিশান। সেই ট্র্যাডিশান আজ অ-সামান্য অথবা বৈপ্লবিক রূপান্তরে বন্ধু-বান্ধবী হয়েছে কিনা, আমরা 'হাবড়ারা' সে বিষয়ে সতত সন্দিহান। সন্দেহের ভিন্নতর কারণও ঢের। সেসব বন্ধু এবং বান্ধবীদের সংখ্যাগত, মেলামেশাগত এবং কিছুই কিছু না, কী আছে লাইফে এরকম মানসিকতাগত নানান বাহ্য প্রকাশের মধ্যে নিহিত। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে, কারণ একটাই, সেটা রক্ষণশীলতা বা নিহিত স্বার্থের প্রতি সর্বকালের সর্ব সমাজের মোহ। মৌল-ব্যাপারগুলো আমাদের পিতৃপুরুষের কাল থেকে যেমন চলে আসছিল, এখনো তেমনিই আছে। শুধু একেক প্রজন্মে তার ধরণটা পাল্টাচ্ছে। এটা স্থিতাবস্থায় স্থিত হলে যে প্রজন্ম নিহিতস্বার্থী হয়, তখন তাদের ভুগতে হয়। আজকে যারা এটা নিয়ে প্রাক্ প্রজন্মকে ব্যঙ্গে বিদ্ধ করছে, কাল তারা সেটারই শিকার হবে, এরকমই আমার অভিজ্ঞতা। এর পিছনে আর্থ সামাজিক স্বাধীনতা, প্রেম, প্রণয় বিষয়ে কাঁচামালের সংখ্যাধিক্য, সামাজিক খোলামেলা আবহাওয়ার সুযোগ এবং যৌবনোচিত ঔদ্ধত্য সব কিছুই কার্যকরী। কিন্তু 'এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে? হে মুরারে।' আমরা নেহাৎ মূর্খ বলেই ভেবে মরি। রবিঠাকুর গেয়েছেন, একা যে অনেক গুলিহে'— অর্থাৎ ষড় রিপু বিষয়ক সেই গানটি।

কী বলতে গিয়ে কীসব বকলাম। একেবারে মাস্টারমশাই সুলভ বক্তিমে হয়ে গেল। দোষটা আমার নয়। গিন্নি হেডমাস্টারনী পদ থেকে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। সুতরাং কয়েকশো ছাত্রী এবং শিক্ষিকাদের জন্য বরাদ্দ মহদোপদেশগুলো একাকেই শুনতে হয়, তাই ব্যাপারটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। গোপনে বলি, মাঝে মাঝে ভুলে আমিও তাঁর ইস্কুলের জনেদের মতো তাঁকে 'বড়দি' ডেকে ফেলি। কিন্তু পাঠক বোধহয় এতক্ষণে ভুলে গেছেন যে আমি এক বান্ধবীর গল্প করছিলাম। তো সেই, মাঝে মাঝে তার বাড়িতে যাই।

BanglaBook.org

অ্যালিবাই হিসাবে রেখেছি তার এবং তার ছোট ভাইটাকে একটু পড়া দেখিয়ে দেওয়া। তার দিক থেকে রজকিনী ভাবটা থাকলেও আমার মনটা যে চণ্ডীদাসের মতো নিষ্কলুষ ছিল না, পাঠক নিশ্চয় তা অনুমান করতে পারেন। ফলে যা হবার তাই হলো। দুটো দিনের অন্যমনস্কতার সুযোগে তাকে আচমকা চুমু খেয়ে ফেললাম। চণ্ডীদাস মশাই চণ্ডীবাবুতে উত্তীর্ণ হলেন। আমি ধরে নিলাম আমার চরিত্তিরটা নষ্ট হয়ে গেছে। সে একেবারে ছানাকাটা নষ্ট।

সে এক 'নান্দিভাস্যি' ব্যাপার। অস্যার্থ বিশৃঙ্খল কাণ্ড। বালিকা ক্রুদ্ধা না তুষ্টা বোঝা গেল না। শাস্ত্র মতে তুষ্টা হবারই কথা। কারণ অত্র্যস্থ আঞ্চলিক আপ্তবচনে আছে—'চুম্বনে তুষ্টা বালিকা' ইত্যাদি। গোটা শ্লোক আওড়াবার সাহস এ বয়সেও নেই। ওটা এখনো 'পোণ্' মশাইদের এক্তিয়ারে। তাছাড়া ব্যাকরণে আমি ব্যোপদেব। অনুস্বর, বিসর্গ এবং লিঙ্গ প্রকরণাদি নিয়ে নাড়াচাড়া সখ্‌ৎ বে-আদবি। মরুক গে।

তো বালিকার মতিগতি পর্যবেক্ষণের মতো সৎসাহস ছিল না বলে, ঝটিতি প্রস্থান। সাহসের অভাবের কারণটা কী ছিল, সঠিক স্মরণ নেই, তবে একটা সত্যোপলব্ধির কথা আজও পাকা হয়ে আছে কল্‌জের অন্তঃস্থলে, one kiss is appetiser for the next ones.

খেয়াল করিনি, বালিকা আমার কাট্ মারার পথ ধরে পিছে পিছে এসেছিল। দেখতে পেয়ে ভাবলাম, সেরেছে! এমনিতে তো কাণ্ডটা ঘটিয়ে মরমে মরে আছি। নিজেকে চূড়ান্ত একটা দস্যু লম্পট বলে মনে হচ্ছে। এখন যদি আবার সে এটা নিয়ে পাঁচ কথা শোনায়, সামনের রেল লাইনে গলা দেওয়া ছাড়া, আত্মগ্লানি প্রশমনের আর কোনো উপায় থাকবে না। সুতরাং সে কিছু বলার আগেই বললাম, আমি খুবই লজ্জিত। ব্যাপারটা একান্তই অন্যায় হয়েছে। মনে হয়, এরপর আমার আর এখানে আসা উচিত না। আমাকে, ক্ষমা করে দিও। এক নিঃশ্বাসে যখন কথাগুলো বলে যাচ্ছিলাম, বালিকা আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। এরপর বলল, না তা কেনো, তুমি যেমন আসছিলে এসো।' বলে, সামনের ঢাল বেয়ে গাছ গাছালির মাঝের রাস্তা ধরে তার বাড়ির দিকে চলে গেল। প্রেমিক কূলে 'বোগ্দাতম' আমি ভাবলাম, বোধহয়, আমার হঠাৎ করে তাদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করাটা তার মা বাবার নজরে বিসদৃশ লাগতেপারে বলেই সে অমন বলেছে। তবুও সেই দস্যুতা আরও

BanglaBook.org

একবার প্রকট হলে সত্যি সত্যি তার সন্নিধানে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরে আর একবারও যাইনি। সে বৃত্তান্ত ভিন্ন এবং হেতুও ঘটনাবহুল, পাঠকের তা জানার প্রয়োজন নেই। সেজন্য 'তাহাদের কথা' লেখা প্রয়োজন। তারপর একের পর এক বিয়োগান্ত সংযোগ। আদম সুমারি করিনি। কিন্তু মোদ্দা কথা যেটা, তা হলো, প্রেমের গপ্পো লেখার মতো, বিশেষ করে আজকের যুগ প্রয়োজনে, বা মাংসল রুচির তুষ্টি সাধন করার প্রেক্ষিতে প্রয়োজন ছাড়া 'ঝলিক্‌পলিক্‌' মিথ্যে কথা বলতেও পারি না। আবার 'মম-জীবনে প্রেমের শতকিয়া' রচনা করার মতো শতকাণ্ড সত্য কাহিনী থাকলেও তার আক্ষরিক বিন্যাসকরার মতো নির্বোধ আমি নই। সেরকম দুঃসাহসও আমার নেই। কারণ, দয়া করে আমার গৃহিণী শত অপরাধেও আমাকে আগলে আছেন। সেই প্রাচীন শিলাখণ্ডটিকে তপ্ত করে আমি লোলচর্মে ছ্যাঁকা খেতে চাই না। তদুপরি তিনি রোক্কা পেনশন-হোল্ডার। একুল-ওকুল দুকুল খুইয়ে পথে বসা কোনো কাজের কথা নয়। তাতে প্রেমের গপ্পো লেখা হোক চাই না হোক। সাহিত্য সরসীতে ক্যাসানোভা, ক্যাসানোভানীরা কিছুমাত্র অপ্রতুল নেই। রসের সাগরে এখন গ্যাঁজ্‌লার তুফান। পানীয়ের মধ্যে তাড়ি বস্তুটা আমার ঠিক সহ্য হয় না। আপাতত, এবিষয়ে এপর্যন্তই।

—— o ——

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মহাভারতের বিষমন্থন

মহাভারত নামক মহাসমুদ্র মন্থন করে পাঠক, শ্রোতাকুল বহু যুগ ধরে অমৃতের স্বাদে বিভোর ছিলেন। তাঁদের কাছে,

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

—এই বার্তাটিই ব্যাপক বা সার্বিকতায় ধৃত ছিল। ঊনবিংশ শতক থেকেই সম্ভবত, মহাভারত-প্রেমীরা এর বিষের আস্বাদটি পেতে শুরু করেন। দেবাসুর বৈর কালে যেমন প্রথমে অমৃত এবং পরে কালকূট উত্থিত হয়েছিল, এক্ষেত্রেও তেমনই। অমৃত মন্থনের ব্যাপারটি এত গভীর ও বিস্তৃতভাবে রূপক যে, তা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বুদ্ধদেব বসুর মত মগজ ও কলমের প্রয়োজন এবং তার পরিসর প্রায় মহাভারতের তুল্যই হয়ে দাঁড়ায়।

আধুনিক কালে বোধ হয় তিনিই প্রথম মহাভারতের কথার মধ্যে নিহিত অমৃত ও বিষ এই দুটি বাস্তবতা নিয়ে আমাদের চিন্তাক্ষেত্রের সরলবর্গীয় অবস্থাটা এলোমেলো করে দেন। তারপর থেকেই চলতে থাকে বিষমন্থনের ক্রমান্বয়।

সম্প্রতি 'চোখ' নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত এবং শ্রীঅভিজিৎ করগুপ্ত কর্তৃক রচিত ও পরিচালিত 'অতঃকিম্ মহাযুদ্ধ' নামক নাটকটির অভিনয় দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার এই প্রচেষ্টাটি সেই নাটকটিকে অবলম্বন করেই রচিত। এটি কোনো অর্থেই নাটকটির সমালোচনা, রিভিউ বা বিশ্লেষণ নয়, ঐ মন্থন প্রক্রিয়ার পথ ধরে একটু এগোনোর প্রচেষ্টা মাত্র।

সমালোচনামূলক— শিল্পচর্চা করার জন্য যে মেধা বা বহুশ্রুতির বা নাটক দেখার প্রয়োজন, তা আমার নেই। অবশ্য রসোপলব্ধির বিষয়ে 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন লভ্য' বলে একটি কথা আছে। তথাপি অধিকার ভেদের কথাটাও মানতে হয়। নাট্যশিল্পের ক্ষেত্রেও, অভিনয়াদি নিয়মিত না দেখলে, বা মঞ্চের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সংযুক্তি না থাকলে, তার চর্চা করার, নাটক, অভিনয়, তথা তার অন্যান্য আনুষঙ্গিকতা বিষয়ে মতামত দেওয়ার অধিকার

BanglaBook.org

অভিজিৎ তাঁর 'অতঃকিম্ মহাযুদ্ধ' নাটকে মহাভারতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংঘটন অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রীয় মহাপ্লবতাকে উপজীব্য করে দৃশ্যের পর দৃশ্য উন্মোচন করতে চেয়েছেন। তা কখনো মূল পাঠকে ছুঁয়ে, কখনো বা পাঠের পুনর্নির্মাণ এবং বিনির্মাণের সাহায্যে। প্রথম দৃশ্যের সামগ্রিক আয়োজনে, অভিনয়ের দিক থেকে সামান্য শ্লথতা থাকলেও (যা পরে যথাযথ গতিশীল হয়েছে ক্রমশ) প্রথম দৃশ্যের Exposition টি প্রশংসনীয়। মঞ্চের প্রান্তিক আয়োজনে সুপরিকল্পিত এবং অর্থবহ আবহ সঙ্গীতের সঙ্গের বাদ্য যন্ত্রটিকে ঠিক পাখোয়াজ বলে মনে হলো না, গাম্ভীর্যটা যথেষ্ট মেঘমন্দ্র হলে আমার শ্রবণ যেন তৃপ্ত হতো, হয়ত একটু যাত্রা সুলভ হতো, কিন্তু ব্যাপারটাতো মহাযুদ্ধের অভিঘাত তৈরি! কিন্তু সেসব কথা আপাতত থাক। বিষয়ের সম্পর্কেই বরং বলি।

আমার মনে হয়েছে (ভুল হতে পারে), যে নাট্যকার যেন আর্যাবর্তীয় একটি মাত্র রাজ পরিবারের একাংশকে অপরিসীম লোভ, ক্ষমতা-কামুকতা, কুটিল ষড়যন্ত্রের ঊর্ণজাল বিস্তারের সাহায্যে অপর এক অংশকে সবরকম অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, সম্পূর্ণভাবে তাদের উচ্ছেদ করতে চাইছে এমনটিই বলতে চাইছেন। সোজা কথায় কার্যসিদ্ধি না হওয়ায় এক অনৈতিক, অনভিপ্রেত যুদ্ধকে তারা তাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। শকুনি, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন সেখানে খলচরিত্র। শকুনিতো প্রায় খলনায়ক। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের যেন এই মহাপ্লবতার বিষয়ে কোনো দায়িকতা নেই। কৃষ্ণ যেন সত্যিই এই যুদ্ধকে অনভিপ্রেত এবং চূড়ান্ত অকল্যাণকর জেনে, বার বার শান্তির দ্বারা যুদ্ধকে স্তব্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টার পর, বাধ্য হয়ে অত্যাচারিতের পক্ষে এক প্রতিবাদী, প্রতিরোধী যুদ্ধের আয়োজন করছেন এবং একারণেই কৌরবদের যুদ্ধ অন্যায় যুদ্ধ আর পাণ্ডবদের যুদ্ধটা ধর্ম বা ন্যায় যুদ্ধ। মনে হয়েছে, এটা যেন অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের চিরন্তন স্বাধিকারের সশস্ত্র প্রতিরোধ। দর্শক হিসাবে, এ কারণে আমার একটি পরম্পরাগত একমাত্রিক লোক বিশ্বাসের কথা মনে হল। কাশীরাম দাসের পয়ারে বললে ব্যাপারটা খানিক এরকম—

অধর্মের পরাজয় ধর্মের বিজয়।
সদা হয় সংসারে মহারাজ নিশ্চয়॥

কিন্তু এই বিচারে তো সেই সনাতন পক্ষপাতিত্ব। এখানে আধুনিক প্রশ্ন কোথায়? ধর্ম এবং অধর্ম, অর্থাৎ ন্যায় এবং অন্যায় ইত্যাদি ধারণাগুলি এবং যুদ্ধ

BanglaBook.org

বিষয়ে তাদের ফল, বিশেষ করে জয় পরাজয়ের ক্ষেত্রে, বোধহয় অতটা সরলবর্গীয় আজ আর নেই, মহাভারতীয় যুগেও ছিল কিনা সন্দেহ। একারণে, আমি নাটকে-নিহিত কিছু ধারণাকে উপলক্ষ্য করে কয়েকটি প্রশ্ন তুলতে চাই।

অবশ্য এক্ষেত্রে 'নাটকে নিহিত ধারণা'র কথাটি অধিকতর সুপ্রযুক্ত হতো যদি তার অভিনয় আর একবার অন্তত দেখতাম, বা নাটকটি মনোযোগ দিয়ে পড়ার সুযোগ হত। সুতরাং সবিনয়ে জানাই, প্রশ্নগুলোর যাথার্থ্যে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকছে। তথাপি প্রশ্নগুলো উপস্থিত করছি এবং তা ঝুঁকি নিয়েই।

(১) কৌরব এবং পাণ্ডব ভারতযুদ্ধের এই দুই যুযুধান পক্ষের কেউই কী ক্ষমতার লোভের বাইরে?

(২) দুর্যোধন রাজ্য তথা ক্ষমতা কামুক হিসাবে অতি উগ্র। তা সত্ত্বেও সে কী শাসক হিসাবে প্রকৃতি-পুঞ্জের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত হয়ে পড়েছিল? রাজধর্ম পালনে তার উদাসীনতা বা ব্যর্থতার কথা বেদব্যাসের ইতিহাস কাব্যে নেই। সেখানে স্বয়ং যুধিষ্ঠিরও তার সু-শাসনের গুণগান করছে এমনই দেখি। পক্ষান্তরে, খাণ্ডবদাহ এবং রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কৃষ্ণের অভীপ্সা মত পাণ্ডবেরা, বিশেষত অর্জুন কী ব্যাপক হত্যা, ধন লুণ্ঠন,—মাত্রাতিরিক্ত লোভ, হিংসা, অত্যাচার এবং সাধারণ গণনিগ্রহ ঘটায়নি?

(৩) পক্ষপাতহীন নিঃস্বার্থ বলে কথিত কৃষ্ণ কী রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষ্যে দিগ্বিজয়ে লুণ্ঠিত সম্পদের একটা বড় অংশ তাঁর যাদব অভিজাততন্ত্রীয় আত্মীয়বর্গের জন্য গ্রহণ করেননি? মন্ত্রণাদাতা হিসাবে তিনি কী আদৌ স্বার্থশূন্য এবং পক্ষপাতহীন?

(৪) দুর্যোধনের পক্ষে পাণ্ডবদের রাজ্যভাগ চাওয়াকে অগ্রাহ্য করা কীজন্য অন্যায় বা অযৌক্তিক? 'সূচগ্র্য মেদিনী' তিনি কী কারণে, কোন্ ন্যায়শাস্ত্র মতে পাণ্ডবদের দিতে বাধ্য? অজ্ঞাত কুলশীল কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যদি কোনো পরিবারে আশ্রিত হয়ে, লোকশ্রুতিকেই একমাত্র অবলম্বন করে সেই পরিবারের সম্পত্তি গ্রাস করতে চায়, ন্যায় এবং অর্থশাস্ত্রের কোন্ বিধি বলে তাকে সঙ্গত বলা যাবে? গৃহস্থ কী সেক্ষেত্রে তার কুলস্বার্থ ত্যাগ করবে? সেক্ষেত্রে উদ্ভূত বিরোধের জন্য দায়ী কে?

(৫) সেক্ষেত্রে যুদ্ধ অনিবার্য হলে গৃহস্থের যুদ্ধ অন্যায় যুদ্ধ এবং প্রমাদ সৃষ্টিকারী আশ্রিতদের যুদ্ধ ন্যায় বা ধর্মযুদ্ধ হয় কীভাবে?

BanglaBook.org

(৬) পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের মন্ত্রণায় কী অত্যাচারিত, নিপীড়িত সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জের স্বার্থে অনন্যোপায় হয়ে এই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন, না ব্যক্তিগতভাবে সম্পত্তি এবং ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা তদানীন্তন আর্যাবর্তীয় মৎস্য, সৃঞ্জয়, পাঞ্চাল, মগধ, চেদি, যাদব অভিজাত তন্ত্র এবং অন্যান্য রাজশক্তি সমূহের আন্তঃ তথা পারস্পরিক বৈরকে অবলম্বন করে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ক্রূর যুদ্ধের অনুষ্ঠান করেছিলেন?

(৭) মানবতার স্বার্থে, আধুনিক বিচারে যে কোনো যুদ্ধই কী শেষ পর্যন্ত ন্যায় এবং শান্তির পরিপন্থী নয় যদি তা শুধু ক্ষমতা কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়? যুদ্ধ নিবারণের জন্য যুদ্ধও কী সত্যিই শেষ বা ন্যায়যুদ্ধ হিসাবে পরিণতি লাভ করতে পারে? ইতিহাসে এরকম ইঙ্গিত কোনো যুদ্ধান্তকালে কী আমরা প্রত্যক্ষ করেছি? যদিও তত্ত্বে এরকম প্রতিশ্রুতি আছে, কিন্তু বাস্তবে কী তা ঘটে?

(৮) প্রত্যেকটি যুদ্ধই কোনো না কোনোভাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, তা নন্দীগ্রাম বা ইরাক যে রণস্থলই হোক না কেন। কিন্তু আমার কাছে বড় প্রশ্ন হল, বাহ্যদৃশ্যে আমরা কীভাবে সত্য নির্ণয় করব? কোন পক্ষ ন্যায়ের জন্য লড়ছে আর কোন্ পক্ষই বা অন্যায়ভাবে, তার সত্যদর্শন কীভাবে ঘটা সম্ভব? এই সমস্যা ভারত যুদ্ধের সময় যেমন, আজকের নন্দীগ্রাম বা ইরাকের প্লবতার সময়েও কী একইভাবে ক্রিয়াশীল নয়? তাহলে যুদ্ধ স্তব্ধকারী শেষ যুদ্ধে কী মহোদয় আমরা আশা করতে পারি?

(৯) সভ্যতার বৈষয়িক অগ্রগামিতা কী মানবতার অবনয়নের সঙ্গে ওতপ্রোত বলে মনে হয় না? এবং সর্বপ্রকার হিংসাই কী সভ্যতার গর্ভে জাত নয়? কোনো সভ্যতাই কী শেষ পর্যন্ত সভ্যতার মূল আদর্শকে রক্ষা করে?

এইসব প্রশ্নের পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক যুক্তিই উত্থাপন করা যেতে পারে। আবার সব যুক্তিরই যে প্রতিযুক্তি থাকে, আর কোনো যুক্তিই যে চূড়ান্ত বা শেষ বাক্য নয়, এ সত্যেরই বা বাত্যয় কোথায়? আসলে সভ্যতা, যুদ্ধ, ন্যায়, অন্যায় ইত্যাদি ব্যাপারগুলো যুগ যুগ ধরে জটিল হতে হতে আজ এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে যে কোনো প্রকার যুক্তিরই আজ আর একক আধিপত্য বা গ্রহণযোগ্যতা নেই। এই চরম জটিলতা প্রকৃতির প্রতিস্পর্ধী হয়ে মানুষই সৃষ্টি করেছে। ইতিহাসের কোন্ এক অশুভক্ষণে যে মানুষ যুদ্ধ নামক এই সর্ব

BanglaBook.org

অনিষ্টকর পন্থাটি তাদের স্বার্থগত সমস্যার সমাধানের উপায় হিসাবে অবলম্বন করেছিল, আমরা কেউ তা জানি না। আজ তাকে স্তব্ধ করার জন্যও তারই শরণাপন্ন হতে হয় এবং হায়, তখন সে আবার রক্তবীজের মত নতুন করে জন্ম নেয়। কৃষ্ণ তাত্ত্বিকভাবে ব্যাপারটা হয়তো বুঝেছিলেন বলেই গীতার মত এক নৈর্ব্যক্তিক দর্শনে অর্জুনকে স্থিতি দিতে চেয়েছিলেন। 'নিষ্কাম কর্ম' বোধহয় সেই উপায়, যাদ্বারা মানুষ এই যুদ্ধ—ক্ষমতা—যুদ্ধ—আবার ক্ষমতা—আবার যুদ্ধ এরকম একটা অলাত-চক্রের বাইরে যাবার পথ পেতে পারে। কিন্তু সেই স্বপ্নটি স্বপ্নই থেকে গেছে। মনে হয়, সাম্যবাদী সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে 'শেষ যুদ্ধের' আহ্বানটিও ঠিক একক একটি যুদ্ধ থাকছে না, বা সেই যুদ্ধগুলিরও ন্যায্যতার পথে চলার সম্ভাবনা পরিদৃশ্যমান নয় এবং সেটাই এ যুগের সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজিক ট্রুথ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

আমার এতক্ষণের বাচালতার মধ্যে যতটা দার্শনিক হতাশা আছে, খাস বক্তব্য, যা মানুষকে সংকট থেকে মুক্ত করতে পারে তার কিছুই প্রায় নেই। বস্তুত, আমিও নাটকটির প্রচারপত্রে উল্লেখিত এবং নাটকে দৃশ্যায়িত সেই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে চলেছি। প্রশ্নটি উদ্ধৃত করে, বিষয়টিকে আর একটু পরিষ্কারভাবে বলতে চাই। 'রাষ্ট্র' এবং ক্ষমতার সর্বগ্রাসী লোভ আর নিষ্পেষণ যদি নষ্ট করে দেয় শান্তির বাতাবরণ, যদি অনিবার্য করে তোলে যুদ্ধ, তবে কি নির্বিরোধী শান্তিকামী মানুষ সেই আগ্রাসনের সামনে আত্মসমর্পণ করবে? নাকি সেও তুলে নেবে অস্ত্র?' আমার বক্তব্য হচ্ছে, অস্ত্র তুলে নেওয়ার অধিকার অত্যাচারিতের অবশ্যই আছে। কিন্তু তাতে কী মৌল সমস্যাটা মেটে? ব্যাপারটা কী একই মুদ্রার দুদিক হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় না?

যা হোক, এতক্ষণের আলোচনা আলোচনাই, সমালোচনা নয়। আমি মনে করি, নাট্যকার হিসাবে অভিজিতের সার্থকতা বোধহয় এখানেই যে তাঁর নাটক আমা হেন একজন অকিঞ্চিৎকর দর্শকের মনে এত সব প্রশ্ন তুলতে সক্ষম হয়েছে। নাট্যকার এবং পরিচালক হিসাবে এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার দায় হয়ত তাঁর থাকে না, তবে পুনরায় বলি, নাটকের মূলাধার মহাভারত এবং সমস্যাটি যুদ্ধ সংক্রান্ত। সেখানে কারুর উপর ঐ মহাযুদ্ধের দায় চাপানোর সময় অবশ্যই উভয় পক্ষের গুণাগুণ যথাসম্ভব তৌল করা প্রয়োজন। নচেৎ একদেশ দর্শিতার প্রমাদ হতে পারে। শকুনি, দুর্যোধন ইত্যাদিদেরও যে যুদ্ধ পরিহার করার

BanglaBook.org

মানসিকতা ছিল, সে সত্য মহাভারতকার গোপন করেননি। নাটকের স্বার্থে, মূলপাঠ অতিক্রম করার প্রয়োজন ঘটতেই পারে। মূল পাঠের বিন্যাস, সংযোজন, বিয়োজন, বিনির্মাণের কৌশলগত কারণে আসাও স্বাভাবিক, কিন্তু মূল পাঠে যদি খলনায়ক বা খল চরিত্রদের মধ্যে স্বভাব ব্যতিরেকী সামান্যতম প্রবণতার সূত্রও থাকে, তবে বোধহয় তাকে অতিরিক্ত মনোযোগে ব্যবহারে আনা নাট্যকারের পক্ষে লাভজনক। বিশেষত, বিনির্মাণের প্রশ্নে।

এইসব কথা আবার বলছি, সমালোচনার মানসিকতা নিয়ে বা উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে একারণে যে নাটকটিকে আমার যথাসম্ভব সম্ভাবনাপূর্ণ মনে হয়েছে। একজন সাধারণ দর্শক হিসাবে আমার মনে নাটকটি দেখার পর যে প্রত্যাশার জন্ম হয়েছে, প্রশ্নাকারে সেটাই আমি নাট্যকারের কাছে নিবেদন করতে চেয়েছি। পারিবারিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক এবং জাতি রাষ্ট্রীয় হরেক যুদ্ধে দগ্ধ হতে হতে মনটা এতই যুদ্ধ-বিমুখ হয়ে গেছে যে কোনো প্রকার যুদ্ধকেই আর মানবতার সপক্ষের যুদ্ধ বলতে সাহস পাই না। অবশ্য এমন ভাবার কোনো হেতু নেই যে যুদ্ধ চাই না বলে সংগ্রামও চাই না কোনো। সংগ্রামকে জারি রাখতেই হবে এবং নিঃসন্দেহে ক্রমাগতভাবে তাকে শাণিত করেও তুলতে হবে, কিন্তু শস্ত্রব্যতিরেকেই। সংগ্রাম মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা এবং প্রাকৃতিক ধর্ম, শস্ত্রাচার, বলপ্রয়োগ সর্বার্থে অধর্মই, বা প্রকৃতির বিকৃতিমাত্র। অপ্রকৃতিস্থতা দ্বারা কোনো ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নেই। একথা কুরুক্ষেত্র তথা ইরান বা নন্দীগ্রাম সর্বক্ষেত্রেই সত্য বলেই আমার বিশ্বাস।

সামান্য আর দু একটি কথা নাটকটির নির্মাণ বিষয়ে বলব, যদিও তাও একান্তই অনধিকারের প্রলাপ। মহাভারত বা পুরাণাদির বিশেষ বিশেষ কিছু চরিত্রের শারীর লক্ষণের একটা নির্দিষ্ট মান তৈরি হয়ে আছে বহুকাল ধরে আমাদের মানসে। তার প্রাথমিক কারণ যদি এসব গ্রন্থের রচয়িতাগণ হন, তবে পরবর্তীকালে রাজা রবিবর্মা ইত্যাদি শিল্পীরা তাতে আরো নির্দিষ্ট কিছু মাত্রা যোগ করেছেন। শারীর গঠনে দৃঢ় পেশিবহুলতা, সর্ব অবয়বে বীরত্ব ব্যঞ্জকতা বা পাত্র বিশেষের প্রেমিক সুলভ কমনীয়তা এসব যেন পৌরাণিক এই চরিত্রগুলো উপস্থাপনার পূর্বশর্ত। পোষাক পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও এই মানসিকতা দর্শকের মধ্যে দেখা যায়। চরিত্রের ক্ষেত্রে দর্শনধারী ব্যাপারটা যে প্রাথমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একথা বোধহয় আজও সত্য। দর্শকের বৌদ্ধিক মাপ অনুসারে তা ভিন্ন হতে

BanglaBook.org

পারে, তবে নাট্যকার পরিচালক কী সেক্ষেত্রে দর্শকের বৌদ্ধিক অবস্থান পরিমাপ করার ঝুঁকি নেবেন? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়, অর্থাৎ কিশোরকাল থেকে যাত্রা থিয়েটার যতটুকু দেখেছি তার নিরিখে বলছি যে পৌরাণিক চরিত্রদের ক্ষেত্রে 'পহ্‌লে দর্শনধারী' ব্যাপারটারও একটা পরম্পরা তৈরি হয়েছে। তাতে মনে হয়, এই নাটকের কুশীলবদের মঞ্চে প্রাথমিক উপস্থিতি সেখানে বেশ কিছুটা আশাভঙ্গের কারণ হয়েছে। তবে ক্রমে একসময় সে বাধা কাটিয়ে ওঠা হয়ত যেত, যদি অভিনয়, কণ্ঠ সম্পদ, চলাফেরা ইত্যাদি ধ্রুপদী গাম্ভীর্যপূর্ণ হতো। আমি আমার শৈশবকালে দেখা যাত্রাপালার অভিনয়কে প্রসেনিয়েম থিয়েটারের ক্ষেত্রে প্রয়োগকে ব্রাত্য মনে না করেই বলছি, শকুনি এবং ধৃতরাষ্ট্র, তাঁদের অভিনয়ে খানিকটা যাত্রার আঙ্গিক ব্যবহার করে সমুচিৎ মাত্রাই এনেছেন। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয়কারীরা যথাযথ। দ্রৌপদীর অভিনয়ে দলিতা ভুজঙ্গিনীর আরো তীক্ষ্ণতর প্রকাশ কাম্য। বস্ত্রহরণ দৃশ্যে সাদা শাড়ির আর আলোর মায়াজাল অপূর্ব মোহের সৃষ্টি করলেও আরো হাহাকার সৃষ্টিকারী হলে ভাল হত। শাড়ি উর্ধে উড্ডীয়মান কেন, তাৎপর্যটি বুঝলাম না। হরণকারীর অবস্থান তো যাজ্ঞসেনীর সমতলেই, তাহলে তা বিপরীতগামী কেন? এর কী বিশেষ কোনো ইঙ্গিত আছে? এটি আমার নেহাতই একটি কৌতূহলী প্রশ্ন। আলোক সম্পাত ভালো লেগেছে। সুগতর সঙ্গীত আমি একবার অন্তত, তাঁর খালি গলায় শুনেছিলাম, অনবদ্য লেগেছিল, সেখানকার পরিবেশ অবশ্য ভিন্ন ছিল। ভিন্ন আবহে খারাপ শুনিনি বটে, তবে উনিতো কোমলের ব্যবহার সেখানে (কোনো কোনো ক্ষেত্রে) যেন তাঁর গায়কীর ধরণে করলেন না। নির্দিষ্ট ক্ষণটি সঠিক মনে করতে পারছি না, তবে বাঁশিতে একটি সুর যেন এখনও কানে বাজছে, সম্ভবত সেটি 'শিবরঞ্জনী'। অবশ্য রাগ রাগিনী বিষয়ে আমার ধারণা আদৌ পাতে দেওয়ার তুল্য নয়। ভাল লেগেছিল, তাই বললাম।

অনেক ঝোপঝাড় পেটালাম। খাস কথাটি কই, সর্বোপরি গোটা ব্যাপারটি উপভোগ করেছি। নানারকম চিন্তা এই নাটক মগজে উস্‌কে দিয়েছে। নাট্যকার পরিচালক, কুশীলব এবং মঞ্চেরও অভিনয়ের সঙ্গে সংযুক্ত সর্বজনকে কৃতজ্ঞতা, শুভেচ্ছা তথা ধন্যবাদ।

BanglaBook.org

—— o ——

নিভৃত প্রদীপের উজ্জ্বল শিখা

সুপ্রভা দত্ত নামের জনৈকা যন্ত্রণাকাতরা গৃহবধূর লিখিত একটি ডায়েরি মূলপাঠ-সহ প্রকাশিত হয়েছে বরাক উপত্যকা নন্দিনী সাহিত্য ও পাঠচক্রের (শিলচর) তরফ থেকে। সম্পাদকেরভূমিকা এবং কয়েকটি গবেষণাধর্মী নিবন্ধে ডায়েরিটির মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও পুস্তকটিতে স্থান পেয়েছে সুপ্রভা-পুত্র গোবিন্দ দত্তের 'আমার কথা' এবং সম্পাদকের 'ঋণ-স্বীকার' শিরোনামায় আরও দু'টি ক্ষুদ্র নিবন্ধ। ডায়েরির মূল পাঠের সঙ্গে পরিশিষ্ট হিসাবে রয়েছে সুপ্রভার স্বামী গজেন্দ্র দত্তের দিনলিপি (পরিশিষ্ট ১), ডায়েরিতে উল্লিখিত ব্যক্তিদের পরিচিতি সূত্র (পরিশিষ্ট ২), বিবৃত ঘটনাপঞ্জির সূত্রায়ন (পরিশিষ্ট ৩)। সুপ্রভা দত্তের লোকসংস্কৃতি চর্চা বিষয়ে উল্লেখ প্রসঙ্গে তাঁর সংগৃহীত এবং বিন্যস্ত দু'টি ব্রতকথার আলেখ্য (পরিশিষ্ট ৪) ও চারটি ছড়া (লোকভাষায়) এবং চারটি রাজনৈতিক অভিভাষণ, যা শ্রীমতী দত্তের রচনাশৈলীর উত্তম নিদর্শন হিসাবে গণ্য হতে পারে।

গবেষকদের বিশ্লেষণ ও আলোচনায় ডায়েরির মূল পাঠের প্রয়োজনীয় কোন প্রসঙ্গই অধরা থাকেনি। তবুও এই অতিরিক্ত পর্যালোচনাটির নেপথ্যে দুটি কারণ। এক, বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন ছাড়াও আগ্রহী পাঠক ও গবেষকদের জ্ঞাতার্থে এর ভিন্নতর বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজন আছে। দুই, যেহেতু গবেষক অধ্যাপকদের রচনাগুলিও ডায়েরি সংলগ্ন হয়েই প্রকাশিত হয়েছে, সে কারণে তাঁদের মূল্যবান পর্যালোচনাগুলিওতো প্রথাগত সমালোচনা বা পর্যালোচনার মাধ্যমে আগ্রহীদের সমক্ষে উপস্থিত করা প্রয়োজন। এই সব বিবেচনা করেই ঈদৃশ অধিকন্তু প্রয়াস।

শৈশব-কৈশোরে আমার অবস্থানটা ছিল এমন একটা প্রান্তিক অঞ্চলে যেখানে সুপ্রভা দত্তের সময়কালের তৎকালীন আধুনিকতার একটা বাতাবরণ ছিল, যদিও আমার বাল্য অবস্থায় তার অস্তিত্ব ছিল না। তাহলেও, প্রাচীন গৃহ, বিদ্যালয় ইত্যাদির ভাণ্ডারে সেই একদা বিকাশোন্মুখ আধুনিকতার নানা অভিজ্ঞান সঞ্চিত ছিল। হয়তো তদানীন্তন সমাজমনস্ক কেউ কেউ সেই সব অভিজ্ঞানগুলি সযত্নে সংরক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞানগুলির মধ্যে

BanglaBook.org

সুপ্রভার ডায়েরির মতো ডায়েরি এক-আধখানা ছিল, কিন্তু বেশি ছিল আত্মকথা, আমার কথা, স্মৃতিসুধা, অতীত দিনের স্মৃতি ইত্যাদি হরেক নামের-খাতা যার কেনোটিই প্রকাশের আলো পায়নি। আজ সুপ্রভা দত্তর ডায়েরীর প্রথম পাঠটি পড়তে গিয়ে সেই স্মৃতি— উদ্বেল হয়ে উঠছে। সুপ্রভা শুরু করছেন, 'আমি আমার দীর্ঘ জীবনের আরম্ভ সময়ে, কয়েকটি বৎসরেই সংসার সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, সে বিষয়ে একখানা পুস্তক লিখিলে একটি বিরাট কলেবর পুস্তক হইত।' (২রা আষাঢ়, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ)। দেখা যাচ্ছে সুপ্রভারও মনোবাঞ্ছা একটি বৃহৎ স্মৃতিপুস্তক রচনা করার সপক্ষেই ছিল। জানি না তাঁর ডায়েরি লেখার পিছনে সেই উদ্দেশ্যটিই ছিল কিনা। তবে ডায়েরি পাঠ করে বুঝতে পারি যে, একটি বৃহৎ পুস্তক নির্মাণের উপকরণের অনটন তাঁর ছিল না। অনটন যদি কিছু থেকে থাকে তা সংসারের জাঁতাকল থেকে সময়ের ফুরসতের। সেই ফুরসত যখন পেতে শুরু করলেন, নিষ্ঠুর, নির্দয় কাল—তাঁর ডায়েরিতে উল্লিখিত সব যন্ত্রণা, অতৃপ্তি, আকাঙ্ক্ষা, অভিমান, অপমান, লাঞ্ছনার বাইরে— তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তাঁর জীবন দীর্ঘ হল না, ডায়েরিটিও না। সুপ্রভা দত্ত যে-সময় ডায়েরি লিখেছেন, তার অনেক পরেও কিন্তু পারিবারিক, সামাজিক অবস্থার বিশেষ তারতম্য ঘটেনি। কারণ এদেশে পরিবর্তন ব্যাপারটা বড় শ্লথ। সুপ্রভার মতই ওই 'মারের সাগর' পাড়ি দেওয়ার কায়ক্লেশ তখনও লক্ষ করা যেত। সেখানে তাঁরই মতো কূলের কাছাকাছি পৌঁছেও অকালে অনেক লেখকের কালপ্রাপ্তি ঘটেছে।

গৃহবধূর ডায়েরি ব্যাপারটা সমাজবিজ্ঞানী, গবেষকদের কাছে সঙ্গত কারণেই আকর্ষক এবং আদরণীয়ও। সেখানে সমাজের অনেক ঘাঁতঘোঁত, গলিঘুঁজি, ডোবাখানার সন্ধান পাওয়া যায়। সেসব খোঁড়াখুঁড়ি করলে সমাজদেহের অভ্যন্তরের নানা ঘা, পচনের অস্তিত্বগুলো প্রকাশ্যে আসে। সুপ্রভার ডায়েরিখানা সেদিক দিয়ে একেবারে আঠারো আনা উম্‌দা, টাটকা কাঁচামাল। সে কারণে গবেষকদের উৎসাহিত হওয়ার সম্যক কারণ আছে। সুপ্রভা দত্তের চমৎকারিত্ব এবং সচেতনতা এখানে যে, তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ডায়েরিটির লালন পালন করেছেন, তার সঙ্গে সখিত্বের বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করেছেন। এ জন্যেও মনে হয়, তিনি এটি অবলম্বন করে, উপযুক্ত অবসরে একটি বৃহৎ কিছুর নির্মাণের আশা করেছিলেন।

BanglaBook.org

ডায়েরি কিংবা দিনলিপির নিয়মনিষ্ঠ চর্চা আমাদের সমাজ জীবনের স্ব-ভাব নয়। এদেশে এরকম পরম্পরা প্রায় দেখা যায় না। মধ্যযুগে কড়চা লেখা হত, কিন্তু তাও দিনলিপি বা ডায়েরি ধর্মী নয়। সুপ্রভা নবম শ্রেণি পর্যন্ত ইস্কুলে পড়েছিলেন। হতে পারে সেখানে তিনি এই অভ্যাসটি রপ্ত করেছিলেন। এরকম একটি অনুমান সম্পাদক করেছেন। অধ্যাপক অরুণ বসু তাঁর নিবন্ধে এই অনুমানের সঙ্গে পুরো সহমত হতে পারেননি। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'আরও অসংখ্যের মধ্যে' কেবল একজনই কেন? অবশ্য উত্তরে বলা যায়, অসংখ্যের খোঁজ তো জানা নেই। সুপ্রভা কোথা থেকে এই উত্তরাধিকার পেলেন, তা নিয়ে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এই বিস্ময়টা আমারও। তবে সেই বিস্ময়টা শুধু সুপ্রভার ডায়েরির বিষয়ে নয়। অপ্রকাশিত, হারিয়ে যাওয়া, যেগুলোর কথা শুরুতে বলেছি, সেগুলোর বিষয়েও আমার সমান বিস্ময়। সেগুলো, আবার বলছি, ডায়েরি নয়, স্মৃতি আলেখ্য। কিন্তু অদ্ভুতভাবে এই ডায়েরির বিষয় এবং বিন্যাসের তীব্রতার সঙ্গে সেগুলোর মিল দেখেই আমার বিস্ময়।

ডায়েরিটির দৈনন্দিন তুচ্ছ, অতুচ্ছ খবরের ভেতর থেকে সুপ্রভার একটি অত্যন্ত আধুনিক রুচিসম্পন্ন এবং যুক্তিবাদী মন তথা ব্যক্তিত্বের দৃঢ় অবস্থান আমাদের নজরে পড়ে। সেই মনটি এতই শীলিত এবং একই সঙ্গে প্রতিবাদী যে, বিগত শতকের প্রথমার্ধের শিক্ষার সীমাবদ্ধতা, প্রতিবন্ধকতার যুগে, শুধু মফস্‌সল শহর বা গ্রামে কেন, শহর নগরেও আশা করা শক্ত। অথচ সুপ্রভার প্রথাগত শিক্ষাদীক্ষা তো স্কুল গণ্ডিও ছাড়ায়নি। অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও দেখেছি এই একই রকম শীলিত প্রতিবাদের প্রকাশ। সেখানেও বক্তব্যে তিক্ততা আছে, সমালোচনা আছে, কিন্তু সঙ্গে রয়েছে যাঁর বা যাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ (এক্ষেত্রে পুরুষসমাজ), তাঁদের প্রতি সহানুভূতি। বোঝা যায়, সামাজিক অন্যায়ের দায়টা ব্যক্তিপুরুষের উপর চাপাবার সস্তা প্রতিবাদ তাঁরা করছেন না, সেখানে সমাজমনস্কতাটা যথেষ্টই কাজ করছে, যদিও আজকের দিনের মতো জুতসই শব্দসম্ভার তাঁদের ভাণ্ডারে ছিল না, প্রচলিতও ছিল না।

অরুণ বসু যে-উত্তরাধিকার বিষয়ে সন্ধিৎসা প্রকাশ করেছেন, আমার মনে হয়, তার উৎস নিহিত রয়েছে উনিশ শতকের স্ত্রী-শিক্ষা আন্দোলনকারী মনীষীদের প্রচেষ্টায়, পরবর্তী সময়ে তাঁদের যেসব মানসকন্যারা বিকশিতা হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে। বিংশ শতকের বিশ তিরিশের দশকে সুপ্রভারা সেই

BanglaBook.org

মনস্বিনীদেরই শিকড়-বাকড়। সেই শিকড় থেকেই এঁদের উদ্গম ঘটেছে অপ্রতিরোধ্য অঙ্কুরের মতো। আজকের দিনের সমাজগবেষকেরা একেই বলেন অক্ষরের ক্ষমতা। আরও একটি ব্যাপারকে বোধহয় আমরা এই উত্তরাধিকারের উৎস বলে বিবেচনায় নিতে পারি। সেটা হল গত শতকের বিশ-তিরিশের দশকের স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার এবং সাধারণ নারীদের উপর তার প্রভাব, বিশেষ করে গাঁধীবাদী জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব।

বিখ্যাত লেখক, রাজনীতিবিদ এবং প্রব্রজক বা ধর্মীয় পথে বিচরণকারী অনেকেরই প্রকাশিত ডায়েরি আমাদের নানাভাবে ঋদ্ধ করেছে। কিন্তু নিপাট দৈনন্দিন খুঁটিনাটি সম্বলিত, সাধারণ হাসি-কান্না, কঠিন শোক যা প্রথম সন্তানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মাতৃহৃদয়ে এক চিরস্থায়ী ছাপ রেখে যায়, তার পৌনঃপুনিক বিবরণ, এমনকী মৃত শিশুসন্তানের ঔর্ধ্বদৈহিক কর্মের নিপুণ আলেখ্য, সংসারের হিসাব, মায় ঋতুস্রাব, গর্ভপাতের মতো ঘটনার বৃত্তান্ত প্রকাশের মতো ডায়েরি-লেখক তৎকালীন গৃহবধূ দূরস্থান, আজকের অত্যাধুনিক সমাজেও ক'জন পাওয়া যাবে বলা মুশকিল।

সম্পাদক মহোদয় গ্রন্থশেষে যে-পরিশিষ্ট ক'টির আয়োজন রেখেছেন, তার মাধ্যমে ডায়েরি-লেখকের সমাজমনস্কতা, রাজনীতি সচেতনতার সঙ্গে স্বাধীন রচনারীতিরও একটা স্পষ্ট পরিচয় আমরা পাচ্ছি। পুস্তকটি হয়তো সাহিত্য রসপিপাসু আম-পাঠকের আকর্ষণের বস্তু হবে না, তবে গবেষকেরা নিশ্চয়ই এটিকে পরম সমাদরে গ্রহণ করবেন।

BanglaBook.org

— o —

'বাঙাল নামা' দুনিয়ানামা নয়, বাঙালের বিশ্বরূপ দর্শন

এ বঙ্গের একটি নামী পত্রিকার সম্পাদক মশাই ঠিক কী কারণে আমা হেন একটি জীবকে বাঙাল-নামা নামক এই মহাগ্রন্থটি পর্যালোচনা করতে অনুজ্ঞা করলেন, তা পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম করা গেল না। সংসারে অনেক বিষয়ই সবসময় যে সরাসরি বোঝা যায় এমন নয়। তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু একটা নিরীহ লোককে ঠেলে গুঁতিয়ে গভীর দীঘিতে ফেলে দিয়ে, পাড়ে দাঁড়িয়ে একাধারে নিরবচ্ছিন্ন লোষ্ট্র নিক্ষেপ এবং সধমক, উঠে আয়, নয়তো ডুবে মরবি'—এমতো আচরণের কী অর্থ থাকতে পারে, তাবড়ো মনস্তাত্ত্বিকও তা বুঝবেন কিনা সন্দেহ। তবে স্বস্তির বিষয়, সেই নামী পত্রিকা সম্পাদক লেখাটির বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করেন নি। বোধহয় নিমজ্জমান হতভাগ্যকে লোষ্ট্র-নিক্ষেপের নিষ্ঠুরতা পরে তাঁর উপলব্ধিতে এসেছিল। কিন্তু লেখাটা আমি নষ্ট করিনি।

আমার অপরাধ হচ্ছে, পায়ু-পরিপক্কতাবশত, আমি বইখানির লেখক তপনবাবুর নিকট খানিক আস্কারাপ্রাপ্ত পরিচিত, যার প্রধান কারণ ভৌগোলিকভাবে তাঁর ও আমার জন্ম জিলা এক, অথবা এমনও বলা যায় যে তাঁর ও আমার জন্মজ্বালার শুরু একই ভূখণ্ডের অবস্থান থেকে। এছাড়া বাকি ব্যাপারগুলো কিছু কিছু লোকের ঈর্ষার কারণ ঘটালেও তার মধ্যে ঐ প্রথমোক্ত ইত্যাদি পরিপক্কতার প্রসাদে প্রাপ্ত কিছু স্নেহজাতীয় পদার্থ ছাড়া আর কিছু নেই।

কিন্তু বিদ্যাসাগর লিখেছেন, স্নেহ অতি বিষম বস্তু। তার আতিশয্যে তপনবাবু আমার দু'তিনখানা অকিঞ্চন পুস্তক বিষয়ে প্রশংসাসূচক দুচার কথা লিখেছেন। সেই প্রসাদে আমার বিলক্ষণ ন্যাজের গতর কিছুকাল ধরে ভারী। সম্পাদক সম্ভবত সেজন্যই ভেবেছেন যে, অতএব আমি বাঙাল-নামার সমালোচনা করার যোগ্য ব্যক্তি। অথবা এও হতে পারে বিশ্বব্যাপী মন্দার বাজারে সমালোচকও বাড়ন্ত।

মুশকিল এই, বইখানার একটি পর্যালোচনা বা সমালোচনা ইতিপূর্বেই, উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে, উপযুক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং দশে তা পড়েছে। এখন আমার এ ছাইপাঁশ কারুর মুখে রুচবে কিনা সে বিষয়ে ঘোর শঙ্কা আছে। তবু সুযোগ যখন পেয়েছি, তখন ছাড়ি কেন?

BanglaBook.org

সমালোচনা ব্যাপারটা ইদানীংকার সাহিত্যজগতে একটা প্রায় অবলুপ্ত ব্যাপার। অধুনাকার লেখকেরা সমালোচনার তীক্ষ্ণতা পছন্দও করেন না, সহ্যও করতে পারেন না। একটা সময় ছিল, যখন সজনীকান্ত প্রমুখ সমালোচকদের যুগ। তখনকার লেখক শিল্পীরা 'শনিবারের চিঠির' তীক্ষ্ণ শিঙের গুঁতোর ভয়ে, সারা সপ্তাহ পীঠমর্দ ভাড়া করে নাকি তৈল মালিশ করতেন সর্বাঙ্গে, যাতে গুঁতোগুলো খানিক অন্তত 'পিছলাইয়া' যায়। তখনকার দিনে, লেখক সমলোচক সম্পর্কটা সতীন সম্পর্কতুল্য ছিল। ইদানীং অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সম্পর্কটা যেন প্রিয়সখি ব্যবহারে এসেছে। সমালোচনা শব্দটা তাই পর্যালোচনায় পর্যবসিত হয়েছে। একজন তালেব-এ-বুর্জুগকে কারণ জিজ্ঞেস করে জানলাম যে এর পিছনেও বাজার অর্থনীতির লম্বা হাতের প্রচ্ছায়া সক্রিয়। পর্যালোচনার উদ্দেশ্য পরিপুষ্ট বিজ্ঞপ্তি। অর্থাৎ, চেখে দেখুন, মাল আমাদের খাসা। নিজের মাল খারাপ বলে বিজ্ঞপ্তিকরণের জন্য কেউ পয়সা দিয়ে সমালোচক ভাড়া করে না।

সুতরাং সদ্য কথালোকপ্রাপ্ত বরেণ্য প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত মশাই পর্যন্ত পর্যালোচনা কালে, সাম্প্রতিক অতীতে একটি বাক্যকে প্রায় শাশ্বত করে রেখেছিলেন 'এমন আর একখানি বই বাংলাতে পড়ি নাই।' তিনি একটা সময়ে বোধহয় বুঝে গিয়েছিলেন যে এতেই সবদিক বজায় থাকে। লেখকও তুষ্ট, পত্রিকা সম্পাদকও হৃষ্ট, অকারণ অশান্তি পোহাতে হয় না। অথচ তাঁর কলমেই একদা আমরা আমরা 'আত্মঘাতী বাঙালি' এবং আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথের উপর শাণিত ফলার মতো সমালোচনা পড়েছি। সেই শাণিত ফলার আঘাত-আত্মঘাতি ইত্যাদির লেখকের স্পর্শকাতর চর্মে- কেমনটি লেগেছিল তা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু এতসব কথা বলছি কেন? আমি কী সত্যই বাঙাল-নামা নামক বইখানার সমালোচনা করতে উদ্যত হয়েছি নাকি? পাঠক আশ্বস্ত থাকতে পারেন সেরকম আত্মঘাতী উৎসাহ এ 'বাঙালের' নেই। তাছাড়া সম্পাদক মশাই যা-ই বলুন, সম্প্রতি আমায় কোনও পাগলা কুকুরেও কামড়ায়নি। গরমটা অকালে একটু বেশি পড়েছে বটে, কিন্তু তাতে 'মট্‌কা' গরম হওয়ার লক্ষণ এখনো দেখা দেয়নি। পন্থা হিসাবে ভেবে নিয়েছি, সমালোচনা টনা নয়, মূল গ্রন্থের আনাচ-কানাচ একটু ঘুরে, দু'একটা ছোটখাটো চিম্‌টি এবং অশোক মিত্র মশাই এর লেখাটি ধরে একটু নাড়াঘাঁটা তথা খাম্‌চি টাম্‌চি দেব। ছাপতে হলে ছাপবে, না ছাপলে কচু। অশোক বাবুর মতো তপনদাকে 'সুহৃদজন' বলি, এতোবড়ো এলেমদার নিজেকে

BanglaBook.org

মনে করার কোনো কারণ ঘটেনি। আমার এই আলেখ্যটিকে বরিশালি নিরুক্তিতে যাকে 'প্যানাপোডা' বলে তাই ধরে নিয়ে পড়লেই আমি তৃপ্ত হবো। অধিক কাঙ্ক্ষা নেই। প্যানাপোডা মানে বেকার-বকবকানি।

প্রথমে অশোক বাবুর লেখাটি নিয়ে 'প্যাচালডা' সেরেনি। মানুষটি, আলাপ না থাকলেও, জানি বেশ শান্ত, ক্ষমাশীল মানুষ। দেখে তাই মনে হয়েছে। মুখের কথা শুনিনি, তবে লেখা পড়ে জেনেছি, মুখের চাইতে কলমে নির্ভরতা তাঁর বেশি। সেক্ষেত্রে, এবাবদ যদি তাঁর কলমের খোঁচাও খাই, শ্রম সার্থক হবে।

অশোকবাবু লিখেছেন, "তপন বাবুর স্মৃতি গ্রন্থটির নাম ... বাঙাল নামা রাখার বিশেষ যৌক্তিকতা নেই, বোধহয় উপযুক্ততম নাম 'বিশ্বনামা', অথবা লেখকের ইতিহাসবেত্তা সত্তার প্রতি সম্মান জানিয়ে, 'দুনিয়া নামা'। এই অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছোনোর আগে তিনি দেখিয়েছেন যে, রায়চৌধুরী মশাই "ঘোর বিশ্বায়িত পুরুষ।" আমরা যারা বাঙাল, বিশেষত বরিশালি বাঙাল, তারা যদি অশোকবাবুকে খাস বরিশালি ভাষায় প্রশ্ন করি, "ক্যান্? নামডা পাল্ডামু কিসের লইগ্যা? বইডার নাম বাঙাল নামা ক্যান্ রাহা অইছে হেয়ার একশো আটখান ব্যাখ্যা আমাগো আছে। আপনে ক্যান্ আপনার 'আপিলা চাপিলা'র নামডা বদ্‌লাইয়া আ-প্যাচ্‌লা-প্যানা রাহেন না, মানা করছে কেডা?" তাহলে আপনার উত্তর কী হবে? আর একটি কথা, সাহেবদের চোখে তপনবাবু যে 'ঘোর' এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশ্বায়িত হতে হলে তাঁর বাঙালত্ব কেন জলাঞ্জলি যাবে? বিশ্বায়িত হওয়ার ব্যাপারটা কী শুধু অঘোরী-অ-বাঙালদের? বাঙাল কী তার বাঙালত্ব বজায় রেখেও বিশ্বায়িত হতে পারে না! ব্যাপারটা আমাদের কমবোধে ঠিক ধরা পড়লো না। আর এ কারণে বইটির নাম বিশ্বনামা বা দুনিয়ানামা হতে যাবে কেন? 'নামা' উত্তর পদযুক্ত রচনাবলির মধ্যে আমরা পাই শাহনামা, বাবরনামা, হুমায়ুন নামা, আকবর নামা, জাহাঙ্গীর নামা ইত্যাদি চরিত বা আত্মচরিতগুলি, যার মধ্যে সবগুলোই ব্যক্তির চরিত অবলম্বন করেই রচিত। বিশ্ব বা দুনিয়া তো একটা স্থান, স্থানের চরিত কথা বা নামা লেখা যায় কিনা জানা নেই। তবে কালে কালে অনেক কিছুই হয়, যেমন এদানি বেহেস্তনামা, দোজখ-নামা এরকম নামায়িত কেতাবও নজরে এসেছে। এর জন্য প্রয়াত সুহৃদ্বর আখতারুজ্জমান ইলিয়াস এবং তাঁর রচিত 'খোয়াব নামা'র খ্যাতিই সর্বাধিক দায়ী। ওই বইখানি আনন্দ পুরস্কার জিতে নিলে 'নামা' লেখার মড়ক লেগেছিল। তবে খোয়াবনামা শব্দটির

BanglaBook.org

ভিন্নতর পরম্পরা আছে এবং সে দিক দিয়েও বিশ্বনামা বা দুনিয়ানামাকে দাঁড় করানো যাবে কিনা সন্দেহ। এই বিশ্লেষণ আমার অপুষ্ট মগজ-প্রসূত, সুতরাং দায়ও আমার। তপনবাবু বাঙাল, তাঁর বাপ বাঙাল, তার চৌদ্দগুষ্টি বাঙাল। এই বইয়ের নাম বাঙাল নামাই হওয়া উচিৎ। প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে বাঙালের বিশ্বরূপ দর্শন।

তপনবাবু তাঁর বইখানাতে অতি সরস ভাষায় যথেষ্ট ঠাট্টা, বুটকু কুড়ি, হাস-কাব্য ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁর নিজের, 'অগো বেঙ্গি, মগোবেঙ্গি' ইত্যাদি বান্ধবীদের এবং বিলিতি যতো বেঙ্গা বেঙ্গিদের সঙ্গে তাঁর উঠবস, দমরম, মহরম হয়েছে তাদের সবার কথা আনুপূর্ব লিখেছেন। এর মধ্যে আবার রয়েছে তাঁর গবেষক জীবন এবং দিল্লিস্থ কর্মজীবনের ব্যাপক বিবরণ, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অসাধারণ সব পণ্ডিত এবং সজ্জন মানুষদের পরিচয় তথা নানাবিধ ক্ষেত্রে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা হারামজাদাদের বিষয়ে পরিচয়ের আভাস। অশোকবাবুও এই হারামজাদাগণকে সম্যক চেনেন জানেন বলেই মৎসম বাঙালের ধারণা। কিন্তু তিনিও তাঁর 'সুহৃদ' এবং লেখককে বাঙাল-নামা নিয়ে চিম্‌টি কাটলেও, এই অবাঙাল সুলভ আভাসাশ্রয়ী ব্যাপারটি নিয়ে কিচ্ছুটি বললেন না দেখে আমরা খানিক 'ভিরমি' খেলাম। মানছি, অশোকবাবু বরিশালে জন্মাবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেননি, তথাপি বৃহৎ ব্রাদারাইড হিসাবে বাঙাল তো! 'তাইলে কী তাইনে আল্‌গা খাতিরদারি করলেন?' কথাটি তাঁর জিলার সংলাপেই জানালাম। অশোকবাবুর লেখা পড়ে তাঁর জিলার সংলাপে আর একটি প্রশ্ন করতে সাধ জাগে, 'কত্তায় কী আইবার চায়েন, না যাইবার চায়েন?' অর্থাৎ চিম্‌টিও কাটলেন আবার আদরও করলেন। কথাটা তৎসম সংলাপে বললে দাঁড়ায়, "ঝাড়িয়া কাশুন', কাশিয়া ঝাড়িবেন না। কাশিয়া ঝাড়িলে আশপাশের জনেদের বড়ো অসুবিধা।" অসুবিধের মাত্রাটা আন্দাজ করে নেবেন, পাঠক।

অশোকবাবু আর একটি 'তিরুডি' ধরেছেন তপনবাবুর লেখায়। সেটিকে তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর মুদ্রাদোষ বলে। মানুষ মাত্রেরই কিছু না কিছু মুদ্রাদোষ থাকে, বাঙালদের একটু বেশি থাকে। তপনবাবুরও আছে এবং সেটা তাঁর বাঙালত্বের সপক্ষেই যায়। কিন্তু অশোকবাবু যেটির উল্লেখ করেছেন, সেটির সাক্ষাৎ আমি বইটিতে উল্লেখযোগ্যভাবে পাইনি। 'সত্যিতে বলতে কী' এই পদবন্ধটির উল্লেখ করে অশোক বাবু বলেছেন যে এটি "শ্রুতিরোচক তো নয়ই,

BanglaBook.org

সম্ভবত ব্যাকরণবিশুদ্ধও নয়।" তপন বাবুর ব্যবহারে যে শব্দটি আমার নজরে এসেছে সেটি হলো 'সত্যিতে', ইংরাজি Infact কথাটি যেন অনূদিত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে এমন। আমার মতো আম-পাঠকের তা শ্রুতিকটু হওয়ার কথা নয়। তবে একথা মনে হয়েছে যে লেখকের বাংলা বাক্য গঠনে এবং শব্দ ব্যবহারে ইংরাজি বাক্যগঠনরীতির এবং শব্দ ব্যবহারের প্রভাব ব্যাপক। কিন্তু এজন্য উনিশ শতক থেকে বাংলা ভাষার বাক্য গঠনে, বিশেষত, চলিত বাংলায় যে রীতি পরম্পরা চালু রয়েছে, খুব কম লেখকই তার প্রভাব থেকে মুক্ত।

তপন বাবু এবং আমার, দুজনেরই পরিচিত এবং এবং নিকটজন অনেকে বলেছেন যে লেখকের ইউরোপীয় ভ্রমণাদির কাহিনী তাঁদের কাছে যথেষ্ট রোচক বোধ হয়নি। অশোক বাবুও এরকম ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং একারণেই তাঁর মৃদু চিমটি—"লেখক বাঙালকে হাইকোট দেখাচ্ছেন।" একারণেই নাকি বইটির নামকরণ হয়েছে বাঙাল নামা।' হবে। কিন্তু আমরা যারা বিলেত ব্যাপারটাকে এজন্মের মতো বিলেত ফেলে দিয়েছি, তাদের কাছে কিন্তু ব্যাপারটা ভিন্নতরভাবে রোচক বোধ হয়েছে। প্রথমতঃ আমরা যেন তাঁর অর্থাৎ লেখকের চোখ দিয়েই গোটা ইউরোপখণ্ড দেখলাম, তার রূপ, রস এবং তথাকার মানুষদের জীবনের মাধুর্য আর দুঃখ অনুভব করলাম। দ্বিতীয়ত, ইতিহাস এবং সাহিত্য রসে জারিত সুখপাঠ্য এই বইখানিতে এককথায় তাঁর জীবন-সুখটিকেই অনুভব করলাম। এই অনুভবটা লেখকের নৈকট্য বা তাঁর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতার জন্য ঘট্‌ছে, এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই। অথবা এর মধ্যে পারস্পরিক পৃষ্ঠ কণ্ডূয়ণেরও কোনো প্রয়াস যেন কেউ না দেখেন। সেক্ষেত্রে তপন বাবুর মতো একজন উঁচু মাপের লেখক তথা মানুষকে বড়ো অকিঞ্চন স্তরে নামিয়ে আনা হবে। এই কথা কটি আমি অত্যন্ত আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গেই বলছি। একারণেই নিবন্ধের শুরুতে আমি সম্পাদকের কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলাম। যাহোক, যা বলছিলাম তাই আরেকটু বলি। আমাদের কাছে গোটা ইউরোপখণ্ডই বিলেত। এতদ্দেশীয় অনেক শিক্ষার্থী এবং পণ্ডিত ব্যক্তি, অধ্যয়ন বা অধ্যাপনার উদ্দেশ্যে, বা অনেক লেখক, শিল্পী, কলাবিদ বা নিছক ভ্রমণ-পিপাসু মানুষ প্রতীচ্য এবং প্রাচ্যের নানাদেশ ঘুরেছেন। তাঁদের অনেকেই সেইসব বার্তা লিখেছেন। তার মধ্যে কারুর কারুর লেখা পড়েছি, কারুর বা পড়িনি। খোঁজ খবর রাখনেবালারা, সন্ধিৎসুরা অনেক পড়েছেন। কিন্তু সেইসব লেখা আমার মতো 'বিলেত না দেখা' কজন সাধারণ

BanglaBook.org

পাঠকের কাছে পৌঁছেছে বা যেটুকুও পৌঁছেছে, তা আমাদের কতটা মগ্ন করেছে, তাও গুণী সমালোচকদের বিশেষত যাঁরা 'বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানোর' মন্তব্য পর্যন্ত করেন তাঁদের বিচারে রাখা প্রয়োজন।

যে কোনো রচনার মধ্যেই দোষত্রুটি থাকে। তপনবাবুর লেখায় তা থাকবে না, এরকম প্রত্যাশা তিনি নিজেও করেন না। একজন মুক্তমনা এবং সুজন-সমালোচকের পক্ষে বোধহয় সমীচিন হয় সেইসব ত্রুটি বিচ্যুতি লেখকের গোচরে আনা, যাতে পরবর্তী মুদ্রণে সেগুলো সংশোধিত হতে পারে। আমার মনে হয়েছে তপনবাবু আঞ্চলিক সংলাপ যে যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন, সেগুলোর মূল উদ্দেশ্য কিছু হাল্কা হাস্যরস তৈরি করা। সেখানে শীলিত বা স্ট্যান্ডার্ড ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার কনট্রাস্ট যে রস সৃষ্টি করে তার একটা সুদূর প্রসারী ক্ষতিকর দিক আছে। এই কারণেই কলকাতার সঙ্গে গ্রামীণ বাংলার সাংস্কৃতিক সলিডারিটি মার খায়। রসিকতাটা সাময়িকভাবে মজার আবহ তৈরি করে বটে, কিন্তু অন্তর্নিহিতভাবে একটা ভেদভাব থাকেই। হয়তো লেখক ব্যাপারটা সজ্ঞানে চান না এবং এর বিপক্ষেই সোচ্চার থাকেন, কিন্তু ঊনবিংশ শতকীয় কলোনিয়াল মানসিকতার 'এলিট' পরম্পরা, ভাষা ব্যবহারে, নগর ও গ্রামের মধ্যে শিক্ষিত, অশিক্ষিত ভেদের বীজ বহন করেই। ইদানীংকার কিছু কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকারের মধ্যে দেখা যায় এই আবর্তের বাইরে যাবার সতর্ক প্রচেষ্টা অবলম্বন করতে। তবে তপনবাবু যে যে চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষা দিয়েছেন, তাঁরা চরিত্রগত ভাবেই তার উপযোগী। নইলে সেসব চরিত্র জীবন্ত হতো না। কিন্তু দুঃখের কথা, বইখানিতে এমন একটি চরিত্র নেই যে গভীর বোধ বা বোধির সংলাপ অভ্যস্ত ভাষায় বলেছে। 'কালুদা'র চরিত্রটিকে সেই পর্যায়ে হয়তো নিয়ে যাওয়া যেতো। এরকম বিচারের কোনো কারণ নেই যে আঞ্চলিক ভাষায় গভীর বোধ, বোধি বা অনুভবের সংলাপ অসম্ভব। সেসব ক্ষেত্রে ঐ ঐ চরিত্ররা যেন লাফ দিয়ে শীলিত ভাষায় অবস্থান নেন। অস্মিতার ভিন্নতাটা ওখান থেকেই উঁকি মারে। এই কথাগুলো হয়তো একটু অতিরিক্ত বলে ফেলেছি। তবে তপনবাবু যাঁদের 'হাবিলদার ঐতিহাসিক বলে চিম্‌টি কেটেছেন তাঁরা বোধহয় ছেড়ে দেবেন না।

সাদা বাংলায় বলি, বাঙালনামা আমাদের কাছে প্রকৃতই একখানি মহদ্ গ্রন্থ। কিন্তু সেজন্যই এবং গ্রন্থখানিকে অবলম্বন করে অনেক কিছুই বলার আছে বলেই তা সবই লিখতে হবে এমন কথা নেই। বইখানি সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে সমালোচক

BanglaBook.org

অশোক মিত্র মশাই-এর লেখার প্রতি সমালোচনাই বেশি করতে হল বলে, তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আর একটি আলোচনাও অশোকবাবুর বিষয়ে আছে। ধৈর্যশীল পাঠক ক্ষমা করবেন।

অশোকবাবু লিখেছেন, "এই ঠাসা কর্ম তথা বিচরণের পঞ্জিকায় বরিশাল বা বাঙাল ভূমি আর ফিরে আসার সুযোগ পায়নি। ... তিনি ঘোর বিশ্বায়িত পুরুষ। ভারতে অবসর কাটাতে তাঁর যেমন অসুবিধে হয় না, বিদেশে বাস করতে তিনি সমান স্বচ্ছন্দ। এমনকী তিনি পাণিগ্রহণ করেছেন যে বিদগ্ধা অশেষ সুন্দরী গুণবতী মহিলার, তিনি পর্যন্ত নিকষ প্রবাসিনী বাঙালিনী, শান্তিনিকেতনে কয়েক বছর কাটিয়েছেন, সেখানে সম্ভবত অনেক একদা বাঙালের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, তবে মনে হয় না নিজে কোনওদিন পদ্মা পেরিয়েছেন"। না, এই মন্তব্যটি সঠিক নয়। বই-এর চারশোতম পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ৫২ বছর পর কীর্তিপাশায় গিয়েছিলেন তিনি। সেবার এই অধম চলনদার হিসাবে সঙ্গে ছিল। তপনবাবু একা যাননি, সস্ত্রীকই গিয়েছিলেন। যাবার সময় প্লেনে গেলেও, বরিশাল থেকে ঢাকা সফরটার জন্য 'ইস্টিমারের' ব্যবস্থা হয়েছিল। সেবার শ্রীমতী রায়চৌধুরী পদ্মার কিছুটা দর্শন অবশ্য পেরিয়েছেন। বড়হিস্যার অট্টালিকার আনাচ কানাচ এবং আশেপাশের তাবৎ দ্রষ্টব্য মায় 'ভিডাবাড়ি' সবই তাঁরা দেখে এসেছিলেন সেবার। সে কাহিনী খুব সামান্যই বই-এ স্থান পেয়েছে। সুতরাং এখানেও বিস্তৃত হবার কারণ নেই। তপনদার স্বভাবে একটা 'বক্কিলা' ভাব আছে, (বক্কিলা = বখিল্লা = কৃপণ) কিছু কিছু ব্যাপারে। এই ঘটনাটির যথাযথ উল্লেখ বইতে না থাকাটা তার একটা উদাহরণ। হয়তো এই 'ফিরে দেখা' নিয়ে তাঁর ভিন্নতর কিছু লেখার ইচ্ছে আছে। আরেকটা বক্কিলাপণা হলো শ্রীমতী রায়চৌধুরীর নাম উল্লেখ যথাযথ ভাবে সেখানে না করা। অথচ তাঁর যে মুগ্ধতা এই শ্বশুরালয় দর্শনে আমরা দেখেছিলাম, তাতে মনে হয়েছিল বিশ্বভ্রমণ সাঙ্গ করেও তাঁর এই স্থানটি দেখার আকাঙ্ক্ষা অন্তরে তীব্রই ছিল। প্রায় হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল শুধু বড়হিস্যার 'পোলাডা আর হেনার বৌরে দ্যাখ্‌থে'। সভা হয়েছিল সেখানে, আবেগ বিহ্বল, তপনবাবু চিরঘোষিত নাস্তিক্যকে পাশে সরিয়ে রেখে বলেছিলেন, "এ আমার তীর্থ দর্শন হল।" ঐদিন আমি বাঙালি নিম্ন বর্ণবর্গের সামন্তপ্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখেছিলাম। কয়েকশো হিন্দুমুসলমান মানুষ রাস্তায় সাষ্টাঙ্গ হয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করেছিল। কিন্তু বক্কিলা তপনদা তার উল্লেখই করলেন না।

সর্বশেষ কথাটি তপনবাবুর বক্কিলাপণা নিয়েই বলবো। যদিও অশোকবাবু তাঁকে 'বিদগ্ধা, অশেষ সুন্দরী, গুণবতী' বলে উল্লেখ করেছেন, তপনদা কিন্তু কোথাও পত্নীর সৌন্দর্য ছাড়া অন্য কিছুর উল্লেখ করেননি। সৌন্দর্য নিঃসন্দেহে এক বিরল প্রতিভা, কিন্তু আমরা তো জানি অশোকবাবু সত্যভাষণই করেছেন। তিনি যে বিদগ্ধা এবং গুণবতী তার পরিচয় দিলে কী তপনদার পৌরুষের হানি ঘটতো? ব্যাপারটার দিকে নারীবাদীদের এখনো নজর যে পড়েনি এই রক্ষা। পড়লে ঠেলা বুঝবেন।

তাঁর ভীমরতি প্রাপ্তর পরচরিত চর্চার ভূমিকায় দেখেছি পত্নীপ্রেমের সাহেবি ন্যাকামো বা অদেখ্‌লেপনা ওঁর পছন্দ নয় (পাঠক সেখানকার উপদেশটি স্মরণ করুন)। কিন্তু শ্রীমতী রায়চৌধুরীতো ওনার শুধু পত্নী নন, প্রেমিকাও। আমাগো দেশি কথায় কইলে কইতে অয়, পেরায় আত্মীয়ের ল্যাহান, ঘোনো আত্মীয়ও কওন যায়।' তার উপর অসীম লাঞ্ছনা এবং দুঃখ সাগর পেরিয়ে তিনি এসেছেন তপনদার জীবনে। তিনি নিজেই তাঁর এই 'মুক্তামালা', প্রাপ্তির বিষয়ে উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেছেন (মা কালী, মালাটি কার বা কীসের গলায়, তা নিয়ে কিছু বলিনি কিন্তু, যা বলার উনি নিজেই লিখেছেন এবং নিঃসন্দেহে উনি সত্যবাদী)। তাই বলছি, এতসব কথা লেখার জায়গা হল, খালি গুণ বর্ণনার ক্ষেত্রেও উনি তুষ্ণী থাকলেন!

এইজন্যেই কালিদাস হংসপাদিকার মুখ দিয়ে সব যুগের সেরা নারীবাদী শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়েছেন, 'সকৃৎ কৃতো প্রণয়ো অয়ং জনঃ'। কথাটি উত্তম, মধ্যম, অধম সব মরদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

তপনদা তাবৎ ছ্যাব্‌লা রচনাসমূহের উত্তম পরিপোষকতা আশা এবং প্রার্থনা, আমার এই ছ্যাব্‌লাতম লেখাটিও উনি ক্ষমা করবেন।

অলমতিবিস্তরেণ।

পূঃ 'বাঙালনামা' নিয়ে একটি আলোচনা লিখতে অনুরুদ্ধ হয়েছিলাম একটি নামী দৈনিকের তরফ থেকে। অনুরোধ বা অনুজ্ঞাটি যথাযথভাবে দপ্তরীয় পথ ধরে লিখিতভাবে আসেনি। ইতোমধ্যে অশোক মিত্র মশাই গ্রন্থটির একটি উপযুক্ত সমালোচনা লেখেন। আমার রচনাটি তখন অধিকন্তু হয়ে যায় এবং অনাদরে নিজের কাছেই ফাইলবন্দী থাকে। এখন সেটির খোল নলচে বদলে বর্তমান লেখাটির নির্মাণ হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রচনাটি কোনো অর্থেই 'বাঙাল-নামা'র পর্যালোচনা নয়, একান্তই বইটি অবলম্বন করে একটি স্বাধীন রচনামাত্র।

----o----

BanglaBook.org

অস্তমিত রবি, এবং মিডিয়া ও বিদ্বজ্জনী উপেক্ষা

রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত চলে গেলেন (১১/৭/১৯১৫—৩/২/২০০৯)। স্মৃতি তর্পণের নামে তাঁর বিষয়ে দুকথা বলি, এমন ক্ষমতা আমার নেই। তথাপি কিছু এলোমেলো কথা বলতে বসেছি। তাঁর পরমপ্রিয় অনুজপ্রতীম হীরেন মুখুজ্জে মশাই আগে ভাগে বিদায় না নিলে, আমরা হয়তো তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে এই শোকবার্তাটি শুনতাম "একটা ইন্দ্রপাত হয়ে গেল।" সারস্বত সমাজের অনেক শ্মশ্রু গুম্ফধারী তাবড়ো সংস্কৃতি ও সমাজ-মনস্ক, অধুনা প্রথিত বা প্রার্থিত যশা রথী মহারথীরাও হয়তো কথাটা শুনে, মগজ হাতড়াতেন, রবীন্দ্র কুমার কে, কী, বা 'ইন্দ্রপাত' এর সঙ্গে সেই মানুষটির তিরোধানের সম্পর্কই বা কোথায়। অথবা 'ইন্দ্রপাত' কথাটার তাৎপর্যই বা কী? মিডিয়ার ছবিতে যেসব বুদ্ধিজীবীদের দেখি বা বাণী শুনি, তাতেপ্রাথমিক প্রতিক্রিয়া বোধহয় এমনটিই স্বাভাবিক। সংবাদ মাধ্যমে কর্মরত যাঁরা, তাঁরা বোধহয় ভাবলেন যেহেতু রবীন্দ্রকুমার কোনো একজন রাজনৈতিক নেতা নন, প্রসিদ্ধ কোনো চিত্র নক্ষত্র বা উল্কা নন, তাই বাণিজ্য সম্ভাবনাহীন এই সংবাদে তাঁদের চঞ্চল হওয়ার কোনো হেতু নেই। খবরটা দেখা গেল শুধু দূরদর্শনের পর্দার তলায় ধাবমান একটি প্রায় ছায়াময় বাক্যে। যেন রবীন্দ্রকুমার অজস্র অপসৃয়মান ছায়া শরীর প্রাপ্তদেরই একজন, যেন তাঁর কথাশরীর প্রাপ্তির অধিকারই নেই। ব্যাপারটা আরো প্রকট লাগলো যে পর্দার তলার বড়ো বাক্যগুলো ছিলো ভোটের জোটে কারা কোনদিকে থাকবেন সেই বিষয়ে। সংস্কৃতি সেবায় আমাদের দায়বদ্ধতা কী অসাধারণ!

কিন্তু শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে গিয়ে প্রথমেই পরচর্চা করা অন্যায়। বিশেষ রবীন্দ্র কুমার এই কর্মটি নেহাৎ বাধ্য না হলে, অথবা বিশেষ কোনো ব্যক্তিত্বের দ্বারা অনুরুদ্ধ না হলে করতেনই না। এপ্রসঙ্গে তাঁর বাঙালি কী আত্মঘাতী ও অন্যান্য রচনা'য় গ্রন্থিত প্রবন্ধাবলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কিন্তু সেসব পরের কথা। আপাততঃ আমাহেন নির্বুদ্ধিজীবি ইতর জনের জ্ঞাতার্থে কিছু সাধারণ সংবাদ সংক্ষেপে জানানো প্রয়োজন। এভাবেই নিজেরও জানা হবে।

BanglaBook.org

জন্ম অবিভক্ত বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশের) বৃহত্তম বরিশাল জেলার মাহিলাড়া গ্রামে। অন্য অন্য বাঙাল প্রবাসী এবং উদ্বাস্তুদের মতো রবীন্দ্রকুমারেরও 'দেশ' মানসিকভাবে তাঁর গ্রামই। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে সেটা ক্রমশ বড়ো হতে হতে গোটা বিশ্বকেই অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল এক সময়। প্রচলিত অর্থে তিনি উদ্বাস্তু ছিলেন না, কিন্তু মাহিলাড়ার প্রসঙ্গে তাঁর মানসিকতাটি ছিন্নমূলীয়, এরকমই বরাবর দেখেছি। অথচ মাহিলাড়া গ্রামে তাঁর অবস্থিতি ছিল মাত্র বছর দশেকের। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আপার প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষারম্ভ থেকে তিনি প্রায় গোটা জীবনই কোলকাতা প্রবাসী। ১৯৩৩-এ মেট্রিক, ৩১ থেকে ৩৫-এর মধ্যে আই. এ. ও বি. এ. (অনার্স) এবং ১৯৩৭ এ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ইংরাজি সাহিত্যে এম. এ.। ১৯৩৮ থেকে ৪৫ এই বিশ্ববিদ্যালয়েই Post graduate tutor হিসাবে কাজ করেন। ১৯৪১-এ Medieval Heritage of Elezabethan Comedy বিষয়টি নিয়ে রিসার্চ করে লাভ করেন পি. আর. এস. ডিগ্রি। European Influence of Bengali Literary Criticism নিয়ে গবেষণা করে ১৯৫০-এ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. ফিল করে ডিগ্রি পান। তাঁর কর্মজীবন এবং শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আলাদা ছিল না। বোধি বা প্রজ্ঞান্বেষী এই তপস্বীধর্মী মানুষটি জীবনভর গবেষণার কাজ করেই কাটিয়েছেন। তাঁর গবেষণার স্বীকৃতি হিসাবে তিনি ১৯৪৯ সালে মোয়াট গোল্ড মেডেল পান। বিষয় ছিল The Antichivalric and Anti Acquisitive Tradition in the comedies of Benjonson। ১৯৫৭-তে Milton's theory of Poetry'র উপর গবেষণা করে লাভ করেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ডি. ফিল ডিগ্রি। ইংরাজির বাঘা ছাত্রেরাও নিশ্চয় স্বীকার করবেন গবেষণার বিষয় হিসাবে এই নির্বাচনটি কী প্রচণ্ড দুঃসাহসিক কাজ ছিল। শুনেছি তাবড় সাহেব ধুরন্ধরেরাও এব্যাপারে পাঁচবার ঢোক গেলেন। প্রখ্যাত অধ্যাপক Helen Gardener এ ব্যাপারে তাঁর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

BanglaBook.org

আজীবন গবেষক এই মানুষটি ১৯৭২-এ মাইকেল মধুসূদনের উপর প্রবন্ধ লিখে সরোজিনী গোল্ড মেডাল পান। ১৯৯০-এ কালিদাস নাগ মেমোরিয়াল গোল্ড মেডালও তিনি লাভ করেছিলেন।

কর্মসূত্রে তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ, সগর বিশ্ববিদ্যালয়, Central College of Agriculture, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের Tagore Professor of Bengali in Department of Modern Indian

Languages-এ যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৭-এ অবসর গ্রহণের পর তিনি National Library-র প্রথম Director হিসাবে যোগ দেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে কাজও তিনি যথেষ্টই করেন এবং সুযোগ ও সমাদর থাকা সত্ত্বেও কোথাও স্থায়ী চাকুরি সূত্রে তিনি আবদ্ধ হননি। তাঁর দৃষ্টি সততই স্বদেশের দিকে নিবদ্ধ ছিল।

পত্র পত্রিকায় যথেষ্ট প্রবন্ধ নিবন্ধাদি লিখলেও পুস্তক রচনার ব্যাপারে যেন তাঁর তীব্র অনাসক্তি এবং আলস্য ছিল। তাঁর লেখা পড়লে কখনো এমন মনে হয় যে বই-এর জগতে প্রকাশনার বর্তমান স্ফীতি তাঁর একান্তই অপছন্দ ছিল। তাঁর গুণগ্রাহীদের প্রচেষ্টায় মাত্র খান তেরো বই এযাবৎকালে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে বাংলা বই-এর সংখ্যা মাত্র পাঁচ। হয়তো পরবর্তীকালে খুঁজে পেতে আরো কিছু প্রবন্ধাদি সংগ্রহ হলে বই-এর সংখ্যা কিছু বাড়তে পারে।

তাঁর সব রচনাই প্রবন্ধধর্মী এবং মননশীল। সংখ্যায় নগণ্য হলেও তাঁর একখানাও ভারবত্তায় নগণ্য নয়। মানুষটি ব্যক্তি হিসাবে যেমন সদারসিক, সহজ, সরল, মননের এবং প্রকাশের ক্ষেত্রেও তেমনি, কোথাও যেন জটিলতার লেশমাত্র নেই। রসিকতার প্রকাশ অবশ্য রচনার মধ্যে প্রায় নেই, যা কিছু সবই কথা গল্পে। কিন্তু সারল্য সর্বপ্রকার রচনায়ই লভ্য এবং কোথাও তা পণ্ডিত্যের গভীরতার অন্তরায় নয়। প্রতিটি কথা এবং ভাবই তাঁর রচনায় যেন অতলান্তিক গভীরতায় ধ্রুপদী। উদাহরণস্বরূপ তাঁর বিবেকানন্দের দ্বৈত এবং অদ্বৈত বেদান্তের মীমাংসাগুলির উপর বক্তৃতাবলির উল্লেখ করা যেতে পারে। তত্ত্ব জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বাঙালির নিজস্ব মানসের প্রকাশ যদি কোনো বাঙালি মনীষীর ক্ষেত্রে ঘটে থাকে তবে তিনি রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত। তাঁর বাঙালিয়ানা বাঙালি জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্রত্বে আবদ্ধ ছিল না।

তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রগাঢ়তার বিষয়ে একমাত্র নীরদ সি চৌধুরি মশাই ছাড়া কেউ কখনো অবজ্ঞা প্রদর্শন করেননি। তবে যাঁরা 'বাঙালি কী আত্মঘাতি' ইত্যাদি রচনাগুলি পড়েছেন, তাঁরা জানেন, সরস অথচ অব্যর্থ বাক্য এবং শব্দ সায়কে, যথোচিত ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে, বিদ্রূপ বা ব্যক্তিক চরিত্র হননের কোলাহলে না গিয়েও কীভাবে রবীন্দ্র কুমার প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করেছেন। কিন্তু সেখানে অসূয়া বা ক্রোধের চিহ্নমাত্রও আমরা দেখিনা। এরককম সংযম রবীন্দ্রকুমারের মতো যথার্থ মনীষার ক্ষেত্রেই সম্ভব। অধুনাকার অনেক বিদ্বজ্জনের আচরণে যখন বিনয়ের ন্যূনতা প্রকট দেখি তখন তাঁর আচরণটি 'বিদ্যা বিনয়ং দদাতি'

BanglaBook.org

শ্লোকটির প্রতি নতুন করে বিশ্বাস স্থাপন করার ইচ্ছা জাগায়। কিন্তু কাদের সঙ্গে আমি কার তুলনা করতে যাচ্ছি!

মূলতঃ ইংরাজি সাহিত্যের লোক হলেও সারস্বত চর্চার খুব কম ক্ষেত্রেই তাঁর পদপাত ঘটেনি। দর্শন এবং সমাজ ইতিহাসের ক্ষেত্রে তো তাঁর বিচরণ রীতিমতো Scholar-Extra ordinary-র পর্যায়ের, যা ঐ ঐ বিষয়ের স্বনামধন্য পণ্ডিতদের কাছেও ঈর্ষণীয়। এত সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়েও মৃত্যুর কয়েকমাস আগে পর্যন্ত এরকমভাবে স্মৃতিকে সতেজ রাখা এবং মনন ও প্রকাশে কর্মক্ষম থাকা বস্তুতই এক আশ্চর্য ব্যাপার। এই ক্ষমতাটি সত্যই তাপসোচিত।

তাঁর রচনা নিয়ে ব্যাপক আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। অথচ অত্যন্ত অপটু এবং অযোগ্য হাতে তাঁর স্মৃতি তর্পণের ভার অর্পিত হয়েছে। প্রচারবিমুখ, কেরিয়ার বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ, শুধুমাত্র বোধি বা প্রজ্ঞান্বেষী এক সতত গবেষক ব্যক্তিত্বকে কীভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা যথার্থ হয় জানি না। তাই প্রথাসিদ্ধ স্মরণ-মনন অর্থাৎ Obituary রচনায় যাচ্ছি না। বেশ কিছুকাল ব্যক্তিগতভাবে তাঁর স্নেহসান্নিধ্য পেয়েছি। এই রচনা খানিকটা সেই প্রেক্ষিতেই। প্রার্থনা, পাঠক এই অযোগ্যের ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন।

তাঁর সংসর্গে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা জানেন যে তিনি মননের দিক দিয়ে এক ক্লান্তিবিহীন পরিব্রাজক ছিলে। তাঁর সেই প্রব্রজ্যা হৃদয়-অন্বেষী। একারণেই বোধহয় আজীবন গবেষণা কর্মে রত থাকলেও তাঁর একটি রচনায়ও একাডেমিক যুযুৎস্যুর প্যাঁচ বা পাণ্ডিত্যমন্যতার আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায় না। ইংরাজি Quest শব্দটিতে যা বোঝায়, সেটাই সারাজীবন ধ্রুব করে রেখেছিলেন তিনি। হৃদয়ের সন্ধান ব্যাপারটি যেন তাঁর কর্মকাণ্ডের মধ্যের সহজ-সাধনা, যা সহজ কিন্তু ধ্রুপদী গভীরতায় ঋদ্ধ। এটাই কী যাকে অনেক মহাশয় ব্যক্তিরা বাঙালি রেঁনেসাঁর স্পিরিট বলেন তাই? সেই স্পিরিট বিষয়ে সম্যক ধারণা না থাকলেও নিঃসন্দেহে এটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে রবীন্দ্রকুমার আদ্যন্তই ছিলেন Classical magnanimity তে ওতপ্রোত এক ব্যক্তিত্ব, যার নমুনা তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে লুপ্ত হয়ে গেল।

তাঁর সঙ্গে পরিচিত অনেকেই তাঁর মুখে, একাধিকবার T. S. Eliot-এর The Rock থেকে উদ্ধৃতি শুনেছেন,

Where is the wisdom?
we have lost in knowledge

Where is the knowledge?
we have lost in information.
Where is the life?
we have lost in living.

বার বার Eliot কর্তৃক ব্যবহৃত উপনিষদের তিনটি শব্দের উল্লেখ তাঁর মুখে বোধহয় প্রায় সবাই শুনেছেন, দত্ত, দম্যত, দয়ধ্বম্। এইসব কথার পেছন থেকেই উঁকি দিতে থাকে হৃদয় নামক সেই একদা শস্যপূর্ণ প্রান্তর, যা অধুনা ক্রমশ মরুময় হয়ে যাচ্ছে বলে বিশ্বাস রবীন্দ্রকুমারের। একারণেই বার বার তিনি উচ্চারণ করতেন, 'The world is sinking under the dead weight of printed knowldege. হৃদয়ের ক্রমশ অবলুপ্তি তাঁকে বড়োই ক্লিষ্ট করত।

তাঁর হাতে পর্যালোচনার জন্য আসা কোনো গ্রন্থে যদি তিনি একটুও হৃদয়ের ছোঁওয়া পেতেন, নির্দ্বিধায় তাঁর কলম থেকে একটি বাক্য অবশ্য নির্গত হতো, "বাঙলা ভাষায় এমন আর একখানি বই পড়ি নাই।" প্রশংসার এই 'তর' 'তম' আধিক্যে স্বয়ং লেখকও হয়তো অস্বস্তিতে পড়তেন। কিন্তু রবীন্দ্রকুমার কখনো বিরূপ সমালোচনা করেছেন, তেমন দেখিনি।

তত্ত্বগতভাবে, রবীন্দ্র কুমারের প্রস্থান নিঃসন্দেহে ভাববাদী দর্শনে। যে কথা আগে বলেছি যে, মূলত তিনি ইংরাজি সাহিত্যের লোক হলেও তাঁর গতিবিধি ছিল সর্বশাস্ত্রে। দর্শনকে তিনি জীবনের সবচাইতে বড়ো আসনখানা দিয়েছিলেন, যদিও স্বয়ং দর্শনের প্রথাগত ছাত্র ছিলেন না। কিন্তু সেজন্য ঐ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানার্জন কিছুমাত্র ব্যাহত হয়নি।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ লিখেছেন, "He has long been known as a specialist in English Literature but he has now emerged as a specialist in other fields also. (Forward to Swami Vivekananda on Indian Philosphy and literature–2nd Print, Sept 2005, The Ramkrishna Mission Institute of Culture)। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ তাঁর Forwarding টি শেষ করেছেন এই বলে যে, "I hope readers will enjoy reading this book." হবে হয়তো। তবে সেই enjoyment আস্বাদ করার মতো Reader আমাহেন ব্যক্তিরা বোধহয় নয়। তবু বলবো, লোকেশ্বরানন্দজীর কথাটি যথার্থ।

রবীন্দ্র কুমার তত্ত্বগতভাবে যে ভাববাদী দর্শনাশ্রয়ী আমার এই উক্তিটি তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন সময় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এবং তাঁর নানাবিধ আচরণে আমার ধারণা হয়েছে। এমনকী তিনি যে ঈশ্বর বিশ্বাসীও একথাও তিনি বলেছেন

BanglaBook.org

প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসিত হয়ে। কিন্তু তিনি যে বস্তুবাদি দর্শনেরও উত্তম পাঠক তার পরিচয় পাই "অলীক সংলাপ" বইখানি (প্রকাশক গাঙচিল) পাঠ করার পর। বইটি পড়ে তাঁর Quest এর ব্যপ্তির কথাই প্রথমত আমার মনে হয়েছে। এবিষয়ে তপন রায়চৌধুরি মশাই-এর পর্যালোচনার একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করবো। অংশটি এরকম—

"বিদ্রূপের কষাঘাত সুস্থ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানে সমুজ্জ্বল এই মানুষটি আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের বিশিষ্ট সম্পদ। ওঁর পীড়াবোধ আমাদের বিচলিত করলে আমাদের মঙ্গল। কিন্তু ওঁর সব মূল্যায়ন আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে বিচার বিপ্রমের আশঙ্কা। "অলীক-সংবাদ" ছাড়াও The Statesman-এ বাংলা ও ইংরাজিতে প্রকাশিত সাম্প্রতিক অতীতে তাঁর কিছু প্রবন্ধেও মার্কসীয় দর্শন বিষয়ে তাঁর লেখা পড়ে বোঝা যায় যে তিনি কত গভীরভাবে এই দর্শন বিষয়েও পড়াশোনা করেছিলেন। প্রসঙ্গত, ২০০৫-এর ৩০শে জুন এবং ১লা জুলাই প্রকাশিত একই প্রবন্ধের দুইটি অংশে তিনি মার্কসিস্ট পার্টিকে তাত্ত্বিক দিক থেকে তীব্র সমালোচনা করেন। প্রবন্ধটির নাম Whither Philosophy?–Party must justify calling itself Marxist. সেই প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে কেউ প্রতি-প্রবন্ধ লিখেছেন বলে চোখে পড়েনি। প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অংশের Sub-Title ছিল Western Resistance to Indian Idealism. এর আগেই ২৬/০১/০৫ তারিখে বাংলা Statesman-এ বেরিয়েছিল একটি প্রবন্ধ। "দেশে এখন মনীষার দৈন্য চরিত্রের দৈন্য ততোধিক, মনীষী ও চরিত্রবানরা সরব হতে পারলেই পরিবর্তন সম্ভব" এই শিরোনামে। এর প্রতিকার কীভাবে সম্ভব, সেই বিষয়েও তিনি কিস্তিতে একটি প্রবন্ধ The Statesman-এ তিনি লিখেছিলেন। সেখানে আগ্রাসী যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একক কর্তৃত্বের বিরোধিতা করে তিনি বিকল্প এক শান্তিময় বিশ্বের কথা বলেছেন। সেই লেখারও কোনো প্রত্যুত্তর নজরে আসেনি, যদিও রবীন্দ্র কুমারের বস্তুবাদী অন্বীক্ষা এবং তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা যে সমালোচনার উর্দ্ধে এমন মনে হয়নি। তবে কিনা সেক্ষেত্রেও প্রত্যুত্তরকারীর তাত্ত্বিক কোমড়ের জোর যথেষ্ট পোক্ত হবার প্রয়োজন ছিল এবং আছে। তাঁর এইসব লেখাই বেশ একটা ধারাবাহিকতা ধরেই প্রকাশিত হয়েছিল। জানি না, ইংরেজি বা বাংলা কোনো সংগ্রহে এই লেখাগুলো গ্রথিত হয়েছে কিনা।

সর্বশেষ আর দু'একটি সংবাদ বলে এই গোত্রহীন রচনাটি শেষ করব। সেই সংবাদগুলো ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় প্রাপ্ত খুঁটিনাটি। সবাই জানেন নীরদ সি.

BanglaBook.org

চৌধুরি মশাই তাঁর বাংলা কাব্যপাঠের একটা নির্ধারিত সময়সীমা টেনে দিয়ে ছাপার অক্ষরে জানিয়েছিলেন,—অত্র অগ্রে ন গচ্ছামি। কারণ, কিন্তু কারণের কথা এই নিবন্ধে উপস্থিত অনুল্লেখ থাকুক। সেটা রবীন্দ্র পরবর্তী কবিদের ক্ষেত্রে বড়োই অশ্রদ্ধেয় হবে। রবীন্দ্রকুমারের কাছে আমার যাতায়াতের শুরু ২০০৩ সাল থেকে। কারণে, অকারণে তখন প্রায়ই তাঁর কাছে যেতাম। একদিন কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, বাংলা কবিদের ব্যাপারে নীরদ. সি. চৌধুরি মশাই-এর মতো তাঁরও কোনো লক্ষ্মণগণ্ডি আছে কিনা। তিনি বলেছিলেন, আমি সামান্য পড়াশোনার মানুষ, বেশিতো পড়িইনি, বোঝার সামর্থও বড়ো কম। যেমন ধরো এই 'আধুনিকতা' নিয়ে যে নানান কথা হয়, আমি তার সঠিক মর্ম বুঝি না। তেমনি বুঝি না Post-modernism-এর তত্ত্ব, একেবারেই না। একটা গান শুনলে যেমন বোঝার চেষ্টা করি, তার মধ্যে সঙ্গীত বস্তুটা আছে কিনা, তেমনি ছন্দোবদ্ধ একটি রচনায় খুঁজি কবিতা অর্থাৎ Poetry তার মধ্যে আছে কিনা। প্রাচীন বা আধুনিক এরকম ভাগবিচার আমার নাই। তা যদি Collective রচনা হয়, তবে খুঁজি কাব্য বা Poesy বলতে যা বুঝায় সেটা পাই কীনা। আমার ক্ষেত্রে লক্ষ্মণগণ্ডি কিছু নেই। তবে জীবনানন্দর পরে আমার বিশেষ গতিবিধি আর নেই।

জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন শঙ্খ ঘোষ? তিনি প্রায় জিভ কেটে বলে উঠেছিলেন, আহা শঙ্খ তো আমার অতি প্রিয়। খুউব ভালো ছেলে। আমি একটু ঠেঁটার মতো বলেছিলাম, আমি তাঁর কবিতা, কাব্যের কথা বলেছিলাম—রবিদা সরাসরি উত্তর না দিয়ে শঙ্খ ঘোষের বেশ পুরোনো একটা কবিতা থেকে মুখস্থ বললেন।

" ... কোন্ ক্ষেতে বা কোন্ খামারে সমবেত লোকজনেরা
জমছে এসে শাস্ত্রপাণি বলো আমায় হে সঞ্জয়
সমবেত লোকজনেরা কোথায় কখন কী করছে তা
শোনাও আমায়, অন্ধ আমি, শোনাও আমায় হে সঞ্জয়।
শোনাও আমায় শোনাও আমায় শেষের সেদিন হে সঞ্জয়।

আবৃত্তিটি শেষ হলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, উত্তর পাইলা? মাঝে মাঝে দেশি বুলি বলতেন তিনি। বললাম, পাইছি, তয় এইসব লইয়া আপনে একটা ল্যাখলে ভাল হয়। বলেছিলেন—লিখছি তো এদিক ওদিক কম না, মাঝে মাঝেই। তাঁর নাকি লেখা একদম ভাল হয় না, আর কবিতা একদম মুখস্থ থাকে না। রঙ্গ করে বলেছিলাম, সত্যি ঐ একটা আপনার বড়ো দোষ।

BanglaBook.org

শেষ দেখা করতে যাই ২০০৮ এর ফেব্রুয়ারি মাসে। শরীর ভাল ছিল না। কথা বলতে বলতে ঝিমিয়ে পড়ছিলেন। তাঁর সেই ঝিম ধরা চেতনায়, মস্তিষ্কের অলিগলিতে কোন্ তত্ত্ব বা কোন্ কাব্যে পঙ্‌ক্তি ঘোরাফেরা করছিল, সে খবর জানি না। মনে হত কী ছোট আমরা! কতো যে ছোট! ইদানিং তো দেখছি, সৃজনশীলতার জন্য যাদের মস্তবড়ো আসন দিয়েছিলাম, মননের জগতে তাঁদের দীনতা কী অতল স্পর্শী, মননের চাইতে লোভের ব্যাপারে তাঁরা কত মনযোগী।

ঊনবিংশ শতকীয় বাঙালি রেঁনেসাঁকে আজকের পণ্ডিত, বিদ্বজ্জনেরা কেউ মান্যতা দেন, কেউ বা ঠোঁট ওল্টান। বাঙালির আলোকোজ্জ্বল কোন কিছুর মধ্য থেকে কালিমা খুঁড়ে বের করতে তাঁরা যেন প্রায় sensual হর্ষ উপভোগ করেন। মনে করেন সেটাই পাণ্ডিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা। রবিদার ব্যাপারটা ছিল তার উল্টো। বাঙালির গৌরব প্রচারে,তাঁর কলম ছিল আরবী অশ্বের মতোই প্রাণোচ্ছল। সেখানে তাঁর নজরে কোনো লাফাঙ্গা বুদ্ধিজীবীর আপস্টার্ট 'নছল্লা' ধরা পড়লে তার আর রক্ষা ছিল না। বাঙালি এবং রবীন্দ্রনাথকে আত্মঘাতী বলে নীরদ. সি.কে মূল্য দিতে হয়েছিল।

তবে কিছু মানুষ এখনো আছেন যাঁরা রবীন্দ্রকুমারকে বাঙালি রেঁনেসাঁর শেষ প্রতিভূ হিসাবে মান্যতা দেন। তা প্রথমোক্তরা 'বিগবাজারের' উন্মত্ততায় মঞ্চের নিয়ন-আলোকিত অংশে থাকুন, আমরা বরং অন্ধকার অংশে একটি মাটির প্রদীপের আলোয় বসে এই শেষ প্রবাদী ঋষির তিরোভাব উপলক্ষ্যে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা এবং অশ্রুর অর্ঘ্য নিবেদন করি।

— o —

BanglaBook.org

ব্রতধারিণী মা ও তাঁর দুঃখী সন্তানের কথা

'কাল আমি মা'র সাথে অনেকক্ষণ কথা বলেছি। অদ্ভুত বৃদ্ধা। একদা আমাকে জন্ম দিয়েছিলেন। সম্ভবত/এখন বিশ্বাস হতে চায় না।/আমাকে দেখলেন। আমার গরম লাগছিল।

বুড়ি হেসে তসবীহ টিপতে লাগলেন/তোর যেখানে জন্ম হয়েছিল, মনে আছে?/

নিম গাছের নীচে ছনের চালায়।/

আমি কাপটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললাম,/

না, মা, কিছু মনে নেই।'

(কিছু মনে নেই—আল মাহ্‌মুদ)।

মনে পড়িয়ে দিলেন দয়াময়ী। 'দয়াময়ীর কথা' বইটি পড়ে আমি এক ভীষণ পড়ুয়া দাদার কাছে গিয়ে জানিয়েছিলাম এই অসম্ভব বইটির কথা। আমরা ভাই-বোনেরা সবাই এরকম করি। আমরা দয়াময়ীর কিশোরীকালে, সেই মাটিতে কিশোর-কিশোরী বা শিশু ছিলাম। এ কারণেই সম্ভবত এরকমটা ঘটে। এখন আমাদের মধ্যে কেউ বুড়ো-বুড়ি, কেউ বা প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া। 'দয়াময়ীর কথা'-র দয়াময়ীও তাই। তাই বোধহয়, আমরা এরকম একটা 'কামারাদারি' (Camaraderie) বোধ করি। দাদাকে বইটির বিষয়বস্তুর কথা বলার সময়, সম্ভবত আমার আবেগোচ্ছলতা স্বভাবগতভাবেই বাড়াবাড়ি রকমের হয়েছিল। আসলে ব্যাপারটা তো শুধু বিষয়বস্তু নিয়ে নয়, আমি প্রাণপণে চাইছিলাম দয়াময়ীর অনবদ্য প্রকাশ-ভঙ্গিমা, যার সাহায্যে তিনি তাঁর কিশোরীকালের সেই করুণ আর নিবিড় আর স্নিগ্ধ আত্মাটিকে বয়ে আনতে আনতে, এই প্রায়-সায়াহ্ন কালে গোটা যন্ত্রণাটিকে আমাদের সামনে অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে প্রস্ফুটিত করেছেন। কিন্তু আমার মুগ্ধতা কিছুতেই আমি দাদার কাছে সবিস্তার ব্যাখ্যা করতে পারছিলাম না। তখন দাদা আল মাহ্‌মুদের উপরিউদ্ধৃত কবিতাটির একটিমাত্র পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করে, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৌনতায় মুখর হলেন। পঙ্‌ক্তিটি, 'তোর যেখানে জন্ম হয়েছিল, মন আছে? নিম গাছের নীচে ছনের

BanglaBook.org

চালায়।' কবিতাটিটা আমিও পড়েছিলাম, কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম। তাই, বইটি পড়ার সময়েও পঙ্‌ক্তিটি আমার স্মরণে আসেনি। তবে দাদার ধরতাইয়ে তা কলকল করে যেন আমাকে মুহূর্তে একেবারে উথালপাথাল করে দিল। আসলে তাঁর আর আমাদের দুঃখমূল তো এক।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমার কাছে আমার এই দাদা লেখকের (লেখিকা শব্দটি সচেতনভাবেই ব্যবহার করছি না, অনেকে অসন্তুষ্ট হন) 'মাজম দাদার'-ই সগোত্র, যদিও তাঁদের মধ্যে অবস্থানগত ভিন্নতা আছে। কিন্তু ব্যাপারটা হৃদয় সংক্রান্ত।

'দয়ময়ীর কথা' বইটি লেখকের আত্মজৈবনিক স্মৃতিকথা হলেও পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী নয়। জন্মকাল (১৯৫১) থেকে একটি দশককে (১৯৬১ সাল পর্যন্ত) মাত্র তিনি তাঁর এই স্মৃতি-আলেখ্যে ধরে রেখেছেন। সবাই মানবেন, এই সময়টা বা আরও খানিকটা এগিয়ে, মানব-মানবীর সেই বয়স, যখন আশ্চর্য মায়াকাজলে যেন তাদের চোখে চরাচরের, বিশেষ করে তাদের আশপাশের সব কিছুকেই এক পরম রহস্যময়তা দিয়ে ঘেরা মনেহয়। দিনে-দিনে তার জন্য বিস্ময়, বিমুগ্ধতা, আনন্দ, বেদনা বা বিহ্বলতায়, অজ্ঞাতসারেই যেন এক সম্মোহনের দেশে তারা এগোতে থাকে। এই সম্মোহনেরও একটা স্মৃতি সঞ্চিত হতে থাকে তাদের মনে, যা ঠিক কোনও অভিজ্ঞতার স্মৃতি নয়। কেন না অভিজ্ঞতার জন্য যে বিচারবুদ্ধি দরকার, তখন পর্যন্ত তা তাদের আয়ত্তে থাকে না, অথবা থাকলেও তা নিতান্ত অপুষ্ট। এই সম্মোহন-কালের স্মৃতি বড় গভীর তাৎপর্যে তাদের মধ্যে কিছু চিরস্থায়ী দুঃখ, বেদনা, আনন্দ ইত্যাদি সঞ্চিত রাখে এবং এই আন্তর-নির্মাণের সময় বৃক্ষ, লতা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষ, অর্থাৎ তাবৎ প্রাকৃত-সমুচ্চয় বাস্তবকে ছাড়িয়ে যেন এক অধিবাস্তবতায় তাদের শুদ্ধচেতনায় ধরা থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে এই অধিবাস্তবতা লুপ্ত হতে থাকে, কিন্তু চেতনার কোনও একটা স্তরে থাকে এর থেকেই উদ্ভূত এবং বিকশিত এক বিশ্বাস। দয়াময়ীর কথা সেই বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই বোনা হয়েছে।

এই বয়সের মানুষ-মানুষীর অবস্থান, এই সময়কালে যদি পল্লীগ্রামে হয়, তবে সেখানের তাবৎ অনুষঙ্গ সারাজীবন ধরে তাদের দেহ মন আত্মায় যেন জড়িয়ে রাখে সেই রহস্যময়তাকে যা পরিণত বয়সে তারা আর বাস্তবে ফিরে পায় না, কিন্তু ওই বিশ্বাসটা গভীরে থাকে বলে, তারা মৃত্যুকাল পর্যন্ত তার

BanglaBook.org

অস্তিত্ব কখনই ভোলে না। নগরজীবন এই সুযোগ একজন কিশোর বা কিশোরীকে এরকমভাবে দেয় না। কারণ সেখানের অনুষঙ্গগুলো দ্রুতগামী অশ্বের মতো। পল্লীজীবনে সেই অশ্ব-গতি নেই। সময় সেখানে ছুটন্ত অশ্বের চঞ্চলতায় থাকে না। সে কারণেই বোধহয় ওই রহস্যময়তা এক নির্বিঘ্ন থিতান পায়। এই রহস্যময়তার, বিশ্বাসের যে-স্মৃতি, তার ভার এরকম একজনকে তাই বহন করতে হয় সারাজীবন, যতক্ষণ না সার্থকভাবে সে তার নিগর্মন পথ উন্মুক্ত করে দিতে পারে কোনও সৃজনশীলতায়। তাঁর অনবদ্য লেখাটির মাধ্যমে দয়াময়ী তাঁর ব্যথা, বেদনা, কান্না, অকারণ আনন্দ ও ভালবাসার জমাটবাঁধা অবরুদ্ধ পাথরকে গলিয়ে, পাঠক-গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে প্রবাহিত করে দিতে সক্ষম হয়েছেন এক স্নিগ্ধ স্রোতস্বিনীকে। সেই স্রোতস্বিনী অতি সরল, এক উপল-বাঁধাহীন বহতায় তার দুই পাশের সবুজ আয়োজনের মধ্য দিয়ে যেন কলকল ধ্বনিতে বয়ে চলেছে। স্নিগ্ধ তার উপত্যকা, স্নিগ্ধ সেই উপত্যকার জনপদ, তাবৎ প্রাণ এবং অধিপ্রাণ। এই বহতায় কোনও খলস্বভাব নেই, তাই খলখল ধ্বনিও সেখানে নেই বলে আমাদের তা আতঙ্কে উচ্চকিত করছে না। কিন্তু সে কারণে যে তার গভীরতা আদৌ কম, এমন যেন কেউ না ভাবেন।

১৯৫১-তে জন্ম, ১৯৬১-তে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার মাঝের এই দশ বা এগারো বছর দয়াময়ীর কেটেছে তাঁর মা, বাবা বা অন্য রক্তসম্পর্কের আত্মজনদের ছেড়ে পিসিমার কাছে। এখানে লেখকের পরিচয়টি, তাঁর রচনা থেকেই উদ্ধৃত করে দিলে, পাঠকেরা একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য এবং তাঁর রচনারীতির সারল্য জানতে এবং আস্বাদ করতে পারবেন। ‘আমার বোধ যখন সবে মাত্র জেগে উঠেছে, আপন জনেদের চিনতে শিখছি একটু একটু করে, তখন প্রথম যে দুটো মুখের সঙ্গে আমার প্রথম চেনাশুনো হয়, তার একটি আমার পালিকা মায়ের, আর একটি আমার ‘মাজম’ দাদার। আমার পালিকা মা আমার আপন মা নয়। যে আমাকে দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করেছে, আটমাস বয়েস পর্যন্ত বুকের দুধ খাইয়েছে, সেই আমার আসল মা। হিন্দুস্থানে তিনতলা বিরাট মেয়েদের ইস্কুলের হেড মাস্টারনি সে, যেখানেই যায় চেয়ার পায়। আমার পালিকা মা আমার বাবার জেঠতুতো বোন। আসলে পিসিমা, তাকেই সারাজীবন আমি মা বলে জানি। সব মিলিয়ে মা বলেছিল, বড় হলে যাদের জিনিস আমি তাদের হাতে তুলে দিলে মায়ের শান্তি হবে।”

BanglaBook.org

এটা যেন তাঁর ব্রত। এই সময় একটা জিনিস তাঁর বোধে ধরা পড়ছিল ক্রমশ। চারদিকে যেন একটা অস্থিরতা। সব কিছু অতিদ্রুত যেন বদলে যাচ্ছে। "তখন আমি সবেমাত্র দরজা পেরিয়ে ঘরের পইঠাতে এবং পইঠা পেরিয়ে উঠোনে নাবতে শিখেছিলাম, তখনই দেখেছিলাম সামনে পলুদাদের বাড়িটা কী তাড়াতাড়ি ভিটে হয়ে গেল।" দল বেঁধে সবাই যেন কোথায় চলে যাচ্ছে, কান্নাকাটির রোল উঠছে। অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন, ওইটুকু পিচ্চি একটা মেয়ের চোখে এই অস্থিরতা ধরা পড়া কী সম্ভব? এক্ষেত্রে দয়াময়ীর সঙ্গে আমি একটা ভীষণ ব্যক্তিক সহ-বিষাদ বোধ করি। আমি জানি কী ভীষণ ভাবেই না তা সম্ভব এবং সেই বোধের দুঃখ, আর বেদনার ভার আর তার নিরন্তর দাহ বড়দের তুলনায় কতই অধিক মর্মান্তিক পিচ্চিকের কাছে। কিন্তু সেই বেদনা আর ব্যথার অনুষঙ্গগুলো নিয়ে নৈবেদ্য সাজাবার বদলে দয়াময়ী যে তাঁর পারিপার্শ্বের প্রাণ, অধিপ্রাণ, এমনকী অপ্রাণের মধ্য থেকে উদ্‌গীথ সুর, ছন্দ, আর ছবি দিয়ে এই অর্ঘ্যটি সাজিয়েছেন পাঠক পঞ্চ-ভগবান অবশ্যই তা সানন্দ-কৃতজ্ঞতায় গ্রহণ করবেন। সরস্বতীর ভোগরাগের অধুনাতন অতিচারিকতার অর্থহীন একঘেয়ে বাহুল্য থেকে একটি সম্ভ্রমজনক একান্তে এ যেন 'শ্রীমতী' নামক সেই একান্তিকা 'পূজারিণীর' সযত্নগ্রথিত একটি নির্মাল্য।

কিন্তু অতসব গম্ভীর বা ভাবোচ্ছ্বাসের কথা ছেড়ে, লেখকের কৈশোরিক মণ্ডলের মধ্যের মানুষগুলির কথা যদি বলি, বলতে হয়, তিনি এঁদের মধ্য থেকে যাঁরা তাঁর আত্মার দোসর কিন্তু রক্তসম্পর্কের নন তাঁদের চিনে নিয়ে, আমাদেরও তার অংশী করেছেন। এক্ষেত্রে, যাঁরা এই আত্মীয়তার দায় কোনওদিন স্বীকার করেননি, তাঁদের ত্রুটিবিচ্যুতি এবং কৃতঘ্নতার দিকে আঙুল তুলে, তাঁদের চিহ্নিত করতে, বা যথাযথ ধিক্কার দিতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু তা করেছেন সম্পূর্ণ হিংস্রতাবিহীন এবং অসূয়াশূন্য মন নিয়ে, যেন যারা অশিক্ষিত তাদের অশিক্ষা এবং যারা শিক্ষিত তাদের কুশিক্ষাই এজন্যে দায়ী, যদিও লেখক ঘোষিতভাবে সে ব্যাপারে কোনও বক্তৃতা বা উপদেশের মধ্যে যাননি। যাবার প্রয়োজনও বোধ করেননি।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে স্বাভাবিক সম্প্রীতি-বহমানতা তিনি লক্ষ্য করেছেন, তাকেই তিনি বড় আসনখানা দিয়েছেন। উভয় সমাজের পরম্পরাগত 'পাপ'গুলোর উল্লেখ তিনি করেছেন বেদনার আকুতিতে, কিন্তু অনাবশ্যক বোধে

BanglaBook.org

তা নিয়ে লোক দেখানো সাম্প্রদায়িকতা অসাম্প্রদায়িকতার ঢক্কানিনাদ তোলেননি। এই ব্যাপারটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং শিল্পসম্মত বলে আমার মনে হয়েছে। তাঁর এই অবলোকনে এবং কথনে কোনও ইচ্ছাপূরণের অভীপ্সা কাজ করছে না, কারণ আমাদের এই দুই সমাজের সম্পর্কটা এরকমই। আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে কথনকালে বড় কথার অনাবশ্যক অক্ষর-শব্দডম্বরে সহজ ব্যাপারগুলোকে গুলিয়ে ফেলি। তাতে হিতের চেয়ে অহিত হয় বেশি। লেখক যেভাবে পিসিমা এবং ভুলিপিসিমার সঙ্গে সাধারণ বর্গবর্ণের সম্পর্কটি উপস্থাপিত করেছেন, তাতে পরম্পরার দুঃখজনক অভ্যাস ব্যাপারটিকে অনুল্লিখিত রাখেননি বটে, কিন্তু তার মধ্যে বীভৎস আচার-আচরণজনিত ক্লেদের ব্যাপক প্রকাশ নেই। তিনি সরব না হয়েও বোঝাতে পেরেছেন, চেতনার যে স্তরের মধ্য দিয়ে তাঁদের যাত্রা, তাতে একদিন এই পরম্পরার গতি অবশ্যই ভিন্ন খাতের প্রবাহে যাবে। হৃদয়বত্তার স্বাভাবিক ধর্মই হচ্ছে সম্পর্কের মধ্যের কলুষকে অপসারণ করা। অবশ্য তার জন্য প্রকৃত শিক্ষার প্রসার একটা পূর্বশর্ত হয়তো। কিন্তু হৃদয়ের প্রসারণটা প্রাথমিক।

এতগুলি কথা বললাম বটে, কিন্তু আসলে কিছুই বলা হল না। আরও ঢের-ঢের বললেও যে কিছু বলা হবে, এমনও মনে হয় না। বইটি পড়ে লেখককে আমি যেন জানতে চিনতে এবং বুঝতে পেরেছি একান্তভাবেই। এমনটি হামেশা ঘটে না। আমি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে স্বীকার করছি যে, সমালোচনা বলতে যা বোঝায়, তা করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। বইটি পড়ে আমি সপরিবারে মুগ্ধ। মুগ্ধ লোকেরা সমালোচনা করতে পারে না। প্রশস্তি গাইতে পারে মাত্র। এরকম স্নিগ্ধ এবং সরল একটি 'হৃদয়ের কথা'র সমালোচনা হয় না। এই পর্যালোচনায় আমার মুগ্ধতা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম মাত্র।

— ০ —

BanglaBook.org

বিষণ্ণতার অমল দীর্ঘশ্বাস

বাংলাদেশের লেখক বুদ্ধিজীবীদের একটা বড়ো অংশের অভিযোগ এবং অভিমান এই যে পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালি লেখক বুদ্ধিজীবিরা তাঁদের লেখালেখি বিষয়ে যথেষ্ট কৌতূহলী নন। পক্ষান্তরে তাঁরা এ বঙ্গের সাহিত্য বিষয়ে অনেক বেশি খোঁজখবর রাখেন। এই অভিযোগ এবং অভিমানের সম্যক কারণ আছে। কথাটি সত্য। কিন্তু সেই সত্যের ব্যাপ্তি শুধু বাংলাদেশের সাহিত্যকর্ম নিয়েই নয়, তার বিস্তৃতি অতি ব্যাপক। এতটাই ব্যাপক যে শুধু বাংলা দেশ নয়, কোলকাতা ব্যতিরেক পশ্চিমবঙ্গ প্রায় গোটাটাই সেই অভিযোগ, অভিমানের কারণে নাকের বাঁশি ফুলিয়ে থাকে। তথাপি তার প্রতিকারের কথা চিন্তা করে না। উপরন্তু কোলকাতা নামক এই উচ্চ-নাসিক মাতব্বরটির কোলে চড়ার জন্য হাংলামির চূড়ান্ত সবাইই করে থাকে। সে অনেক কথা। তার ব্যাপক আলোচনার পরিসর এখানে নেই।

পাকিস্তানি আমল থেকেই দুই পারের বইপত্রের ব্যাপক বাণিজ্যিক আদান প্রদানের সহজতা ছিল না। যেটুকু মাঝে মধ্যে ছিল বা সম্ভব হত, তার সীমানা ওপারে ঢাকা শহর আর এপারে কোলকাতায়ই আবদ্ধ। সুতরাং এপারে তাবৎ বাঙালি সন্ধিৎসুর পক্ষে ওপারের লেখালেখির বিষয়ে কৌতূহল জীইয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। আবার ওপার থেকে আসা ছিন্নমূল মানুষদের, যারা প্রকৃতপক্ষে ব্যাপক পাঠক, তাদের নতুন স্থায়িত্বের খুঁটিগাড়ার লড়াইটার কথাও মনে রাখতে হবে। সুযোগ, সময় কোথায়? তবে সে দুর্যোগ কেটে গেছে। সে যাহোক, কোলকাতা বা ঢাকার বুদ্ধিজীবিরাও যে গোটা রাজ্য বা দেশের বুদ্ধিজীবিদের রচনার প্রতি আগ্রহী এমন প্রমাণাভাব।

তথাপি কিছু কিছু বই, তা এপারের হোক বা ওপারের, হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো আমাদের চোখ ধাঁধিয়েছে এবং আজও ধাঁধায়। বিশেষ করে সেসব বই যদি দেশভাগকে উপজীব্য করে রচিত হয়। এরকমই একখানি বই নিয়ে বর্তমান সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা। বইখানির রচয়িতা মাহমুদুল হক। তাঁর অনবদ্য 'কালো বরফ' নামের এই বইখানি প্রকাশ করেছেন এপার ওপারের সারস্বত

BanglaBook.org

সমাজের ব্যাপক জনের শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয় মফিদুল হক। বইখানির রচনাকাল ২১-৩০শে আগস্ট ১৯৭৭ সাল। বইটির প্রথম প্রকাশ ১৯৯২-এ। ২০০০-এ মফিদুল এর দ্বিতীয় মুদ্রণটি প্রকাশ করেছেন। বইখানি আমার হাতে এসেছে ২০০৮-এর নভেম্বর মাসে, উত্তরপাড়া রামকৃষ্ণ লাইব্রেরির তরফ থেকে একটি সম্বর্ধনা সভায়, উপহার হিসাবে। এর আগে পর্যন্ত এই বইখানির বিষয়ে আমি আদৌ কিছুই ভাবিনি। কারণ, পরিচয় ছিলনা। সম্প্রতি একেবারে হালে খোঁজ নিয়ে জানলাম শ্রদ্ধেয় অরুণ সেন মশাই-এর একটি রিভিয়্যু করেছিলেন। কিন্তু আমি কোলকাতার লোক নই। আমি পশ্চিমবঙ্গের লোক। কোলকাতার বিখ্যাত, অখ্যাত সব পত্রিকা সবসময় জোগাড় করতে পারি না। তাই নজরে পড়েনি। এটা শুধু আমি কম পড়াশোনা করা, কম খোঁজখবর রাখা মফঃস্বলী বলেই নয়, পশ্চিমবঙ্গবাসী অথচ কোলকাতার সঙ্গে যোগ নেই, এমন অনেক প্রকৃত পড়ুয়াদেরও সমস্যা। ক্ষুদ্র পত্রিকা-সংস্কৃতির প্রয়োজনীয় কার্যকরী-বিস্তার আমাদের রাজ্যে তেমন হয়নি।

সে, যা হোক, বইখানার বিষয়ে আসি। 'কালো বরফ' নামটিতে রয়েছে একটি করুণ এবং গভীর ব্যঞ্জনা, যা বইখানি পড়ার আগে বুঝতে পারিনি। রক্ত জমাট বাঁধলে তার রঙ হয় কালো। রক্ত যদি বরফ হয় তার রঙও তো কালোই হবে। অদ্ভুত এই নামকরণ এবং কী অব্যর্থ। বইখানা আমাকে অসম্ভব রকম আকৃষ্ট করেছে। মাহমুদুল হকের অনেক লেখা পড়িনি বটে, তবে তাঁর লেখক হিসাবে পরিচয় আমার কাছে অপরিজ্ঞাত নয়। বাংলাদেশে যাতায়াতের কল্যাণে দু'একজন বান্ধবের কাছ থেকে দু'চারখানা যা পড়েছি, সাহিত্য হিসাবে তা উত্তম, একথা বলতে পারি। তার মধ্যে উপন্যাস হিসাবে 'জীবন আমার বোন', 'নিরাপদ তন্দ্রা', 'খেলাঘব' এবং 'গল্পসংগ্রহ' হিসাবে প্রতিদিন একটি রুমাল ইত্যাদির নাম মনে আছে। তবে এর সবগুলোই যে পড়েছি এমন নয়। আজকাল বড় স্মৃতিভ্রম হয়। অনেক কিছুই চট্ করে মনে পড়ে না। পূণ: পাঠের সময় হয়ত খেয়াল হয়। সর্বশেষ পড়লাম এই কালো বরফ নামের অদ্ভুত উপন্যাসটি, যার অন্তর মণ্ডলে দেশভাগ, দেশত্যাগের এক ভিন্ন যন্ত্রণার নিত্যবহতা আমাকে যেন এক অজানা বিষণ্ণতায় মথিত করেছে। আর সেখানেই এর সার্থকতা।

পার্টিশান বা দেশভাগ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি বাংলা ভাষায় আশ্চর্যরকমভাবে সীমিত, সমালোচক, প্রাবন্ধিকদের এই অভিযোগ বা আফশোসটি অমূলক নয়।

BanglaBook.org

তাও এপারে যতটুকু হয়েছে, ওপারে তার সিকিভাগও হয়নি। অন্তত, আমাদের নজরে আসার মতো তেমন কিছু পাইনি। অবশ্যই এই না হওয়ার পিছনে প্রভূত বাস্তব কারণ রয়েছে, যা উভয়পারের মানুষই কমবেশি জানেন।

কালো বরফ নামের এই বইখানিতে দেশভাগ বিষয়ক সমস্যাগুলি, অর্থাৎ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়া, সাম্প্রদায়িকভাবে লাঞ্ছিত হওয়া বা মানুষের অস্মিতাকে অস্বীকার করার মতো বাহ্যিক কোনো বিবরণ প্রায় নেই বললেই চলে। এমনকী দেশভাগ বিষয়ে বিশেষ কোনো উচ্চারণও সেখানে সোচ্চার নয়। দেশভাগকে উপজীব্য করে যেসব রচনা এযাবৎকাল আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে স্মৃতিচারণমূলক আলেখ্য, আত্মজৈবনিক রচনা, সাম্প্রদায়িক সম্পর্ককে ভিত্তি করে ছোট গল্প, উপন্যাস এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধাবলি ও ছোট বড়ো সাক্ষাৎকার। এসবের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে ফেলে আসা দেশ গাঁয়ের মধুর স্মৃতি, নদনদী উন্মুক্ত প্রান্তর, সবুজ ক্ষেত, গ্রামীণ বিভিন্ন লোকায়ত উৎসব, জীবনের সহজ বহতা এইসব, অর্থাৎ যা একদা ছিল, এখন আর নেই। সেইসব নিয়ে আর্তি, নস্ট্যালজিক ভাবালুতা এবং অবশ্যই বিষাদগ্রস্ততা। তার মধ্যে আরও একটা ব্যাপার সোচ্চার এবং অবশ্যই অত্যন্ত উচ্চরোলে সোচ্চার, সেটা সাম্প্রদায়িক কদর্যতা বা বর্বরতার আনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। মাহমুদুল হক তাঁর গ্রন্থে এইসব নিয়ে প্রচলিত পন্থায় অতি সামান্যই বাক্য ব্যয় করেছেন। অথচ তাঁর লেখার মধ্যে এর সবকিছুরই নির্যাস রয়েছে যেজন্য গোটা নির্মাণ কর্মটি অসামান্য এক শৈল্পিক মহিমায় ভাস্বর হয়েছে, যা সর্বশ্রেণীর পাঠককে শুধু একটা ভাবেই আপ্লুত করে, তা হল মানুষের প্রতি অবাধ একটা ভালবাসার স্বতোৎসারণ, যা ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের সম্পর্কের মধ্যেই পাওয়া যায়। সম্প্রদায়, গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তাকে ধরা যায় না প্রায়।

দেশ ভাগ নিয়ে এতাবৎকাল যে যে আলেখ্য পাঠ করেছি। এই গ্রন্থখানির আঙ্গিক এবং আত্মিক বিন্যাস সেসবের চাইতে এতই ভিন্ন এবং অভিনব যে লেখকের শিল্পমগ্নতার অসাধারণত্ব সেখানে পরিমাপ করা আমার ক্ষমতার পক্ষে অসম্ভব বলেই মনে করি। শুধু এটুকুই ধরতে পারি যে আমাদের অর্থাৎ দেশভাগে ধ্বস্ত ভুক্তভোগীদের ব্যক্তিক বেদনার কতো বিচিত্র ক্ষত ব্যক্তি হিসাবে কাউকে কাউকে বহন করতে হয়। ভাবি, দেশভাগ আমাদের অস্তিত্বকে

BanglaBook.org

কতভাবেই না ভাগ করেছে, আমাদের সামগ্রিক এবং ব্যক্তিক ছিন্নভিন্নতার কতো অজস্র রূপ এখানো প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। যে প্রকাশগুলো আমরা নিরন্তর দেখি বা আলোচনা করি, তার সিংহভাগটাই সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীয় ছিন্নভিন্নতা বা লাভক্ষতির স্থূল বিশ্লেষণ বলে মনে হয়, যখন দেখি যে একজন ব্যক্তি মানুষও এই বিভাজনে বিভক্ত হয়ে তার শৈশব, কৈশোরের সঙ্গে পরবর্তী বেঁচে থাকা কালের একটা ছেঁড়া সুতোকে ক্রমান্বয়ে জোড়া দিতে চাইছে কিন্তু বারবারই ব্যর্থ হচ্ছে। ধ্বস্ত হচ্ছে। মাহমুদুল এই জোড়া দেওয়ার চেষ্টায় শিল্প এবং জাগতিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে যেন ঋত্বিক ঘটক হয়ে গেছেন। আমার এই কথাটি, যাঁরা মাহমুদুল হকের রচনা পড়েছেন অথবা পড়বেন বা তাঁর জীবন বিষয়ে জানবেন, তাঁরা নিশ্চয় মানবেন।

আমরা যারা ছেচল্লিশ পঞ্চাশের হিন্দু ছিন্নমূল, তারা এপার থেকে চলে যাওয়া মুসলমান অনিকেতদের জীবন সংগ্রাম তথা ব্যথা বেদনা, বা মাটির টানজনিত মানসিক অবসাদের কথা, সেই মাটির প্রতিবেশীজনের ভালবাসা, ঘৃণা, সহমর্মিতা, প্রেম, অপ্রেম মিলিয়ে যে মানবিক সম্পর্ক, যা এই উপমহাদেশের সর্বত্র ব্যপ্ত, সেইসব কথা প্রায় জানি না। জানিনা, ভিন্ন মাটিতে তারা নিকেতন পেলেও, কীভাবে খুঁটি গেড়ে ছিল, তাদের অভ্যস্ত ভালবাসার মতো লতাগুলি সেখানে কীভাবে আশ্রয় খুঁজেছিল, তাদের লড়াইটা কেমন ছিল।

কালো বরফ সেইসব কথার মধ্য থেকে শুধু পারস্পরিক ভালবাসা কথাটুকুরই আভাস দিয়েছে। সেই আভাসি প্রকাশের বিভিন্ন পরতে খোঁজ পাওয়া যায় অনেক তমিস্রার, কিন্তু তা কোনমতেই ভালবাসার করুণতা মাখা সম্পর্ককে আবিল করে না। করুণতাটা প্রকাশ পায় শৈশব কৈশোরের রহস্যময় অস্তিত্বের সঙ্গে যৌবনের ছিন্নসূত্রের প্রান্তদুটি খুঁজে বেড়ানোর আকুলতায়। খুঁজে পাওয়া না পাওয়ার স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গ লুকোচুরি খেলে যেন শৈশব যৌবনের দুই প্রান্তে।

বইখানি এপার থেকে চলে যাওয়া একটি গ্রাম্য-পরিবারের জনৈক যুবকের মানসিক বিষণ্ণতাকে কেন্দ্র করে মূলত। আমি বইখানির কাহিনী নিয়ে কিছু বললাম না। কারণ এই রচনাটি কোনমতেই বইটির আলোচনা বা পর্যালোচনা নয়। তা করতে গেলে একটি বৃহৎ নিবন্ধের আয়োজন করতে হয়। আমি শুধু

BanglaBook.org

বইখানি পড়ে আমার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া জানাবার প্রয়াস করলাম। মনে হয় বইখানি এপারের পাঠকদের কাছে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেনি। সাম্প্রতিককালে দেশভাগ নিয়ে ব্যাপক লেখালেখি এপারে ওপারে চলছে। এই বইখানা রচিত হয়েছিল ১৯৭৭এ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২-এ, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০০ সালে। প্রকাশক মফিদুল ভাই। তিনি এবং তাঁর প্রকাশন সংস্থা সাহিত্য প্রকাশ এপার ওপারে যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী। তথাপি এরকম একখানা বই-এর প্রচার এত কম হল কেন বোঝা গেল না। ১৯৭৭-এর লেখা এ বইটি এতো দীর্ঘ সময়ই বা অপ্রকাশের আড়ালে লুকিয়ে ছিল কেন, বুঝলাম না। বইখানির একটি উপযুক্ত ভূমিকা থাকলে পাঠককুল উপকৃত হতেন বলে মনে করি। আশা করব তৃতীয় মুদ্রণে প্রকাশক নিজেই একটি বিস্তৃত ভূমিকা সহ বইটি নতুন আকারে পাঠকদের উপহার দেবেন সুদৃশ্যতর অবয়বে। মফিদুলই সে ব্যাপারে উত্তম ব্যক্তি।

—— o ——

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

রাক্ষুসী প্রহরের চালচিত্র

বাংলাদেশের বর্তমান লেখকদের একটা ব্যাপক অংশকে এখন একাত্তরের বা একাত্তর পরবর্তী প্রজন্ম হিসাবে ধরা যায়। এঁদের মধ্যের একটা বেশ বড়ো অংশই এপারে স্বকীয় গুণের জন্য যথেষ্ট পরিচিত, স্বীকৃতও। তাঁদের পূর্ববর্তী প্রজন্মকে যদি উত্তর সাতচল্লিশ বা সাতচল্লিশের সমসাময়িক ধরি, তবে বলা যায়, তাঁদের ছায়াও এখন ক্রমশ পূবেরদিকে প্রলম্বিত, কেউ বা পুরোই এখন ছায়া বা কথা-শরীর।

বস্তুত, সাতচল্লিশের পর পদ্মা, মেঘনা, কর্ণফুলি, কীর্তনখোলা বা বিশখালিতে জলের প্রবাহের সঙ্গে, রক্তের প্রবাহের মিশ্রণের জন্য নদীখাত এবং উপত্যকাগুলিতে শুষ্ক বালিয়াড়ির অস্তিত্বও ক্রমেই বড় প্রকট হচ্ছে, বা হয়েছে বলাই অধিক সঙ্গত। বর্তমান প্রজন্ম তাই স্বাভাবিক ক্রমেই প্রাক্তন শ্যামলিমার প্রাচুর্যের পরিবর্তে, তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে বালিয়াড়ির ধূসরতার বাস্তবতাকে এনে ফেলছেন। ব্যাপারটা ওপারের সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন। এই বাস্তবতার অনুশীলনের প্রাথমিক স্তরে তাই কথাশিল্পীদের ক্রোধ, শ্লেষ, ব্যঙ্গ বা বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতা অনেকের ক্ষেত্রেই কোনো শিল্পশাসনও যেন মানছে না। অধুনা যাঁরা নব-ধ্রুপদী বোধে বুদ্ধ, এপার ওপারের সেই তাঁরা, ব্যাপারটিকে সহজ দৃষ্টিতে হয়তো দেখছেন না। তবে এর সবটাই কালের নিয়ম, এনিয়ে বিতণ্ডা করে লাভ নেই। আজকের প্রজন্মের যাঁরা, তাঁরা কিন্তু সাতচল্লিশ উত্তর প্রজন্মের চিন্তা চেতনায় রাষ্ট্রশক্তির রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করার, সাম্প্রদায়িক নির্বিচার মাৎস্যন্যায়ী কদর্য উন্মার্গগামিতাকে প্রতিহত করার সংগ্রামকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে তাঁদের উত্তরাধিকার বজায় রাখছেন। তাঁদের রচনায় তাই স্পষ্ট হচ্ছে নষ্ট স্বপ্নের দগ্ধশেষ নিয়ে নতুন নির্মাণ প্রচেষ্টা। একথা আজকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পাকিস্তানি আমলের যে বিশেষতা পূব বাংলার সাহিত্যকে ভিন্ন ধারাগামী করেছিল, বর্তমানের বাংলাদেশি বাংলা সাহিত্য তাকেও অতিক্রম করে আবার একটা মোড় নিয়েছে। নতুন বিশেষতার পথে তা পা বাড়িয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গীয় বাংলা সাহিত্যের ধারা থেকে তা যে অত্যন্ত

BanglaBook.org

লক্ষ্যণীয় ভাবেই ভিন্ন মার্গী, সেকথা স্পষ্টভাবেই বলা যায় এবং সেটাই স্বাভাবিক।

সম্প্রতি একটি অত্যন্ত ক্ষীণকায় গল্প সংকলন গ্রন্থ হাতে এসেছে। লেখকের নাম মুস্তফা পান্না, গ্রন্থটি 'মঘা-অশ্লেষা'। আমি নিজস্ব খেয়ালখুশি মত সামান্য লেখা বা কথাসাহিত্যাদি পাঠ করি বটে, তবে খুব যে ব্যাপকভাবে সাম্প্রতিক গল্প ইত্যাদি পাঠ করি এমন দাবি নেই। কিন্তু যদি বাংলাদেশি কোনো লেখা হাতে পাই, অবশ্য পড়ি। বাংলাদেশ আমার জন্মভূমি বলে এই বয়সেও সীমান্তের উভয় পারের ছিঁচ্‌কেমি, ছ্যাঁচ্‌ড়ামো (ইদানিং কিছু কম) ইত্যাদি উপেক্ষা করেও, বছরে-দু-বছরে একবার হলেও সেখানে যাই। তাই ওখানের গ্রামগঞ্জের, বিশেষত, দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের গ্রামগুলোর বিষয়ে নিতান্ত অপরিজ্ঞাত নই এবং উভয় সমাজের মধ্যে আত্মজনের সংখ্যাও নিতান্ত অপ্রতুল নয়। সেখানের ঘটনা, অপঘটনার গতিপ্রকৃতি এবং পদ্ধতিগুলোও আমার অপরিজ্ঞাত নয়।

মুস্তফা পান্না যদিও বয়সের হিসাবে, যে নবীন প্রজন্মের কথা বলেছি, সেই প্রজন্মের নন, তবে লেখক হিসাবে তাঁকে সেই দলভুক্তই করতে হবে। সম্ভবত, এ বঙ্গে এই গ্রন্থখানি নিয়েই তাঁর প্রথম আবির্ভাব। ইতিপূর্বে তাঁর অন্য কোনো গ্রন্থ আমি পড়িনি বা নজরেও আসেনি।

পান্নার জন্ম 'পাকিস্তান হাসেলের' পাঁচ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৫২ সালে। লেখক পরিচিতিতে জানা যাচ্ছে, বর্তমান গ্রন্থখানি ব্যাতিরেকে 'লোক সকল' এবং 'কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ' নামে আরো দুইটি গল্পগ্রন্থ এবং খান পাঁচেক শিশু সাহিত্যের পুস্তক ছাড়া, একটি প্রবন্ধ পুস্তক ও হায়াৎ মামুদ সহযোগে 'কিশোর বাংলা অভিধান' তাঁর সর্বমোট কাজকর্ম। 'মঘা অশ্লেষা'র পটভূমি বৃহত্তর বরিশাল জেলার অন্তর্গত বর্তমান বরগুণা জেলার প্রায় সমুদ্র উপকূলবর্তী গ্রামাঞ্চল। এখানকার গ্রাম এবং গ্রামীণ মানুষদের, বিশেষত উৎপীড়িত তথাকথিত নিম্নজাতীয় সংখ্যালঘুদের বঞ্চিত জীবনের অসহায়তা, অনিশ্চয়তা, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যের স্বার্থান্বেষী মানুষদের লোভের ছোবলে এবং রাষ্ট্রশক্তির যখন যারাই ক্ষমতায় আসুক, দলমত নির্বিশেষে সবার ক্ষমতা অপব্যবহারে ধ্বস্ত অ বা আধানাগরিকদের কথা নিয়ে তাঁর গল্প চতুষ্টয়ের নির্মাণ। এই ব্যাপারগুলোর মধ্যেই লেখকের মঘা অশ্লেষা, দণ্ডযাত্রা, দখল, এবং ওপার এই চারটি গল্পের বুনোন। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যের নষ্টভ্রষ্ট মানুষদের অপরিসীম ভূমি কামুকতা, যা ব্যাপক অর্থে সংখ্যালঘু মানুষীদের বয়স

BanglaBook.org

নির্বিশেষে যৌনক্ষেত্রকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, তারই নির্মম চিত্র এবং বিবরণী যেন এই চারটি আলেখ্য। পড়তে পড়তে মনে হয় যেন কোনো এক রাক্ষুসী প্রহরের অন্ধকারে আবদ্ধ পথহীন, সম্বলহীন, দিশাহীন কিছু মানুষের চিৎকার আর আর্তনাদ শুনছি। সেখানে যেন তাদের প্রতি করুণা বা দয়া দেখাবার মানসিকতা নিয়েও কেউ নেই। তারা যেন কোরবানি ক্ষেত্রে অপেক্ষমান পশু মাত্র।

পর পর একই চুম্বকে গল্পগুলো আবদ্ধ বলে, একটা ভীতি আমার মধ্যে কাজ করেছে, গল্পগুলো পাঠের পর। আমি জানি, মুস্তফার গল্পের রক্তমাংস এবং আত্মা বা রুহে কষ্ট কল্পনা বা 'বনাওটি' কিছু নেই। আমার নিজেরও অভিজ্ঞতা প্রায় এরকমই। কিন্তু তৎসহ অতিরিক্ত কিছুও আমি দেখেছি। তা তথাকথিত নিম্নজাতীয় মুসলমানদের স্বভাবে নিহিত এক প্রবল সহমর্মিতা, আর্তের প্রতি, নিপীড়িতের প্রতি তাদের প্রসারিত কল্যাণ হস্তের অকৃপণ প্রসারণ। মুস্তফা লোভীদের প্রতি ক্রোধবশত এঁদের দিকে দৃষ্টিটা যেন ততটা দেওয়ার কথা ভাবেননি। একেবারেই দেননি বলব না, তবে যথার্থভাবে দেননি বলেই আমার মনে হয়েছে। এই কারণেই আমার ভীতির কথাটি আমি বলছিলাম। এর ফল, বিপরীতক্রমে মারাত্মক হতে পারে। মনে রাখতে হবে, ওদেশের সংখ্যালঘুরা, যারা এপারে এসে রাতারাতি সংখ্যাগুরু হয়ে যান, তাঁরা মুস্তফার বাস্তব ঘটনাগুলিকে, সুযোগমত অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। সাম্প্রদায়িকতা, তা হিংস্র হোক, কিংবা অহিংস্র তা নির্ভর করে সুযোগের উপর। আমি বিশ্বাস করি এবং অত্যন্ত হতাশার সঙ্গে বিশ্বাস করি যে একশো জন হিন্দুর মধ্যে একশোজনই সাম্প্রদায়িক মানসিকতাসম্পন্ন এবং একশোজন মুসলমানের ক্ষেত্রেও তাই। যেখানে যে সংখ্যাগুরু, সেখানে তার হিংস্রতা ততই বেশি। সংখ্যালঘুরা অবস্থা বৈগুণ্যে শান্ত থাকতে বাধ্য থাকেন মাত্র। কিন্তু মানসিকতার দিক দিয়ে তাঁরা আদৌ অসাম্প্রদায়িক থাকতে পারেন না, কারণ সেক্ষেত্রে তাঁদের অস্মিতা-সংকট অন্য সমস্যার সৃষ্টি করে।

আমার মনে হয়, সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন, অত্যাচার বা ethnic cleansing-এ সমস্যাটিকে বাঙালি হিন্দু এবং বাঙালি মুসলমানের সমস্যা এবং সংঘাত হিসাবে দেখলে পান্না বা তদনুসারী লেখকেরা যথার্থ সত্যে পৌঁছোতে পারবেন না। ব্যাপারটিকে উপমহাদেশীয় প্রেক্ষাপটে দেখার, প্রয়োজন আছে।

BanglaBook.org

জাতি হিসাবে, যে যাই দাবি করুন, বাঙালির বিকাশ পূর্ণাঙ্গভাবে হয়েছে ১৯৭১-এর মহাসংগ্রামের মাধ্যমে এরকম দাবি করা আত্ম বঞ্চনা। বাঙালি সার্বিকভাবে একটা একক জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলে, যে সাম্প্রদায়িকতা মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, তার পুনরুদ্গম সম্ভব হত না। তখনকার ব্যাপারটির মধ্যে একটা নগদানগদি আবেগ বিহ্বলতা যে বাঙালির ক্ষেত্রে সুলভ, সেটা কাজ করেছিল, উভয় সমাজের মধ্যেই, কিন্তু পরিবস্থা থিতু হলে, একটা জিহ্বা লক্ষ জিহ্বায় পরিণত হতে সময় লাগেনি। লোভ নামক রিপুটিকে টুঁটি টিপে শেষ করার যে তপস্যা, সে তপস্যায় এই উপমহাদেশই শুধু নয়, এই গ্রহের কোথাও কেউ সিদ্ধিলাভ করেনি। উপমাটি প্রাচীন, কিন্তু তাতে তার সত্যতা হ্রাস পায়নি। আশার কথা, এতদ্ সত্ত্বেও মানুষ তপস্যা করছে। সাদা এবং গোদা কথায় বললে বলতে হয়, জমি শুধু ফসলই নয়, শত্রুতাও প্রসব করে।

মুস্তফার তপস্যার উদ্দেশ্য মহৎ এবং সৎ। যে অঞ্চল নিয়ে তার আলেখ্য, সাহিত্যক্ষেত্রে সেই স্থান এবং স্থানীয় সাধারণ মানুষের বিচিত্র জীবন তাঁর রচনায় যতটুকু এসেছে, তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। তবে মুস্তফা যদি এ অঞ্চলের আনুমানিক শ'দুয়েক বছরের মত সময়ের, অর্থাৎ এর আবাদ এবং জমিদারি পত্তনের ইতিহাস পটটি গভীরভাবে নাড়াঘাঁটা করেন, মনে হয়, অধুনাকার সামাজিক অবস্থাগুলির বীজাভাস তথা বিষফল প্রসবকারী গুহীরূহ উদ্গমের কার্য কারণ আরও ব্যাপকভাবে অনুধাবন করে বৃহৎ উপন্যাসের ক্ষেত্র লাভ করতে পারেন এবং মুস্তফার ক্ষেত্র সমীক্ষণ, চরিত্র অবলোকনের ক্ষমতা দ্বারা তিনি নিঃসন্দেহে আমাদের এক অভিনব মহাগ্রন্থ উপহার দিতে পারেন।

জন্মসূত্রে তিনি সংস্কৃতিগতভাবে এমন একটি প্রায় অকর্ষিত সমাজভূমি পেয়েছেন, যা একাধারে সমুদ্র মেখলা, এখনও অরণ্যানী-বেষ্টিত, সবেমাত্র আধুনিকতার পথে বিকাশমান একটি অঞ্চল, যেখানকার নৈসর্গিকতার মধ্যে এখনও আদিমতার ভয়ালতা, মনুষ্য সমাজে সরল হিংস্রতার সঙ্গে অকপট ভালবাসার মিশ্রণ যেমন দৃশ্যমান, তেমনি কুটিল দলীয় রাজনীতির সদ্য আবির্ভাবের জন্য সামাজিক জটিলতার উপস্থিতিও রয়েছে। মুস্তফা পান্নার লেখায় ওসবের প্রভাব যেভাবে দেখা যাচ্ছে, তাতে তাঁর কাছে বড়ো মাপের

BanglaBook.org

কিছু আমরা অবশ্যই আশা করব। মুস্তাফা আমার এই আকাঙ্ক্ষাটির কথা নিশ্চয় চিন্তায় রাখবেন।

গ্রন্থখানির শারীর নির্মাণে, অঙ্গসজ্জা, প্রচ্ছদ, অক্ষর বিন্যাস এবং বাঁধাই ইত্যাদিতে যত্ন প্রশংসনীয়। ছাপার ভুল, বাংলা প্রকাশনার স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে গিয়ে আশ্চর্যরকম কম। ভাষা অবশ্যই বিষয় উপযোগী। আঞ্চলিক শব্দ, সংলাপ ব্যবহারও চমৎকার। তথাপি, নিজস্ব একটি ধারণার কথা বলি যে চরিত্রবিশেষের মুখে যেসব শব্দ মানায়, লেখকের কখন বিন্যাসে কিন্তু সে সব শব্দ বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে। যেসব আঞ্চলিক শব্দবাক্যকে আমরা তথাকথিত অপশব্দ বলে গ্রহণ করতে পারি চরিত্রের স্বাভাবিক সংলাপে, লেখক স্বয়ং তাঁর বর্ণনায় সেসব ব্যবহার করলে, অশ্লীলতা দোষ অর্শানোর শোরগোল ওঠার সম্ভাবনা। আমাদের বাঙালি তথা উপমহাদেশীয় সাবালকত্ব এখনো ততটা পোক্ত হয়নি, যদিও এপার, ওপারের অনেকেই সেরকম ব্যবহার করে থাকেন। তাতে চমক সৃষ্টি হয় বটে, তবে রচনা যে তেমন অভিনবত্ব লাভ করে, এমন মনে হয় না। এটি আমার ধারণা মাত্র, লেখকের প্রতি উপদেশ নয়।

এই গ্রন্থটি যে এপারের অসাম্প্রদায়িক, মানবতাপ্রেমী পাঠকদের কাছে আদরণীয় হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এপারে নবাগত মুস্তফা পান্নাকে এই গ্রন্থটি উপহার দেবার জন্য সানন্দ অভিনন্দন জানাই। যদিও মানুষটির সঙ্গে এখনো সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি, তথাপি প্রত্যাশী যে তিনি তাঁর লেখার মতোই স্বচ্ছ মানুষ হবেন। কথাটি এ কারণে বলা যে এপারে ওপারে অ-সাম্প্রদায়িক সাহিত্য ব্যপারটাও যেন বাজারের স্বাদ পেয়েছে। মুস্তফা নিশ্চয় তার বাইরে এবং ঐকান্তিক বলেই বিশ্বাস।

BanglaBook.org

— ০ —

বৈদ্যক জাতক

রাঢ়বঙ্গীয় বিভিন্ন জাতিগুলোর মধ্যে কোনোটিই যে অবিমিশ্র নয়—বৈদ্য জাতির ইতিহাস এবং তাদের সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তি, প্রবাদ তথা রঙ্গ রসিকতা ইত্যাদি পর্যালোচনা করলে তার সম্যক উপলব্ধি হয়। বস্তুতপক্ষে এই একটি জাতির উদ্ভব এবং বিকাশের যে প্রক্রিয়া, অন্যান্য জাতিগুলোর ক্ষেত্রেও তা সর্বতোভাবেই প্রযোজ্য। অধুনাকালে 'জাত' নিয়ে নিবন্ধ লেখার প্রয়োজন আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু তথাপি এই প্রয়াস একারণে যে, হিন্দু বাঙালি সমাজের সর্বস্তরেই এখনও কম বেশি নিজের নিজের জাতকে ব্রাহ্মণত্বের গর্বে গৌরবান্বিত করার নির্বোধ প্রচেষ্টা পরিলক্ষ্যমান। ব্যাপারটির সম্যক প্রতিফলন দেখা যায় পাত্রপাত্রী বিজ্ঞাপনে এবং বিবাহ সম্বন্ধীয় পত্রাচারে। সেখানে শুধু ব্রাহ্মণত্বের দাবিদারীই নয়, কে কতটা উৎকৃষ্টতম শ্রেণির ব্রাহ্মণ তা নিয়েও সগর্জন দাবির মোকাবিলা আজও আমাদের করতে হয়। এ ব্যাপারে তথাকথিত উচ্চ, নীচ কোনো জাতই যে পিছিয়ে নেই, তা এসব নিয়ে মামলা মোকদ্দমার খোঁজ খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা সবাই জানেন। ভুক্তভোগীরা তো জানেনই। বাঙালি সমাজ যৌথ ঘেরাটোপের বাইরে এসে জাতি গঠনের প্রচেষ্টায় যে ওদিক দিয়ে আদৌ সার্থক হয়েছেন একথা বোধহয় কেউ ই বলবেন না। এই নিবন্ধে আমি শুধু বৈদ্যদের বিষয় দু-এক কথা বলব। আশা করি হাঁড়ির একটা ভাত টিপলেই বাকিগুলো কতটা সুসিদ্ধ তা বোঝা যাবে। প্রসঙ্গত কথাটা বাঙালি মুসলমানদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং এর সঙ্গে বাঙালির জাতিগঠনে গোঁজামিলের একটা সূত্র আছে বলেই বিষয়টির অবতারণা।

রাঢ় এবং বঙ্গে বৈদ্যদের উদ্ভব সম্পর্কে যে প্রধান কিংবদন্তিটি আছে তাহলো, মহর্ষি গালব পর্যটনরত অবস্থায় একদিন পথশ্রম ও ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হয়ে বীরভদ্রা নামক জনৈক বৈশ্যকন্যার কাছে জল প্রার্থনা করলেন। বৈশ্য কন্যা বীরভদ্রা অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে ঋষির তৃষ্ণা নিবারণ করলে ঋষি 'পুত্রবতীভব' এই আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন।" এদিকে বীরভদ্রা ছিল অনূঢ়া। সুতরাং ঋষির আশীর্বচনে সে কিঞ্চিৎ বিমূঢ়া হয়। সব জ্ঞাত হয়ে ঋষি কন্যার

BanglaBook.org

পিতার নিকটে যান এবং সব কথা খুলে বলেন। বৈশ্য পিতা ঋষিকেই তখন সংকট মোচনের জন্য তাঁর কন্যার পাণি গ্রহণ করতে বলেন। কিন্তু যে কন্যা তাঁকে জল দান করে জীবন রক্ষা করেছে তাকে মাতৃজ্ঞানে গ্রহণ করায় ঋষি এ ব্যাপারে সম্মত হতে পারেন না। তথাপি অমোঘ ঋষিবাক্যের ফলাফল অন্যথা হবার উপায় নেই—অন্যান্য ঋষিরা মহর্ষি গালবের সম্মান রক্ষার জন্য এক কুশময় কুমার তৈরি করে বীরভদ্রার কোলে স্থাপন করেন এবং বেদমন্ত্রে কুমারের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। ঋষিরা এর নাম রাখেন অমৃতাচার্য ধন্বন্তরি, আবার অম্বাকুলে জন্ম হওয়ায়—তাঁর উপাধি অম্বোষ্ঠ হয়। এই ধন্বন্তরিই বৈদ্যকুলের প্রথম গোত্রপতি বলে কথিত।

অন্য একটি মতে (যেটি ব্রাহ্মণদের মধ্যে রসিকতা ছলে আমি বহুবার আলোচিত হতে শুনেছি)—বৈদ্য গোত্রপতি ধন্বন্তরি নাকি ব্রাহ্মণের ঔরসজাত এবং বৈশ্যা গর্ভজাত, এমনকি যেহেতু সেই বৈশ্যা তার দয়িত পুরুষের স্ত্রী ছিল না—সেজন্য ধন্বন্তরি জারজ, এবং ফলত বৈদ্য জাতিদের আবহমান কাল ধরেই ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে এই বিশেষণটি শুনতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, প্রাগুক্ত কিংবদন্তিটির সরল ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণদের বক্তব্যের অনুকূলে। তবে ইদৃশ জারজত্ব থেকে বোধহয় জাত মাত্রেরই এই সমস্যাটি আছে।

প্রাচীন রাঢ় এবং বঙ্গে জাতিগত মিশ্রণ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। সুতরাং কে জারজ এবং কে বৈধ—সে প্রশ্ন অবান্তর। তবে বৈদ্যদের উদ্ভব থেকেই তারা অসবর্ণা গ্রহণে অকুতোভয় এবং অভ্যস্ত। এই অসবর্ণা গ্রহণ এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত যে রাঢ়বঙ্গীয় এমন কোনো জাতিই নেই যাদের কন্যারা বৈদ্যগৃহে আসেনি। 'স্ত্রীরত্নম্ দুষ্কুলাদপি' এই শাস্ত্রবাক্যের মর্যাদাটি এক্ষেত্রে প্রশ্নাতীত সম্ভবত এটি বৈদ্যদেরই একটি সাহসী উচ্চারণ।

ধন্বন্তরি বয়োপ্রাপ্ত হলে স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনীকুমারের মানুষী কন্যা সিদ্ধবিদ্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁর গর্ভে সেন, দাশ এবং গুপ্ত নামে তিনটি পুত্র উৎপাদন করেন। সেনের দ্বারা ধন্বন্তরি গোত্রোপাধি যুক্ত, বৈশ্বানর গোত্রোপাধিযুক্ত এবং শক্তি গোত্রোপাধিযুক্ত বৈদ্যদের উদ্ভব। দাশের দ্বারা ছয়টি গোত্রের পত্তন হয় যেমন—মৌদ্গল্য, ভরদ্বাজ, সোপাঙ্কায়ন, ষাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ এবং বাৎস্য। গুপ্ত স্ব এবং অস্বজাতিয়া উভয় প্রকারই পত্নী গ্রহণ করলে—স্বজাতিয়া অংশে তিন এবং অস্বজাতিয়া অংশে চার গোত্রের সৃষ্টি হয়। কাশ্যপ,

BanglaBook.org

গৌতম এবং সাবর্ণি—এই তিন স্বজাতিয়া পত্নীদের গর্ভে এবং কৃষ্ণাত্রেয়, মৌদ্গল্য, কাশ্যপ ও ভরদ্বাজ এই চার গোত্র অস্বজাতিয়া পত্নীর গর্ভে জাত হয়। অস্বজাতিয়া পত্নী থেকে উদ্ভূত সন্তানেরা মাতুল গোত্রোপাধির অধিকারী, কিন্তু স্বজাতিয়া পত্নীদের গর্ভজাতরা পৈতৃক গোত্রোপাধি লাভ করে থাকেন। এই বিষয়টি বেশ রহস্যময়। অনুমান হয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার যাতে উভয়কুলেই বজায় থাকে এজন্যই এই প্রথার উদ্ভব ঘটে থাকবে। যাদের মাতুল বংশোপাধি 'দেব' তারা কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র, 'দত্ত'দের মৌদ্গল্য, 'ধর' এবং 'কর' যথাক্রমে কাশ্যপ ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় হয়ে থাকে। দেব, দত্ত, ধর, কর—ঝাঁটা মেরে বার কর'' এমন অভিমত ছোটবেলায় বহু শুনেছি। এর সবটাই কিংবদন্তির ডালপালা বটে, কিন্তু জাতপাতের কুটিল চক্রে উপেক্ষিত নয় এখনও।

পরবর্তীকালে এই অস্বজাতিয়া পত্নীজাত সন্তানেরা আরও অসবর্ণ মিশ্রণের দ্বারা অনেক ভিন্ন গোত্রের উদ্ভব ঘটায়। যেমন 'দেবে'র অস্বজাতিয়া স্ত্রীদের সন্তানেরা ইন্দ্র ও চন্দ্র—এই দুভাগে বিভক্ত হয়। দেবের দুইজন ভিন্ন জাতীয়া স্ত্রী ছিল। দত্ত'রও দুই স্ত্রীর একজনের সন্তান রাজগোত্রীয় অপরজন সোমগোত্রীয়। 'ধরে'র একজন 'ধর' অপরজন নন্দী। 'করে'র থেকে কর, কুণ্ডু এবং রক্ষিত—এই তিনটি গোত্র উপাধি আসে। আবার 'ধর'দের সাথে আদিত্য বংশীয় কন্যার বিয়ে হলে 'আদিত্য' পদবিটিও বৈদ্যসমাজে প্রবিষ্ট হয়। এইভাবে স্ব এবং অস্বজাতিয়া পত্নীদের দ্বারা সন্তানদের ক্রমে পঞ্চাশটি গোত্র তৈরি হয়। এইসব গোত্রের আলাদা টোটেম ও ট্যাবু আছে।

ভরত মল্লিক, কবি কণ্ঠহার ইত্যাদিদের কুলকারিকায় উল্লেখ আছে যে রাঢ় এবং বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কুলীন বৈদ্যদের পূর্বজরা অনেকেই নাগ, ধর, পাল ইত্যাদি কায়স্থ কন্যা বিয়ে করেছিলেন। এছাড়া, ''ভগ্নীর মেয়ে বিবাহ'' বাংলাদেশে বংশজ ও কষ্টশ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। (পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঙালির বিশিষ্টতা প্রবন্ধদ্রষ্টব্য)। দেবীবর ঘটক মেলবন্ধন ও কৌলীন্যের নবায়নকল্পে এ ধরনের বিয়ের মাধ্যমে জাত অজস্র সাংকর্যকে ঢেকে দিয়েছিলেন। এই সাংকর্য ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য সমাজে বোধহয় সর্বভারতীয় রক্তপ্রবাহের সৃষ্টি করেছিল—এমনকি তিব্বতী, চীনা, মগ, আরাকানী, ভুটিয়া এবং পাঠান রক্তও তাতে বাদ পড়েনি। স্বয়ং ব্রাহ্মানন্দ গিরি নিজে এক পাঠান রমণীকে 'শক্তি'র পদে অভিষিক্ত করেছিলেন।

BanglaBook.org

এইভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বৈদ্যসম্প্রদায় পরবর্তীকালে তৎকালীন রাঢ় এবং বঙ্গে তিনটি বিভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন, (১) রাঢ়ীয়, (২) বঙ্গজ, (৩) পঞ্চকোটী। সেন, দাস, গুপ্ত, দেব, কর, রাজ, সোম ইত্যাদি যাদের পদবি তারা রাঢ়ীয়। এদের মধ্যে আবার আরো তিনটি উপভাগ গড়ে ওঠে—খণ্ড সমাজ, সাতশৈক এবং সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রাম (আদি সপ্তগ্রাম) একসময় বঙ্গের রাজধানী ছিল। মুসলমান বিজয়ের পর লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী সপ্তগ্রাম এবং সুবর্ণগ্রাম এই দুই স্থানেই ছিল। ইতিহাসকারেরা (রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) অনেকে এরকম অনুমান করেছেন। বস্তুত বল্লাল সেনের সময় তিনি তিনটি রাজধানী স্থাপন করেছিলেন—সুবর্ণগ্রাম, গৌড় এবং নবদ্বীপ। গৌড় এবং নবদ্বীপ পতনের পর সপ্তগ্রামে সম্ভবত একটি জয়স্কন্ধাবার বা রাজধানী লক্ষ্মণ সেনের কোনো কোনো বংশধর করে থাকবেন এবং মাধব সেন ও কেশব সেন সুবর্ণগ্রামে। সে যাইহোক, সপ্তগ্রাম উপভাগের মধ্যে ত্রিবেণী, কাঁচড়াপাড়া, কুমারহট্ট, সোমড়া, সুকড়ে, নাট গোড়, দিগ্‌ড়ে, বলাগড় এবং গুপ্তিপাড়া পড়ে। অর্থাৎ সপ্তগ্রামী বৈদ্য বলতে এইসব স্থানের বৈদ্যদের বোঝানো হয়ে থাকে।

বঙ্গজ বৈদ্যদের উপাধি সাধারণত, নন্দী, কুণ্ডু, রক্ষিত, ধর, কর, চন্দ্র, দাস, দত্ত ইত্যাদি। বঙ্গজদের দুইভাগ—সেনহাটি ও চন্দনমহল। সেনহাটি খুলনায় এবং চন্দনমহল বিক্রমপুরে।

পঞ্চকোটি থাকের বৈদ্যরা দুভাগে বিভক্ত—সেনভূম এবং বীরভূম। পঞ্চকোটি বলতে পঞ্চকোট রাজ্যের সীমানা বোঝানো হয়েছে। পুরুলিয়ার পঞ্চকোটের মহারাজাদের অধীনে বত্রিশটি ছোটো ছোটো সামন্তরাজ্য ছিল। তারমধ্যে ধলভূম, বরাহভূম, শিখরভূম এবং মানভূম বৈদ্য প্রধান অঞ্চল বলে এদের বিভাগটির নাম পঞ্চকোটি। (উবাচ, কর্ণগড়ের প্রাক্তন রাজা সাহেব ত্রিদিব নারায়ণ সিংহদেব।) এছাড়া সেনভূমনামে একটি স্থান নামও শুনেছি, কিন্তু হদিস করতে পারিনি।

কলকাতা নগরীর আশপাশের অঞ্চলগুলিতে যেসব বৈদ্যদের নিবাস তারা ধন্বন্তরি গোত্রীয় এবং ধলন্তক নামে পরিচিত।

সেনভূমির অধিপতি শ্রীহর্ষ সেন সম্ভবত পঞ্চকোটের মহারাজাদের সামন্তরাজা। এই বংশের কমল সেন ও বিমল সেন দুই ভাই। কমল পিতৃ রাজ্য পেলে বিমল মহারাজ বল্লাল সেন প্রদত্ত কৌলীন্য গ্রহণ করে রাঢ় দেশে আসেন। কমলের পুত্রের নামই বিনায়ক সেন। তিনি গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেন দেবের কাছ

BanglaBook.org

থেকে গজ, কণকছত্র এবং নানাবিধ রত্ন উপহার পেয়ে রাঢ়ের মালঞ্চ গ্রামে বসবাস শুরু করেন। বিনায়ক সেনের এই সম্মান ও কৌলীন্য লাভের কারণ তিনি সেই যুগে শ্রেষ্ঠ ভিষকাচার্য ছিলেন। বিনায়কের তিন পুত্র (রোষ ২য় ধন্বন্তরী এবং কাপড়ী—এঁরাও প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ হিসেবে খ্যাত হন। হর্ষসেনের বংশে বিনায়ক সেন, কুমার, বিশ্বম্ভর এবং বিশ্বনাথ ইত্যাদিরা খুবই বিখ্যাত ছিলেন। রোষ সেন নামে একজন অতি শক্তিশালী এবং সুচিকিৎসক ব্যক্তি এই বংশে জন্মেছিলেন এবং সেইজন্য এই বংশের লোকদের আজও রোষ সেন বংশ বলে অভিহিত করা হয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং বৃন্দাবন দাস তাঁদের চৈতন্য চরিতামৃত এবং চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে বৌদ্ধ বণিকদের উদ্ধারকল্পেই শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়। চৈতন্যযুগে রাঢ়ে শিল্পী জাতিদের মধ্যে অধিকাংশই বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল। শুধু শিল্পীই নয়, ব্যবসায়ী, চাষি ইত্যাদির মধ্যেও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব চৈতন্যের বহু পূর্বকাল থেকেই বেশ গভীরভাবে ছিল। রাঢ়ের সদগোপ, গন্ধবনিক, মোদক ইত্যাদির একাংশ বৌদ্ধ (যারা সাধারণত সমভূমির দিকের) এবং সামান্য কিছু অংশ জৈন, এছাড়াও বাকি অংশ 'এনিমিস্ট' বা প্রকৃতি পূজারি। মাজি, মন্ডল উপাধিধারী কিছু গোষ্ঠীর লোকেরা—যারা পরেশনাথ পাহাড় থেকে শুরু করে বর্তমান সাঁওতাল পরগনা এবং তৎসংলগ্ন বর্ধমান জেলার উপরিঅংশের এলাকাগুলিতে বসবাসকারী—তারা জৈন মতাবলম্বী। কিন্তু সে অন্য কথা। যে বিষয়ে এই ব্যাখ্যানের সূত্রপাত তা হল এই যে, কৌলীন্য এইসব জাতিদের মধ্যে বিদ্যমান।

রাঢ় অঞ্চলে বণিকদের সমৃদ্ধি এবং প্রভাব চৈতন্যযুগ পর্যন্ত যে অত্যন্ত ব্যাপক ছিল এ বিষয়ে যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। কৌলীন্যপ্রথা এই বণিক সমাজের মধ্যেই অত্যধিক মাত্রায় ছিল—এ বিষয়েও যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পুঁথি পুস্তকে পাই। এজন্য এরকম অনুমানে দোষ নেই যে কৌলীন্যের মূলগত আদর্শটি বৌদ্ধধর্মের আদর্শে নিহিত। যদিও সেই কৌলীন্যের মধ্যে প্রথম দিকে একটা আদর্শের ব্যাপার ছিল, জাতপাতি ভয়াবহতার বিষয় কিছু ছিলনা। কুল এবং শীল কয়েকটি আচরণের উপর গড়ে ওঠে। কৌলীন্যলাভের জন্য কিছু সদাচরণ পালন আবশ্যিক ছিল। আচার ভ্রষ্ট হলে কৌলীন্য নষ্ট হত। এই জন্যই বোধকরি পঞ্চধ্যানী বুদ্ধকে 'কুলেশ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। সন্ধিৎসু

পাঠকেরা এপ্রসঙ্গে 'ধম্মসুত্ত'' গ্রন্থটি পাঠ করে দেখতে পারেন। যদিও সেটি কুলেশদের সম্পর্কে নয়, তথাপি বুদ্ধ প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলতে কাদের নির্ধারণ করেছেন, তারও একটি সকাব্য পরিচয় সেখানে আছে। আমাদের এই তুলনার উদ্দেশ্য বৌদ্ধ বিচারক্রমের ন্যায় নিষ্ঠার প্রতি অঙ্গুলি সংকেত। সেখানে কূল এবং শীলের জন্য যেসব সদাচরণ আবশ্যক ছিল তার স্খলনে কৌলীন্য নষ্ট হত এবং সেই নষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আর কুলীন বলা সংগত ছিল না।

বৈদ্যরা যেহেতু কোনো বর্ণাশ্রমী অথবা প্রচলিত জাতিবিন্যাসের উপর মূলগতভাবেই আস্থাশীল ছিল না—তাই তারা নির্বিচারে যে কোনো বর্ণ বা বর্গ থেকে স্ত্রী গ্রহণ করত। সম্ভবত এই সময়েই এই শাস্ত্রবাক্য তৈরি হয়ে থাকবে—"স্ত্রী রত্নম্ দুষ্কুলাদপি"। ফলত রাজ্যপতি এবং সমাজপতি বল্লাল—রাঢ়বঙ্গের বৈদ্যদের ক্ষেত্রে কৌলীন্যের আচার অনুষ্ঠানগুলি অনেক শিথিল করেছেন। আচারভ্রষ্ট বৈদ্যদের নাকি কখনোই কৌলীন্য নষ্ট হয় না। তাঁরা বংশানুক্রমে কুলীন মর্যাদার অধিকারী হন।

বল্লালের এই ঔদার্যের কারণ কী? কুলকারিকা পাঠকেরা অবশ্য জানেন যে, যদিও বল্লাল 'কুলীন' প্রথার অবতারণা এতদ্দেশে নিজেই করেছিলেন—তথাপি স্বাধিকার প্রমত্ত মহারাজা নিজেই অনেক কুকীর্তির নায়ক ছিলেন—যা তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন দেব পর্যন্ত সহ্য করতে পারেননি। নুলো পঞ্চাননের কারিকা এ বিষয়ে স্মর্তব্য।

বল্লাল লয় যবে পদ্মিনী জাতিহীনা।
লক্ষ্মণ কহে দ্বিজে যে প্রথাত দোখিনা।।
তাই বল্লাল ত্যাজে কুপুত্র বলি সূতে।
লক্ষ্মণ ত্যাজে পৈতা বৈদ্যকুল রক্ষিতে।।

— নুলো পঞ্চানন।

BanglaBook.org

কথিত আছে বল্লালের পশ্বাচারে ক্ষুব্ধ লক্ষ্মণ পরবর্তীকালে নতুন করে কুলীন কুলবিন্যাস করেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক বল্লাল লক্ষ্মণের বিরোধ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ওয়াকিবহাল, আমাদের বিশদ হবার প্রয়োজন নেই। তবে এইসবের ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্পর্কে সন্দেহ আছেই। কিন্তু তাতে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টিতে অসুবিধে ঘটেনি। বৈদ্যরা মূলত ব্রাহ্মণ কীনা, এই বিষাদের মূল বোধহয় বল্লাল লক্ষণের এই বিরোধ। লক্ষণের অনুসারী বৈদ্যরা উপবীত ধারণ করেন না। তাঁদের অশৌচাদি আচার পালনে ভিন্নতা আছে।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই—বল্লাল কুলীন তৈরি করার ফতোয়া দিয়েও যদি নিজে অকুলীন আহরণ করতে পারেন তবে মহাক্ষমতার অধিকারী বৈদ্যরা কেন আচারভ্রষ্ট হয়েও কুলীন থাকবেন না—এমত বিচার। বৈদ্যরা মহাক্ষমতার অধিকারী কেন? কারণ তারা বৈদ্য—অর্থাৎ চিকিৎসক। সমাজ সংসারে এমন কেউ থাকতে পারে না যে বৈদ্যকে অর্থাৎ চিকিৎসককে উপেক্ষা করতে পারেন। বল্লাল মূর্খ ছিলেন না। তাঁর পূর্ববর্তী শাসক সম্প্রদায় অর্থাৎ পালেরা এমনকী তাঁদের উচ্ছেদকারী—কৈবর্ত রাজেরাও যাঁদের তোয়াজ করতেন তাঁদের চটানোর মতো দুর্বুদ্ধি বল্লালের ছিল না। লক্ষণের নয়া-বিধান কদাচার বন্ধের জন্য অনেকটা।

এক্ষেত্রে ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখব যে পাল রাজাদের আমলেই বঙ্গে এবং রাঢ়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান যা সেইযুগে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের চর্চা বলে খ্যাত ছিল—তার সম্যক বিকাশ হয়। বহু বিখ্যাত বৈদ্যের আবির্ভাব এইসময় ঘটেছিল। চরক এবং সুশ্রুতের টীকাকার চক্রপানি দত্তের নাম এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য। বৈদ্যেরা এই সময় স্বাভাবিক কারণেই বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন—পরবর্তীকালে শৈব—(শিব এবং বুদ্ধের মধ্যে চারিত্রিক একতা ইতিহাস এবং পুরাণ অভিজ্ঞ পাঠক অবশ্য জানেন। দত্ত উপাধি বৌদ্ধ প্রভাবের ফল)। চক্রপানি দত্তের পিতা গৌড়রাজ নয় পালদেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন বলে কথিত। চক্রপানি দত্ত তাঁর টীকায় স্বপরিচয় জানিয়েছেন, লোধ্র বংশীয় কুলীন বলে। বৌদ্ধপন্থী পাল রাজাদের চিকিৎসক তথা রন্ধনশালার অধ্যক্ষ অবশ্য বৌদ্ধই হবেন। এমত অনুমান তদুপরি তিনি নিজেই চিকিৎসার প্রকরণ, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে বৌদ্ধ মতের উল্লেখ করেছেন। ঔষধপানের সময় বৌদ্ধ দেবতাদের নাম নিয়ে তা গ্রহণ করা নির্দেশও তিনি দিয়েছেন। চিকিৎসাসংগ্রহ, আয়ুর্বেদ দীপিকা, ভানুমতী, শব্দচন্দ্রিকা এবং দ্রব্যগুণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ আয়ুর্বেদী পুস্তক চক্রপানি দত্ত রচনা করেন। চক্রপানির ভ্রাতা ভানু দত্তও একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। চিকিৎসক সুরেশ্বর পাল দিব্যোক ভ্রাতুষ্পুত্র কৈবর্তরাজ ভীমের চিকিৎসা করতেন। তিনি শব্দপ্রদীপ, বৃক্ষায়ুর্বেদ এবং লৌহ সর্বস্ব নামে বৈদ্যক পুঁথিগুলির রচয়িতা। চক্রপানি উল্লেখ করেছেন যে, তাঁদের আগে বৃন্দকুণ্ড রচিত সিদ্ধযোগই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছিল। বৃন্দকুণ্ডের কুণ্ড উপাধি দেখে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন—তিনি বাঙালি ছিলেন। ভরতমল্লিক তাঁর চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থে লিখেছেন—

BanglaBook.org

কুণ্ড বংশে বৃন্দ কুণ্ডো বৈদ্যক শাস্ত্রকৃৎ।
স ভরদ্বাজ সম্ভূতো বঙ্গভূমি কৃতাশ্রয়॥

চরকের টীকাকার গয়দাস রাঢ়ীয় বৈদ্য বলে জানা যায়। ইনি গৌড়ের সেই সময়কার রাজার খুবই অন্তরঙ্গ ছিলেন। কর বংশীয় মাধব কর—নিদান, দ্রব্যগুণ, যোগ ব্যাখ্যা, রুগ্নবিনিশ্চয় নামে চিকিৎসা বিষয়ক পুঁথির লেখক। অনেকে মাধব করকে বাঙালি বলে মনে করে থাকেন। আরেকজন বিখ্যাত চিকিৎসক বকুল করও বাঙালি বৈদ্য ছিলেন। তাঁর সময়কাল খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ। এই বংশের সুবিখ্যাত বৈদ্য নিশ্চল কর বকুল করের স্মৃতি তর্পণ খুব সুললিত ভাষায় করেছেন। এছাড়াও বহু বহু অখ্যাত বিখ্যাত বৈদ্যের আবির্ভাব পাল ও সেন আমলে বঙ্গদেশে ঘটেছিল। এঁরা সমগ্র মানুষের চিকিৎসার দায়িত্ব খুবই সুন্দরভাবে করেছেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু এঁরা কেউই যে ব্রাহ্মণত্বের দাবি নিয়ে হেঁদিয়ে মরেছেন। এমন নজির দেখি না।

রোগ নিরাময়ের জন্য বৈদ্য কবিরাজেরা বরাবরই দৈবী কৃপায় বিশ্বাসী। কারণ এইসব চিকিৎসকেরা জানতেন রাঢ়বঙ্গের সাধারণ মানুষ অনৈসর্গিক বিষয়ে বড়ই শ্রদ্ধাবান। সম্ভবত এর কারণ তাদের অশিক্ষা অথবা কুশিক্ষা অথবা এমন বিচারও অযৌক্তিক নয় যে, বঙ্গদেশে তথাকথিত আদি/মধ্য যুগের চিকিৎসকরাও স্ব স্ব ধর্মবিশ্বাসানুযায়ী কিছু কিছু অনৈসর্গিক ভাবালুতায় আচ্ছন্ন ছিলেন। সেইহেতু রোগ নিরাময়কল্পে তাঁরা বরাবরই দৈবী দোহাই পাড়তেন। গবেষক মানিকলাল সিংহ বলছেন, "প্রাচীনকালে ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করিয়া ঔষধ দেওয়া বা ঔষধ ভক্ষণের রীতি ছিল"। আমরা জানি যে ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে শিবের কিছু চরিত্রগত মিল আছে—যে কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। রাঢ় বঙ্গে বৈদ্যদের জাতি দেবতা শিব। বৈদ্যরা যদি কোনো প্রকৃত বর্ণাশ্রমী জাতি হত তবে শিব বা বুদ্ধ তাদের উপাস্য হতেন না। অবশ্য এই বিচারের মাধ্যমে আমরা এমত সিদ্ধান্ত উপস্থিত করছি না যে বৈদ্যরা একসময় অবশ্যই বৌদ্ধ ছিল। কিন্তু নিশ্চল করের নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করে একথা বলা যায় যে, বুদ্ধ তাদের উপাস্য অবশ্য ছিলেন। যেমন—

সিদ্ধ ফলাৎ পানীয় বটিকাত্রে লিখ্যতে।
অনাথনমো জগদৈকনাথঃশ্রী লোকনাথঃপ্রথমঃপ্রযত্নঃ
জগাদ পানীয় বটীং সুপট্টীং তামেব বক্ষ্যামি
গুরু প্রসাদাৎ।

BanglaBook.org

আবার মন্ত্রতন্ত্র, দৈবচিকিৎসা, স্বপ্নাদ্য ঔষধ ইত্যাদি চিকিৎসা ব্যবস্থায় নিশ্চল কর লিখেছেন—

বোধি চার্য্যাবতারেক্তং কাম লোকাদিনিন্দিতং।
আতুরং শ্রাবয়েদ্বীমান বোধয়েচ্চ মুহুর্মুহুরীতি॥
আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তিনাপ্যুক্তং কামশোক ভয়ান্নাদস্বপ্ন চৌরা—
তথা বৌদ্ধাগমে অমোঘ জ্ঞান তন্ত্রেপি—
মহতা ভিক্ষু সংধেন সার্দ্ধমষ্টাদশভি ভিক্ষু সহস্রৈর্ণ ব ভিশ্চ—
বোধি হৃদয়মন্ত্রষমপাস্তু।
যথা—ওঁ তারে উতারে ত্তার স্বাহেতি—ইত্যাদি।
তারা ইত্যাদি দেবীরা বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী।

অনেক পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে রাঢ়বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মমতের বহু পরবর্তীকালে হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মমত আসে। বৌদ্ধ ধর্মমত আসার আগে এ-দেশে কী ধর্মমত ছিল—সে সম্বন্ধে তাঁরা পরিষ্কার করে কিছু বলেন না। তবে এই মতের অনুসারী হতে হলে অনুমান করতে হয় যে বৌদ্ধ, জৈন মতবাদের আগে স্বাভাবিক কারণেই এদেশে আদিবাসীদের মত animism চালু ছিল। হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য মত আসার পর বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু এই ত্রিবিধ ধর্মানুযায়ী দেবদেবীদের সাথে animism-এর নির্যাস যুক্ত হয়ে পরবর্তী ধর্মীয় ধারাটি পুষ্ট হয়। ভারতীয় অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এই অঙ্গরাজ্যের দেবদেবীদের ভিন্নতা এবং বিশিষ্টতা নিয়ে পর্যালোচনা করলে—অবশ্যই এ বিষয়টির যাথার্থ্য অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

সুতরাং এই অঞ্চলের বিকাশের কোনো এক ঐতিহাসিক পর্যায়ে বৈদ্যরা যে বৌদ্ধানুগামী হতেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, যেমন আশ্চর্যের নয় যে পরবর্তীকালে এই বৈদ্য বা চিকিৎসকেরাই ঔষধ দেওয়া এবং ঔষধ ভক্ষণের জন্য শিব, দুর্গা, মনসা, ধন্বন্তরি, অশ্বিনীকুমারের দোহাই পাড়তেন। যে কথাটি বলতে চাইছি তা হল শুধুমাত্র জনগণের বিশ্বাস অবিশ্বাসই নয়। চিকিৎসকদের বিশ্বাস অবিশ্বাস ব্যাপারটিও এই—শিবের দোহাই, বুদ্ধের দোহাই, বিষহরির দোহাই এর নিদান নির্দেশের পিছনে কার্যকরী ছিল।

বৌদ্ধপ্রভাবের প্রতিষ্ঠা চৈতন্য আবির্ভাবকাল পর্যন্ত ক্রিয়াশীল ছিল। চৈতন্য ও নিতানন্দকে এতদ্দেশ্যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠাকল্পে—আদি বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে বৌদ্ধভাব মিশ্রণ করতে হয়েছিল। এইজন্যেই, যে কথা

BanglaBook.org

আগেও বলা হয়েছে, বণিক এবং শ্রেষ্ঠীদেরকে বৌদ্ধ প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য (শুধু বৌদ্ধ নয়, বৌদ্ধ এবং জৈন) নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সচেষ্ট হয়েছিলেন। ফল, মুণ্ডিতমস্তক ভিক্ষুদের আদর্শে নেড়ানেড়ি সম্প্রদায়।

কিন্তু এসব নিতান্ত ধান ভানতে শিবের গীত। মূল প্রসঙ্গে ফিরে আমরা দেখতে পাবো চৈতন্যপ্রভাবে বৈদ্য প্রধানরা বৈষ্ণব হচ্ছেন এবং চৈতন্যের চিকিৎসক ও ভক্ত তথা কড়চা লেখক মুরারী গুপ্ত বৈদান্তিক পথ পরিত্যাগ করে ভক্তি প্রেমোন্মাদনায় নিতান্ত অবৈদ্যসুলভ আচরণ করছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মূলগতভাবে যদিও বৈদ্যরা অথর্ব বেদী, তথাপি অতিরিক্ত বৌদ্ধিক চর্চার জন্য তাঁরা নব্যন্যায়কেই বিশেষভাবে আশ্রয় করে নিলেন। কিন্তু চৈতন্যের ভক্তিবাদ বেদান্ত এবং ন্যায়ের মূলে কুঠারাঘাত করলে এই সময় বৈদ্যরা কিয়ৎ মাত্রায় ভক্তিবাদী হয়ে পড়েন। অবশ্য যেকথা একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটা কিন্তু বৈদ্যদের ক্ষেত্রে নিতান্তই বিপরীত স্বভাব। কেন না, চিকিৎসক হওয়া বিধায় তাঁদের সমাজে বিজ্ঞানচর্চার যে পারম্পর্য ছিল—সেখানে ভক্তিবাদ আদৌ খাপ খায় না। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে বৈদ্যরা অর্থাৎ চিকিৎসকেরা নিরবচ্ছিন্নভাবে বিজ্ঞান, বিশেষত আয়ুর্বিজ্ঞান চর্চা করে এসেছেন, যদিও জাতি হিসেবে তখনও তাদের পৃথক অস্তিত্ব গড়ে ওঠেনি। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বৈদ্যক চরকসংহিতা সংকলন করেন তাঁর নাম অগ্নিবেশ। ইতিহাসকারেরা ঐক্যমত যে অগ্নিবেশ খ্রি. পূ. ষষ্ঠশতকে তক্ষশীলায় বসে এই মহান কার্যটি করেন। প্রাচীন ভারতের তক্ষশীলা, বারাণসী এবং মধ্যযুগের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শাস্ত্রে অবদানের কথা বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের গবেষণায় আজ প্রমাণিত। এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর যে অপরিসীম অবদান তা সভ্যতার ইতিহাসে অবশ্যই নজিরবিহীন। এই গ্রন্থ প্রণেতারা, যেমন, অগ্নিবেশ, শল্যবিদ সুশ্রুত এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে খুবই স্বাধীনভাবে আয়ুর্বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সহকারী (allied) বিজ্ঞানসমূহের সহায়তা লাভ করেছেন। বিজ্ঞানচর্চার এরকম কেন্দ্রিকতা সেই যুগে খুব বেশি ছিল না বলেই মনে হয়।

সুতরাং বৈদ্যরা সেই বৈজ্ঞানিক ধারাবাহিকতা আশ্রয় করে একটি স্বতন্ত্র, ব্রাহ্মণ্য সমাজ-নিরপেক্ষ গোষ্ঠী গঠন করেছিলেন। ব্রাহ্মণরা বৈদ্যদের এবম্বিধ স্পর্ধা এবং ঋদ্ধিতে স্পষ্টতই ঈর্ষান্বিত এবং ক্রুদ্ধ ছিলেন। এর পরিচয় আমরা পাই নানান কিংবদন্তির মারফত। যেমন, ব্রাহ্মণদের মধ্যে কথিত, বৈদ্যরা

BanglaBook.org

ব্রাহ্মণেতর, কেন না, তারা চিকিৎসা ব্যবসায়ী। যেহেতু বৈদ্যরা চিকিৎসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত তাই ব্রাহ্মণদের কাছে তারা ব্রাত্য। ব্রাহ্মণ্য সমাজে তাদের অনুমোদন ছাড়া, যে কেউ কোনো উৎপাদনশীল পেশায় বা বৌদ্ধিক চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছে তারাই ব্রাত্য নামধারী হয়েছে। যেমন, নট, চিত্রকর, সংগীত রচয়িতা ও শিল্পী ইত্যাদিরা ইতিহাসের কোনো না কোনো সময়ে ব্রাহ্মণদের দ্বারা অচ্ছুত বা ব্রাত্য বা নিম্নজাত বলে আখ্যায়িত হয়েছেন। শ্রমিক, কৃষক বা অন্যান্য মেহনতী মানুষদের তো কথাই নেই। ফলে, বৈদ্যরা যখন যশ এবং ঐশ্বর্যের শিখরে, তখন থেকেই তাঁদের মধ্যেও এক ধরনের অহমিকা এবং শ্রেষ্ঠত্ব বোধ জন্মাতে শুরু করে। তাঁরা জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, রাজকীয় সাহচর্যে, সম্পদে অবশ্যই দীর্ঘকালব্যাপী এক পরম্পরা সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের সমাজে পারস্পরিক সহায়তার তথা সহমর্মিতার যে ব্যাপক প্রকাশ একদা ছিল বা আজও ছিঁটেফোঁটা আছে তার কারণ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতামূলক আচরণ। চিকিৎসক বলেই তাঁরা সমাজে বিশেষ কতকগুলো সুবিধা নিজেদের জন্য অবশ্যই কুক্ষিগত করেছিলেন। সুতরাং জাত অহংকার থেকে তাঁরাও মুক্ত ছিলেন না, যার অবশেষ এখনও সমাজে বিদ্যমান। ব্রাহ্মণ্য ধারটাই এমন যে সেই জাল থেকে বিজেতা বা বিজিত কেউই মুক্তি পায়না।

তবে নিরন্তর শাস্ত্রচর্চা, কূটতর্ক ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ব্রাহ্মণেরা যেমন আচারসর্বস্ব, কুসংস্কারাশ্রয়ী এবং পরার্থজীবী হয়ে পড়েছিলেন—বৈদ্যরা তাঁদের পেশার জন্য ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সংস্পর্শে থাকায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার উদার মানসিকতা অর্জন করতে পেরেছিলেন এক সময়। কিন্তু কালক্রমে তা লোপও পেয়েছিল। এই উদার মানসিকতা তাঁরা দীর্ঘকাল ধরে রাখতে পারেননি। ভারতের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধ্বংস হবার পর, আয়ুর্বেদচর্চা নিতান্ত ব্যক্তি এবং পরিবারকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। মধ্যযুগে পাল রাজারা যখন তুর্কিদের দ্বারা মগধ থেকে উৎখাত হলেন তখন সর্বশেষ বিশ্ববিদ্যালয়টিও ধ্বংস হয়ে গেল। রাষ্ট্রীয় মাৎস্যন্যায়ের সেই ঘোর সময়ে বৈদ্যক এবং ভিষকাচার্যরা সম্ভবত যিনি যেমন পেরেছেন সেইমত অমূল্য গ্রন্থরাজি নিয়ে গ্রামে গ্রামান্তরে এবং ক্ষুদ্র সমস্ত রাজাদের আশ্রয়ে চলে গিয়ে থাকবেন। কেউ বা সেন রাজাদের আশ্রয়ে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিকভাবে আয়ুবিজ্ঞান চর্চা অব্যাহত রাখলেন। সেন বংশীয় রাজাদের এবং পরবর্তী তুর্কি, মোগল ইত্যাদিদের কোনও কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা

BanglaBook.org

আমরা জানি না। তুর্কি, পাঠান, মোগলরা ক্রমান্বয়ে শাসনে এসে প্রায় সাতশো বছর ধরে এই বিশাল দেশ শাসন করেন; কিন্তু কোনো আমলেই নালন্দা, তক্ষশীলা, বারাণসীর মতো বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার সমন্বিত এবং দেশ-বিদেশের জ্ঞানীগুণীদের দ্বারা অলঙ্কৃত কেন্দ্রীয় বিজ্ঞানচর্চার, দর্শনচর্চার বা নন্দনচর্চার বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠেনি। তাই এই বিরাট সম্ভাবনাময়, মহান ঐতিহ্যপূর্ণ মানবকল্যাণে নিয়ত উন্মুখ এবং সমসাময়িক বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসা বিজ্ঞানচর্চা নিতান্ত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক হয়ে গিয়ে আর বিশেষ বিকাশ লাভ করতে পারল না। বৃহৎ ব্যপ্তি থেকে ক্ষুদ্র আয়তনে এসে তার গতি শ্লথ হল।

ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের মধ্যযুগের প্রথমার্ধে রাঢ়বঙ্গে মাধব কর, চক্রপাণি দত্ত, গয় দাস ও বৃন্দ কুণ্ড প্রভৃতি প্রায় অলৌকিক সুচিকিৎসকদের নেতৃত্বে আয়ুর্বেদ চর্চার গৌড়ীয় ঘরানার সৃষ্টি, বিকাশ ও পরিণতি ঘটে। এইসব বৈদ্যরা আয়ুর্বেদ আয়ত্ব করার জন্য সংস্কৃত, পালি ভাষায় যেমন পাণ্ডিত্য অর্জন করেন, তেমনি আঞ্চলিক উপভাষাগুলিতেও যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করেন।

উদ্ভিদবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, গণিত, জ্যোতিষ এবং রসায়ন শাস্ত্রে তাঁরা সুগভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। রসায়নের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যেসব উপাদান, উপকরণ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসস্তূপে আজও সাক্ষী হয়ে আছে তা যথার্থ গৌরবের। এইসব চিকিৎসকদের ধাতুবিদ্যা বিষয়েও যথেষ্ট দখল ছিল। পারদের মত বিষাক্ত ধাতুকেও তাঁরা শোধন করতে জানতেন। ভাতের কাঞ্জী, ঘৃতকুমারীর রস, ইটের গুঁড়ো ইত্যাদির দ্বারা তাঁরা পারদ শোধন করতেন। অত্যন্ত বিষধর সাপের বিষ সংগ্রহ করে তাঁরা শোধনের দ্বারা তাকে অমৃতে পরিণত করতে পারতেন।

যদিও ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক চর্চায় এই মহান বিজ্ঞানের বিকাশ সমূহ ব্যাহত হয়েছিল। তবু রাঢ়বঙ্গের বৈদ্যরা খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত তাঁদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। নালন্দার পতনের পর রাষ্ট্রীয় সাহচর্যে এই বিজ্ঞানের কোনো সামুদায়িক চর্চার কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। তবুও তুর্কী, পাঠান, মোগল আমলে কিছু কিঞ্চিৎ উৎসাহ, সাহচর্য এইসব ভিষকাচার্যরা পেয়েছেন। কেন না, চিকিৎসা বলতে আয়ুর্বেদিক এবং ইউনানী ছাড়া সে যুগে এদেশে বিশেষ কিছুই ছিল না। পশ্চিমী চিকিৎসা তখনো তত উন্নতও নয়, লভ্যও ছিল না। ইংরেজ আগমনের পর এই চিকিৎসা সম্পূর্ণ অনাদরে অবহেলায় এবং কুটিল ইংরেজ শাসকদের চক্রান্তে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। বৈদ্যরাও চিকিৎসক জাতি হিসাবে ধীরে ধীরে ক্ষীয়মান হতে থাকেন।

———o———

BanglaBook.org

রশ্মিদ রবি এবং কেরাচিনির অম্ফ

একেবারে যাকে বলে অন্ধকে হস্তিদর্শন করতে বলা। আমাকে কিনা বলা হল রবিদার উপরে দু'কথা লিখতে। রবিদা মানে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত মশাই, যাঁর উপর 'উক্ষতারণীয়' হুম্‌দো হুম্‌দো অধ্যাপকেরাও পাথরের চাঁই-র মতো ভারী ভারী নিবন্ধ লিখে, তাঁদের বাঘের থাবার মত হাতগুলো কচলাতে কচলাতে হেঁ হেঁ করে বলবেন, কাজটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গেল, আর এমন বেয়াদপি করব না। রবীন্দ্রকুমারকে রবিদা ডাকার অধিকার আমাকে যে কেউ দিয়েছেন, এমনটি ভাবার হেতু নেই। তবে তিনি জাত্যংশে বদ্যি, আম্মো বদ্যি। তিনিও বাকলাই, আম্মো। সুতরাং দাদা ডাকব না তো কী? তাছাড়া রবিদা নিজে ছাপার অক্ষরে ঘোষণা করেছেন, তিনি বরিশালের কুলীন বাঙাল, সেদিক দিয়েও আমার দাদা বলে ডাকাটা সাড়ে ষোলো আনা স্বাধিকার। কারণ ঘোষণাটি তিনি করেছেন আমারই কেতাব বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে, তাই ...। আশা করি, এর পর আর কেউ স্বাধিকারভঙ্গ নিয়ে গম্ভীর উপদেশ দিতে আসবেন না। প্রসঙ্গত, এখানে দুটি শব্দ নিয়ে কপিরাইট-এর জবাবদিহি করে রাখি, উক্ষতারণ এবং আম্মো। যাঁদের কাছে ধারলাম তাঁরা মহাশয় ব্যক্তি, ছোটখাটো চুরিচামারির হিসেব ধরেন না।

অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে ভাবলাম, বেশ একখানা তাবড় পণ্ডিতি 'ইশে' লামাইয়া ফ্যালামু'। শুধু ধরতাইটা পাচ্ছিলাম না। কান্টকে নিয়ে ধরতে গিয়ে গোটা এনলাইটেনমেন্ট-এর তত্ত্বটা অন্ধকার হয়ে গেল। বিবেকানন্দ বিষয়ক বক্তৃতার বইগুলো কিছুকাল হল নিজের হাতে বাধ্য হয়ে উপহার দিয়েছেন, সেসব নিয়ে নাড়াঘাটা করতে গিয়ে শঙ্কর, রামানুজ, মোক্ষমূলর ইত্যাদি নামগুলো অভ্যন্তরস্থ বায়ু কুপিত করল বটে, কিন্তু নির্গুণ, সগুণ ইত্যাকার বায়বীয় ব্যাপারগুলি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে লক্ষ্মীর পাঁচালির পরের গাওয়া কেত্তন, আর কালী কেত্তন সব কিছুর সঙ্গে একাকার হয়ে পরম তত্ত্বকে 'সর্বং খল্বিদং' করে ফেললে। শেষমেষ চৈতন্য হলে দেখলাম, লেজ যথাস্থানেই আছে। আমি বেমৎলব তার চারদিকে পাক খেতে গিয়ে নিজের চার দিকেই পাক খাচ্ছি। তাই এখন ভাবছি, বরিশালী

BanglaBook.org

আপ্তবাক্যটিই প্রকৃত 'সূত্র'। অর্থাৎ "গরিবের পোলা তোর মোতার দরকার কী?" এটি একটি বাকলাই বরিশাল্যা প্রবচনসূত্র। সুত্রটির টীকা ভাষ্য না দিলে 'বোজোন Zাইবে না'। বাপ ছেলেকে খালুই নিয়ে বজার থেকে মাছ আনতে বলেছেন। মাছ নিয়ে মাঠের আলপথ ধরে ফেরার সময় ছেলের জোর হিশি পেলে, খালুই মাঠে রেখে তৎকর্মে ব্যস্ত। ইত্যবসরে চিল এসে খালুইসুদ্ধ মাছ নিয়ে গগণবিহারী। বেচারা কাঁদতে কাঁদতে বাপের কাছে এসে বৃত্তান্ত জানালে বাপ তাকে এই কথাটি বলেন। সুতরাং সটীক-সূত্রটি তদবধি প্রতিষ্ঠা পেল যে, গরিবের পোলার মোতার দরকার নেই।

যতদূর মনে হয়, সুত্রটি প্রথমবার পিতৃদেবের কাছে এবং পরে রবিদার কাছে শুনে স্বয়ং প্রাজ্ঞ হয়েছি। তাই ভাবছি, ফালতু "উফাল মারইয়া লাভ নাই। সোজা গপ্পডা সোজা কথায় কইয়া ফ্যালাই।" তাতে আমারও পরিশ্রম লঘু হবে, আর পাঠক পাঠিকারাও আমার রবীন্দ্রকুমার বিষয়ক এলেম ধরতে পারবেন না। আমার গল্পটি মূলত হচ্ছে, রবিদার সঙ্গে আমার মতো একজন 'আলেহা-আপড়া' মানুষের যোগাযোগের গল্প। গল্পটি খুব সরল নয়। এই সংযোগের দুই জন অনুঘটকের কথা বলা এক্ষেত্রে আবশ্যক। অনুঘটক দু'জনের নাম যথাক্রমে সুশীল সেনশর্মা (প্রয়াত) এবং শ্রীশিশির সেন। এঁদের দুজনের সঙ্গেই আমার পরিচয়ের প্রথম সূত্র ছিল একটি পত্র-নিবন্ধ, পরে যেটি ভাটিপুত্রের পত্রবাখোয়াজি নামে একটি কৃশ বই হিসাবে প্রকাশিত হয়। পত্র-নিবন্ধটি ছিল তপন রায়চৌধুরী রচিত, তাঁর প্রথম বাংলা রচনা 'রোমন্থন' অর্থাৎ 'ভীমরতি' প্রাপ্তর পরচরিত চর্চা' নামক বইটির একটি রিজয়েণ্ডার। তখন লেখাটি 'নাইয়া' নামক একটি স্বল্পায়ু পত্রিকায়, 'আহ্লাদে ফাউকানো গেথবা ভাটিপুত্রর পত্র বাখোয়াজি' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সুনীলদা তাঁর এক বন্ধু মারফত রচনাটি পড়ে খুব আহ্লাদিত হন এবং এদেশে ও বাংলাদেশে অবস্থিত তাঁর ব্যাপক বন্ধুবান্ধবদের সেটি পড়ান। সেই থেকে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ। এরপর তাঁর প্রায় নিয়মিত কর্তব্যকর্ম দাঁড়াল দৈনিক আমাকে নিত্যনতুন সংস্কৃতি-প্রেমী তথা বিদগ্ধ মানুষদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এ কাজে তাঁর দোসর ছিলেন তাঁর এক অগ্রজ বন্ধু শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়, যিনি স্বয়ং একজন উত্তম শিশু সাহিত্যিক এবং প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর অন্তরঙ্গতম বন্ধু তথা জীবনীকার। তাঁদের কাজই ছিল আমাদের মতো অখ্যাত জনেদের মধ্যে সামান্যতম সম্ভাবনার ছিঁটেফোঁটা দেখলেও, তা সাধ্যমত বিদগ্ধ মহলে তুলে ধরা। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমাদের উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি করা।

সুনীলদা আর শিশিরদা দুজনেই রবিদার কাছের মানুষ। শ্রীশিশির সেন রবিদার নিকটতম প্রতিবেশী এবং রবিদা সম্পর্কে যাবতীয় খবরাখবর রাখা তিনি অদ্যাবধি বিশেষ কর্তব্যকর্ম হিসেবে করে চলেছেন। তপনবাবু অক্সফোর্ড থেকে কলকাতা এলেই রবিদার ওখানে প্রায় নিয়মিত যাতায়াত করে থাকেন। রবিদার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অসামান্য শ্রদ্ধাপূর্ণ এবং হার্দিক। প্রসঙ্গত, শিশিরদা এবং সুনীলদা, উভয়েই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভূতাত্ত্বিক, কিন্তু নিজস্ব বিষয়ের বাইরেও তাঁদের সুকুমার শিল্পের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ এবং চর্চা যুবকদের নান্দনিক উৎসাহ উদ্দীপনাকেও হার মানাত।

সুনীলদার সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৯৩-এর কোনও একটা সময়ে টেলিফোন মারফৎ, তাঁরই উদ্যোগে ঘটেছিল। এর কিছুদিনের মধ্যেই বাকিদের সঙ্গে, তাঁরই মধ্যস্থতায় আমার পরিচয় ঘটে। তপনবাবুর সঙ্গে পরিচয়টা অবশ্য সরাসরি পত্রনিবন্ধটির মাধ্যমে প্রথমে ডাক যোগাযোগ এবং অনতিবিলম্বে এবং সামনাসামনি ঘটে। এই সময়েই এক দিন সুনীলদার ফোন 'ভাইডি, তুমি তো এহন বিখ্যাত অইয়া গেলা। আরে, কাইল সান্ধ্য মজলিশে তপন রায়চৌধুরী আর রবি দাশগুপ্তের আড্ডার বিষয়বস্তু আছেলে তোমার বইপত্তর আর তুমি। শিশিরদা সেখানে উপস্থিত আছিলেন। রবিদা তোমারে আর তোমার লেহাপত্তর দ্যাখতে চাইছেন।' শিশিরদার লগে যোগাযোগ করইয়া দ্যাহাডা করইয়াই ফ্যালাও। উল্লেখ্য ইতিমধ্যে আমার সামান্য বইপত্তর এবং কিছু খুচরো লেখা, যা তখনও পর্যন্ত প্রকাশিত, সে সব তাঁদের দিয়েছি। 'বিষাদ বৃক্ষ'-এর তখনও ডালপালা ছাঁটা চলছে। রবিদাকে তখনও কোনও বই দেওয়া হয়নি, আলাপ ছিল না বলে।

প্রথম দর্শনের অনুভূতিটা অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের মতো। অত বড় একটা মাথা, ওইরকম দীর্ঘবাহু এবং অমন চওড়া মজবুত হাতের কব্জি, সর্বোপরি মেদহীন উন্নত দেহকাণ্ড সমন্বিত সুদর্শন একজন মানুষকে সামনে দাঁড়ানো দেখলে, নিজেকে একটি নেংটি ইঁদুর ছাড়া কিছু ভাবা যায়? বার্ধক্যজনিত কিছু শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য অবশ্যই ছিল। কিন্তু তা কেবলই বহিরঙ্গে প্রক্ষিপ্ত। খান তিনেক বই আর কিছু কুঁচো কাঁচা পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলে, তিনি প্রাচীন মহাস্থবিরদের ভঙ্গিতে আশির্বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। আত্ম দীপো ভব। বলা বাহুল্য, রবিদা তখনও আঁচ করেননি যে এ পিদ্দিমে তেল নেই।

BanglaBook.org

।। দুই ।।

তার পর থেকেই মাঝে মাঝেই যাতায়াত, টেলিফোন করা, শারীরিক খোঁজখবর নেওয়া, এছাড়া আর কী করা যায়? মানে আমাদের মতো মানুষের পক্ষে আর কী করা সম্ভব? তবু বোধিবৃক্ষ তো বটেন। প্রায় শতাব্দী প্রাচীন জ্ঞানতাপস। যত অকিঞ্চিৎকর মনুষ্যই হই না কেন, এটা তো বুঝি, তাঁর জ্ঞান এবং কর্মের সামগ্রিক অনুশীলনের পরিধির পরিমাপ, অথবা তাঁর তাবৎ স্বাধ্যায়ের অনুপুঙ্খ খোঁজখবর রাখার মতো মনীষা, আমার প্রজন্মের জাতক জাতিকাদের তো দুরস্থান, বিগত প্রজন্মেরও খুব বেশি কারুর যে অধিগত, তেমন তো মনে হয় না। সাহিত্য, ইতিহাস এবং দর্শন বিষয়েই যদি শুধু বলা হয়, তার ধ্যান ধারণা, পঠন পাঠন এবং অনুশীলন তথা সর্বোপরি মনুষ্যকূলে দুর্লভ যে গুণটিকে আমরা দুর্লভ হিসাবে মান্যতা না দিয়ে হাল্কা করে 'কাণ্ডজ্ঞান' বলে তুচ্ছ করি, তা যে তিনি কী বিপুল পরিমাণে ধারণ করেন, আর তা যে কী করে গোটা বিশ্বকে ঋদ্ধ করার নিরন্তর তপস্যায় নিযুক্ত, তাঁর সাম্প্রতিকতম দু'একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেও তা বোঝা যায়। আমি তাঁর Whither Philosophy এবং A World Humanity শীর্ষক প্রবন্ধাবলীই শুধু এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করব। কিন্তু সে শুধু উল্লেখমাত্রই, সেসব নিয়ে সামান্যতম আলোচনারও ধৃষ্টতা দেখাতে পারব না। সেটা ভীষণভাবে অনধিকার চর্চা হবে, পাপ স্পর্শ করবে আমাকে। একটা কথাই শুধু বলব যে রবিদা জ্ঞানকে প্রজ্ঞায় পরিণত করতে পেরেছেন। আজকের দিনে একথা অসম্ভব মনে হলেও, একশো ভাগ সত্য বলে আমি বিশ্বাস করি। জ্ঞান যখন প্রজ্ঞায় উত্তীর্ণ হয়, তখনই তা মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে। শুধুমাত্র শুষ্ক জ্ঞান কল্যাণাত্মক হয় না। একমাত্র প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিই হৃদয়ের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান হন। রবিদার কাছে চুপচাপ বসে থেকে, কখনও কখনও তাঁর দু-চারটি কথা শুনে এবং তাঁর সামান্য কিছু রচনা পাঠ করেও এই সত্য উপলব্ধ হয়। আমার অভিজ্ঞতাটা এমনই। আরেকটা কথা, এহেন স্মৃতিশক্তি যদি আর কারুর থাকে! সারা জীবনের অধীত বিদ্যা পুরোটাই তাঁর মগজে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে আছে।

'বিষাদ বৃক্ষ' এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হলে একদিন 'সভয়ে' জিজ্ঞেস করলাম একবার হাঁড়ির ভাত দু'একটা টিপে দেখবেন কিনা। মনের ইচ্ছেটা এই যে দু'একটা পাতা উল্টে দেখেও যদি বলেন যে এবার ছাপাখানায় দেওয়া যেতে

BanglaBook.org

পারে। ভয়ের কারণ খুব একটা ছিল না। প্রথমত, আমি প্রকৃতিগতভাবে একটু বেশি মাত্রায় ছ্যাবলা গোত্রের মানুষ। ছ্যাবলাদের সুবিধে এই যে তারা অসম্ভব দুঃসাহসী হয়। দ্বিতীয়ত, রবিদার স্বভাবে এতদিনের মধ্যে আদৌ কিছু ভয়াবহতার লক্ষণ পাইনি, যেটা পণ্ডিতদের সাধারণ চারিত্রলক্ষণ বলে ধরা হয়। বরং কোনও বিষয় নিয়ে যদি 'বোগদা সুলভ' মতামত কখনও দিয়ে ফেলি, তবে গভীর মমতায় তার সঠিক টীকাভাষ্যটি বুঝিয়ে 'জ্ঞানাঞ্জন শলাকা'-র উপযুক্ত ব্যবহারে পাঁঠা মানুষ করার প্রযত্ন করেন। তৃতীয়ত, মাঝে একদিন 'সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম' নিয়ে নিজে থেকেই আলোচনা করার সময় ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলেছিলেন। বইখানা বুড়ার খুব পছন্দ হয়েছিল সম্ভবত। তাছাড়া, নিঃশব্দে রোদন বোধহয় তাঁর চরিত্রগত কোমলতার লক্ষণ। এটা প্রায়শই নজরে পড়ে। ভ্যাঁ করে কাঁদার কথাটা একটু বেশিই বললাম বটে, তবে যে 'একছের' মিথ্যা কথা, এমন নয়। এই সব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে, একদিন শিশিরদার সঙ্গে গিয়ে আকাঙ্ক্ষাটিকে ব্যক্ত করলাম।

একটানা পাতা চারেক পড়ে এবং খানিকটা এলোমেলো উল্টেপাল্টে বললেন, এটিকে অচিরেই প্রকাশের ব্যবস্থা কর। বললাম, প্রকাশক পাচ্ছি না। যার কাছেই যাই খেদিয়ে দেয়। আপনি যদি—

—ও ব্যাপারে আমার হাতযশ নেই। কিন্তু বইটা প্রকাশের ব্যবস্থা করতেই হবে। চেষ্টা চালাও।—এবিষয়ে অন্যান্য বৃত্তান্ত এই আখ্যানের জন্য জরুরি নয়, বা খুব উপাদেয়ও নয়। সবাই জানেন, অনামী লেখকেরা প্রকাশকদের কাছে আপদ বিশেষ। ভাবটা এমন, যেন, কেলে কুলো গন্না খাঁদা মেয়েকে তাদের সোনার টুকরো ছেলেদের কারুর সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইছি। রবিদাই এরকম একটা মত ব্যক্ত করলেন।

রবিদা স্বভাবসিদ্ধ ভাবে সুরসিক, পাণ্ডিত্য সেখানে অনাবশ্যক গাম্ভীর্যের কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করেনি। খুবই গম্ভীর আলোচনার মধ্যে হঠাৎ করে এমন চমৎকার এক একটি সরেস আপাত লঘুবাক্য বলবেন যে, প্রথমটা হকচকিয়ে যেতে হয়। সে ব্যাপারটি তাঁর লেখার মধ্যেও মাঝে মাঝে বড় মজাদার লাগে। তবে তা কদাচিৎ। একদিনের ঘটনা বলছি। সে দিনও শিশিরদার সঙ্গে গিয়েছিলাম। শরীর মন অন্য দিনের চাইতে ভালই ছিল মনে হয়। বেশ একটু ফুরফুরে ভাব। এমনিতে বয়সোচিত কারণে শরীর দুর্বলই থাকে। বিশেষ কোনও রোগ যে আছে এমন নয়। যথেষ্ট সাবধানী মানুষ। যাহোক, সেদিন আমরা

BanglaBook.org

থাকাকালীন একটা টেলিফোন এল। টেলিফোনটা শোবার ঘরে। ড্রইংরুমে আমরা। কথাবার্তায় বিঘ্ন ঘটে বলে, সেখানে টেলিফোন নিষিদ্ধ। হঠাৎ শুনলাম রবিদা বেশ উচ্চরবে হাসছেন। বসার ঘরে এসে জানালেন, হীরেন ফোন করেছিল। একটা বেশ মজার কথা বলল, জান। বলে কী, আমাদের নাকি বয়সের গাছপাথর নেই। ও কথাটা আমি বলতে পারি। ও বলবে কেন? ওর আর এমন কী বয়স? শিশিরদা আমার দিকে একটু ঝুঁকে বললেন, পাথর নেই এ কথাটা আমার পরামর্শ ছাড়া ওনাদের কারুরই বলা উচিত না, গাছের ব্যাপারটা অবশ্য আমি জানি না। শিশির দা ভূ-তাত্ত্বিক, প্রস্তর বিশেষজ্ঞ। রবিদা কানে একটু কমই শোনেন। শিশিরদারও একটা যন্তর দরকার হয়। যাই হোক, রবিদার কানে কথাটা যায়নি। তিনি বলে চলেছেন, বলে কিনা গাছপাথর নেই। আমি সেই যে কত কাল আগে জন্মেছিলাম—। তা হ্যাঁ হে শিশির আমার তো এই উননব্বই হোল, না কি? তোমার তো হিসেব থাকা উচিত। প্রত্যেক বছর তুমিই তো আমার জন্মদিনে গান শোনাও। শিশিরদা জানালেন, ওই রকমই হবে। রবিদা একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, কেন যে লোকেরা জন্মদিন পালন করে। একটা দুঃখের দিন নিয়ে উৎসব করার কোনও মানে হয়?

এই ঘটনার বছর তিনেক বাদের আরেক দিনের ঘটনা। এই বছর খানেক আগের। সেদিন আমরা শোবার ঘরেই বসেছি। রবিদা শুয়ে। ইদানীং বেশিরভাগ সময়ই শুয়ে থাকেন। প্রয়োজনীয় সব সামগ্রীই বিছানার আশেপাশে। একজন নার্স এবং একজন কম্বাইন্ড হ্যান্ড সব সময়ের জন্য। এছাড়া নিত্য সারস্বত চর্চার সহায়ক একটি মেয়ে। পড়ে শোনানো এবং অনুলিখন তাঁর কাজ। নিজে পারেন না এখন আর। কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার মতো সারস্বত চর্চা অব্যাহত। স্ত্রী গত হয়েছেন বেশ কয়েক বছর। একমাত্র সন্তান মেয়ে দূরবাসিনী। যে দিনের কথা বলছিলাম, সেদিনও বয়স প্রসঙ্গ উঠল। রবিদা বললেন, দেখতে দেখতে নব্বই-এ পড়লাম। নাকি বল শিশির? শিশিরদা কিছু বলার আগেই আমি নিচু স্বরে তাঁকে জানালাম, তিন বছর আগেই না বলেছিলেন উননব্বই চলছে? শিশিরদা সুকুমারীয় হিসাবে বললেন, এখন কমতির দিকে যাচ্ছে। রবিদাকে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, উদ্‌যাপনের সময় তো হয়ে এল, সবাইকে খবর দিতে হবে। ফেরার সময় রাস্তায় নেমে বললেন, রবিদার মত স্মৃতিধর পুরুষ আর একজনও পাবে না হে। শুধু বয়সের ব্যাপারেই একটু গণ্ডগোল হয়ে যায় আজকাল।

তবে কী জান? আমার মনে হয়, এটা রবিদার রসিকতারই একটা ধরন।

BanglaBook.org

।। তিন ।।

আমার একটা অসামান্য কপালজোর আছে। এমন সব মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছে যাই, যাঁদের চোদ্দো ফার্লং-এর মধ্যে আমার মত চতুষ্পদ স্বভাবীর পৌঁছনোর কথা নয়। সংখ্যায় তাঁরা হয়ত তেমন বেশি নন, তবে যেখানে একের মানই সহস্র, সেখানে সংখ্যার খোঁজের হেতু কী? রবিদার ফ্ল্যাটের সামনের মুক্তাঞ্চলে ঘাসের কিছু অপ্রতুলতা নেই। তবে সে ঘাসাহারের জন্য মবলগ এলেমের দরকার আছে। সুদৃশ চতুষ্পদ সরাসরি সেখানে চরতে যেতে পারবে না। কিন্তু ঈশ্বর নাকি অযোগ্যদের অহৈতুকী কৃপা বিলিয়ে থাকেন। আমার কপালে সেরকমটি ঘটেছিল। নচেৎ সুনীল সেনশর্মার মত শিশির সেন মশাই বা তপন রায়চৌধুরীর মতো সদগুরু, পাণ্ডা এবং নবিই বা জুটবে কেন, আর রবিদারই বা অহৈতুকী প্রেম বা কৃপাই যদি বলি তাও বলা যায়, আমার উপর আপাতিত হবে কেন? আল্লা কসম্, মা কালীর দিব্যি বা যে কোনো কিরা কেটে বলতে পারি, এব্যাপারে অধমের কিছুমাত্র উদ্যোগ বা উদ্দেশ্য ছিল না। দেখা হওয়ার আগে, তাঁর বিষয়ে কিছুই জানতাম না। নামটা শোনা ছিল, আর সাহিত্য এবং পরিচয় পত্রিকায় গুটি দুয়েক প্রবন্ধ পড়েছিলাম মনে আছে। সে কারণে জ্ঞানদুর্মর 'নীরদ সির' উপরে পোষিত কিছু নিরুপায় 'ছি অমন করে না' জাতীয় মনমানসে আরামি মলমের প্রলেপ লেগেছিল। আলাপ হওয়ার বেশ কিছুদিন পর, এই হালে, মহাশয় দু'খানা প্রবন্ধের কিতাব, কাঁপা হাতে নাম লিখে দিলে, পেটের ঘাস, মানে কি না এতকাল 'ইদিক সিদিক' যা যতটুকু পড়েছি বা লিখেছি, হজম হতে শুরু করল। কিতাব দুখানার শিরোনাম যথাক্রমে 'ঐতিহ্য ও পরম্পরা' এবং 'বাঙালি কি আত্মঘাতী ও অন্যান্য রচনা'। আরেকখানা বই, বেশ ডাগর গতরের, পাশ থেকে উঁকি মারছিল। এ দিন একাই গিয়েছিলাম। বইখানার শিরোনাম দেখে, আমার বেদান্ত সম্বন্ধে জ্ঞানস্পৃহা বেশ প্রবল হয়ে উঠল। কারণটার জন্য অবশ্য রবিদাই দায়ী। মাঝে একদিন বেদান্ত বিষয়ে একটা গল্প বলেছিলেন। গল্পটা পরে বলব। আগে বইখানা হাতাবার কায়দাটা বলি। ভাল মাস্টারমশাইরা কীভাবে পটেন সে আমার বেশ জানা আছে। বললাম রবিদা, বেদান্ত নিয়ে সহজ দু'কথায় যদি কিছু বলেন, মানে কিছুই তো জানি না, কৌতূহল আছে। রবিদা প্রশান্ত হেসে নিজের বাঁদিকে, যেখানে র‍্যাকের ওপর বইখানা ছিল, সস্নেহে তাকালেন। কিন্তু নাগালের বাইরে থাকায় বললেন ওটা

BanglaBook.org

পাড়। ওর মধ্যেই মোটামুটি পাবে। মনস্কামনা সিদ্ধ হল। কিন্তু পড়তে গিয়ে বুঝলাম লোকে যে আমাকে 'পাঁটা', 'বোগদা' বলে সে কিছু মিথ্যে নয়। নইলে একবিংশ শতকে কোনও সুস্থ মগজওয়ালা লোক যেচে বাঁশ নেয়? এখন ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে যাই, ভয়ে ভয়ে কেটে পড়ি। পাছে পড়া ধরেন। যতক্ষণ থাকি বরিশালের গল্প করি। বরিশালের মাহিলাড়া গ্রাম রবিদার পিতৃভূমি, যদিও জন্ম কলকাতায় ১৯১৫ সালে। জন্ম সালটা বই-এর ব্লার্বে পেয়েছি। সঠিক কিনা জানি না।

আমার এহেন অ্যাগনোস্টিক ধারণার হেতু, আমাদের প্রজন্মের জাতকদের সঠিক জন্ম তারিখ মা বাপেদের স্মরণ থাকত না। সংখ্যায় অনেকগুলো করে ছিলাম কি না, তাই। শুধুমাত্র যারা ইস্কুলে ভর্তি হবার সৌভাগ্যের অধিকারী হত, তাদের বাবারা ভর্তি করানোর সময় যা হোক একটা তারিখ বাতলে দিতেন। নিজেরা অপারগ হলে ইস্কুলের কেরানীবাবু তাঁর দূরদৃষ্টি নিয়ে সহায়তা করতেন। ছাত্রদের চেহারা দেখে ডেট অব বার্থ বসাতেন। বলতেন তুই মোটা, তোর বয়স বেশি। রোগাদের কম। রবিদাদের প্রজন্মের বেলায় নিয়মটা কী ছিল জানতে চাইনি। তাঁর পিতার সন্তান সম্পদও সাকুল্যে কত জানা নেই। তাই অ্যাগনোস্টিক থাকাটাই নিরাপদ। বিশেষত, আগেই বলেছি, রবিদারও এই হিসেবটা বেশ ওঠানামা করে।

যাকগে বয়সে কী এসে যায়? যা বলছিলাম, বইখানার পুরো নাম স্বামী বিবেকানন্দ অন ইন্ডিয়ান ফিলজফি অ্যান্ড লিটারেচার। ফরোয়ার্ড করেছেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। শেষ লাইনে লিখেছেন, I hope readers will enjoy reading this book. এখন enjoyment এর ঠেলায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। শুধু বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, God, what a brilliant brain works behind this gigantic monster! বৃহদস্থি মানুষ, সুতরাং monster বলায় দোষ নেই।

কুল্লে এই তিনখানা কিতাব পড়েছি। শেষের খানা ছাড়া বাকি দু'খানা নিয়ে হয়ত কিছু বাতেল্লাপনা করব। কিন্তু বেদান্তবর্ষী তৃতীয়খানা? পাঠক পাঠিকাগণ মাফ করবেন। বিষ্ণু শর্মা বলেছেন—

অনন্ত পারং কিল শব্দ শাস্ত্রম্
স্বল্পস্তথায়ুর্বহোবশ্চ বিঘ্নঃ।
সারং ততোগ্রাহ্য-মপাস্য ফল্গুঃ
হংসৈর্যথাক্ষীরামিবাম্বু মধ্যাৎ।।

BanglaBook.org

একটু এদিক ওদিক করে ব্যাপারটা মিলিয়ে নিতে হবে এই উক্তিটির। 'শব্দ' স্থলে 'তত্ত্ব' কথাটি প্রযুক্ত হলে রবিদাকে বিষ্ণু শর্মার অবতার বলা যাবে।

বেদান্ত, রবিদা এবং বিবেকানন্দের বেদান্ত বিষয়ে বৃহৎ কর্ম ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা এই আলেখ্যের উদ্দেশ্যও নয়, সেই ক্ষমতাও আমার নেই। আমি শুধু তাঁর পদ্ধতি নিয়ে কিছু কথা বলে এপ্রসঙ্গ শেষ করব। জ্ঞানচর্চার তথা সাধারণ্যে তার নির্যাস বণ্টন বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম রবিদার সঙ্গে। তবে তা একান্ত নিজস্ব গাঁইয়া ধরনেই। বলেছিলাম, এই যে আপনারা সারা জীবন বৃহৎ মহৎ তত্ত্বের পর্যালোচনা করে এসেছেন এবং তখনও করছেন। তা সাধারণের কী কাজে লাগে? বেদান্তের 'তৎ ত্বম্ অসি' বা 'সোহহং' 'শিবোহহং' ইত্যাদি প্রাকৃত ধর্মে কি আদৌ স্থান পায়? অথবা তা কি তাদের নৈমিত্তিক যাপিত জীবনে কোনও সহায়তার প্রতিজ্ঞা রাখে? লোকায়ত ধর্মে, বিশেষ করে বাঙালির পরম্পরাগত ধর্মাচরণে বেদান্তের প্রায়োগিক ভূমিকা কী? যে গল্পটির কথা, পরে জানাব বলে ইতিপূর্বে আভাস দিয়েছিলাম, রবিদা তার মাধ্যমেই উত্তরটি দিলেন। এবার সেই গল্পটির কথা আমরা বলব।

তাঁর ছাত্রাবস্থায় অক্সফোর্ডে এক দার্শনিক প্রবর প্রফেসর জাখার রবিদাকে বলেছিলেন যে ভারতীয়রা ধর্মক্ষেত্রে শুধুই সব 'তুমিময়' করে রেখেছে। সেখানে ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁদের একাত্মতা বলতে কিছু নেই। রবিদার যে উত্তরটি ছিল, সেটি যদি আমার নিরুক্তিতে প্রকাশ করি, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এরকম—আCS, আCS, ভাল করইয়া পড়াশোনাডা করনায় বা মাইনসের গোড়াঘাটা লইয়া লাড়াচাড়ার অইব্যাস নাই, সেকারণ হানতি পার নায়। উদ্ধৃতি হিসাবে তিনি একটি গানের শেষ কয়েকটি পদ উল্লেখ করেছিলেন। তা হল,

"...এই কর হরি দীন দয়াময়
তুমি আমি যেন দুটি নাহি রয়
জলের তরঙ্গ জলে কর লয়
চিদ্ ঘন শ্যামসুন্দর।"

সাহেবের তখন আক্কেল গুড়ুম। বলে কী? রবিদা বলেছিলেন, গোটা গানটা মনে ছিল না। আমরা, বাল্যকালে, মা জেঠিমাদের লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়া শেষ হলে এই গানটা গাইতাম। গোটা গানটা পরে একজন আমাকে দিয়েছিলেন জোগাড় করে। হারিয়ে ফেলেছি। এনিয়ে 'বিষয় হিন্দুধর্ম' নামক একটি নিবন্ধ

BanglaBook.org

সম্ভবত ১৪০৫ সালে শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় তিনি প্রথম লেখেন। পরে বহুবার বহু লেখায় তিনি এর উল্লেখ করেছেন।

পুরো রচনাটি যিনি দিয়েছিলেন, তাঁকে খুঁজে বার করলাম প্রায় কাকতালীয় ভাবে। তিনিও অধ্যাপক জাতীয় মনুষ্য এবং পোকাবাছা স্বভাবের। তাঁর রচিত একখানি বইয়ে রবিদা বিষয়ে কিছু আলোচনা প্রসঙ্গে গোটা গানটি তিনি উদ্ধৃত করেছেন। তার পুরো পাঠ নিম্নরূপ,

"দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু
কৃপা বিন্দু বিতর।
হৃদি বৃন্দাবনে কমল আসনে
প্রাণমনসনে বিহর।
নয়ন মুদি বা চাহিয়া থাকি
অথবা যেদিকে ফিরাব আঁখি
ভিতরে বাহিরে যেন হে দেখি
তবরূপ মনোহর।
এই কর হরি দীনদয়াময়
তুমি আমি যেন দুটি নাহি রয়
জলের তরঙ্গ জলে কর লয়
চিদ্‌ঘন শ্যামসুন্দর॥

গানটি কৃষ্ণপ্রসাদ সেনের রচনা। রচনাকাল উনবিংশ শতকের ষাটের দশক হবে। রবিদার জ্ঞানচর্চার ধরতাইটা এই কাহিনিতে বেশ স্পষ্ট হয়। অথবা তাঁর ধারাটা বোধহয় উনিশ শতকীয় মনীষীদের সেই ধারা, যেখানে তাঁরা কোনও নির্দিষ্ট দার্শনিক সীমারেখার মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখার কথা ভাবতেন না। ইংরাজিতে quest শব্দটিতে যা বোঝানো হয়, সেইটিই তাঁর বীজমন্ত্র। এ কারণেই বলেছিলাম লক্ষ্মীর পাঁচালির পরের গাওয়কেত্তন থেকে কালীকেত্তনের বিস্তৃতির কথা। কিন্তু বেদান্ত নিয়ে আর নয়।

কিন্তু আর নয়ের পরেও তো কিছু কথা থাকে। যাঁরা বেদান্ত নিয়ে কিছু পড়াশোনা করেছেন তাঁদের কথাই বলছি। তাঁরা কি রবিদার ভাবে ভাবিত হয়ে পরবর্তী সময়টাকে সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন? বোধহয় না। যদি হতেন, তবে সাহিত্য ক্ষেত্রে মননশীল প্রবন্ধ নিবন্ধের ধারাটা এমন শুকিয়ে যেত না।

BanglaBook.org

শুধু বেদান্ত নিয়ে কথা নয়, সমাজের কোনও স্তরেই আজ আমরা দর্শনের কোনও অস্তিত্ব দেখি না। এ কারণেই তাঁকে লিখতে হয় Whither Philosophy। ২০০৫ত সালের জুন জুলাই-এ লেখা এই প্রবন্ধাবলীতে রবিদার আক্ষেপ বড় স্পষ্ট। শুরুতেই তিনি জানাচ্ছেন, Actually there is today a crissis in our life, most of all in our politics. What concerns me at the moment is the average man's indifference to philosophy." বলছেন, "When we were university students in the thirties of the last century we were philosophical people, more philosophical than the people of ancient Greece or ancient China. As students of Calcutta University, we loved to claim that ours was a philosophical city." তিনি আফশোস করছেন, সিকি শতাব্দী ক্ষমতায় থেকেও মার্কসবাদীরা মার্কসবাদ বিষয়ে কোনো কথাই বললেন না। ব্যাপারটা তাঁর কাছে দুঃখজনকভাবে আশ্চর্যের মনে হয়। এমনকী প্রফেসর রোনাল্ড রিনসন যখন তাঁর "Mourning Marxism" প্রবন্ধে লেখেন, "today has marxism finally exhausted it's possibilities" আমাদের বাঙালি মার্কসবাদীরা এই মন্তব্য বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করার বাধ্যবাধকতা অনুভব করেন না।

এই প্রবন্ধাবলীতে রবিদা ব্যাপক ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন বর্তমানের আদর্শবিহীন ভোগবাদী নৈরাজ্যের স্বরূপ। কিন্তু এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। রবিদা বিষয়ে এই রচনা হাল্কা কথার, ব্যক্তিগত মেলামেশায় তাঁকে যতটুকু জানতে পেরেছি সেই বিষয়ে। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে কোনও কথাই খুব হাল্কা ভাবে বেশিক্ষণ বলা সম্ভব নয়।

রবিদা সম্বন্ধে এরকম খামচে খামচে কিছু আলোচনা করারও কোনও মানে হয় না। রবিদা নাকি মূলত ইংরেজি সাহিত্যের specialist, কিন্তু জ্ঞানক্ষেত্রে কোনও ধারায় যে গভীরতম অধ্যয়নের কোনও অসদ্ভাব তাঁর আছে, এমন কথা কেউ বলতে পারেন না, ভাবতেও পারেন না বোধহয়। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ লিখেছেন, "He has long been known as a specialist in English literature but he has now emerged as a specialist in other fields also, (Forward to Swami Vivekananda on Indian Phillosophy and Literature ... 2nd point : Sept 2005, The Ramkrishna Mis-

BanglaBook.org

sion Institute of Culture). বিষয়ের বৈচিত্র্যে ভরপুর তাঁর দুখানা ক্ষীণকায় বই, যাদের নাম ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, 'ঐতিহ্য ও পরম্পরা' এবং 'বাঙালি কি আত্মঘাতী ও অন্যান্য রচনা' এই দু'খানা পাঠ করলেও উপরিউক্ত মন্তব্যের যাথার্থ হৃদয়ঙ্গমে অসুবিধে হয় না।

রবিদার সঙ্গে আমার আলাপচারিতা দীর্ঘকালের নয়। তদুপরি বয়সোচিত কারণে, স্বাভাবিকভাবেই বেশিক্ষণ কথা বলা তাঁর পক্ষে অসুবিধেজনক। আমরাও তাঁকে খুব একটা বকাই না। তবু যেটুকু বার্তালাপ তাঁর সঙ্গে করেছি বা এখনও করি তাতে দুটো জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার। দার্শনিক প্রস্থানে তিনি অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকতার অনুরাগী, আর ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকীয় শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির গৌরবজনক 'ঐতিহাসিক মহত্ত্বেরও' তিনি সুগভীর রসজ্ঞ গবেষক।

বাঙালি কি আত্মঘাতী ও অন্যান্য রচনা সংকলনটিতে মোট এগারোটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এই প্রবন্ধগুলিতে রবিদা যেন বিষয়ে বর্ণিত এবং ব্যাখ্যাত চরিত্রগুলির মাধ্যমে নিজেকেই ছিঁড়েখুঁড়ে দেখেছেন। গোটা দেশ, কাল, সমাজ ও সংস্কৃতিকে পরম্পরার বহতার রেখে আধুনিক সময়ের প্রেক্ষিতে বুঝতে এবং বোঝাতে চেয়েছেন এবং অবশ্যই বাঙালি মন, মনন এবং প্রাণকে তিনি নিবিড় নিষ্ঠায় বুঝে নিয়েছেন। গোটা ব্যাপারের জন্যই, যাকে Spiritual quest বলা হয় তার প্রকাশ এবং পদ্ধতিগত ভাবে এখানেই ঔপনিষদিক জ্ঞানানুসন্ধানের প্রচেষ্টারই প্রয়োগ। এখানে একটা উদাহরণ দেবার লোভ সামলাতে পারছি না। বাঙালির মন এবং প্রাণের পরিচয় হিসেবে ব্যাপারটি রবিদা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রায়শই বলেন, এমনকী তাঁর লেখায়ও এই কথাগুলি পেয়েছি। যৌথ পরিবার ছিল তাঁদের। রবিদার বড় জেঠিমা, যাঁকে তাঁরা বড়মা বলে ডাকতেন, তিনি বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে বিধবা হন। রবিদার মা তিন ছেলেকে বড় জায়ের জিম্মা করে দিলেন এবং তদবধি তিনি কোনওদিন তাঁদের আদর বা তিরস্কার কোনওটাই করেননি। রবিদা বলেছেন, মায়ের এই ত্যাগের ব্যাপারটা বড় হয়ে বুঝেছি। তিনি মনে করতেন, তাহলে বড়মার অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে। বাঙালির এই প্রাণসম্পদ আমিও আমার বাল্যে দেখেছি এবং নিজেদের যৌথ পরিবারের মধ্যে, এজন্য রবিদার এই পর্যবেক্ষণ যথার্থভাবে বুঝতে আমার অসুবিধে হয়নি। মনের কথা প্রসঙ্গেও একটি সুন্দর গল্প তাঁর কাছে শুনেছি এবং পড়েছিও। আমি

BanglaBook.org

এখানে গল্পটি বলার আগে একটু সাফাই গেয়ে রাখি, নচেৎ পাঠকের ভুল বোঝার সম্ভাবনা। যাঁরা রবিদার সঙ্গে গল্পগুজব করেছেন, তাঁরা জানেন যে, কথোপকথনকালে তিনি প্রায়শই তাঁর এই ধরনের গল্পকথা বলে থাকেন, যা হয়ত তিনি কোথাও লিখেছেন। তিনি যে ব্যাপারটা কোথাও লিখেছেন, সে বৃত্তান্ত ভুলে গেছেন। কিন্তু বক্তব্য বা গল্পটা হুবহু প্রায় একইভাবে তাঁর স্মৃতিতে আছে। লিখিত বা পঠিত কোনও কিছুই তাঁর স্মৃতির অন্তরাল হয় না। তবে ইদানীং এই ধরনের ভুল প্রায়শই হতে দেখছি। বোধহয় তা প্রাচীনতা নিবন্ধনই ঘটছে। যা হোক, গল্পটি তাঁর লিখিত ভাষায়ই বলি, "আমাদের পরিবারে অবশ্যই আমরা কেহ মনস্বী বলিয়া গণ্য হইতে পারি না। কিন্তু আমরা চিন্তার মর্যাদা বুঝিতাম। যেখানেই একটা আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা থাকে, সেখানেই চিন্তার আবির্ভাব। সদাচারের মধ্যে এক ধরনের চিন্তাশীলতা কাজ করিয়া থাকে। একটি মানুষের ব্যক্তিত্ব বা মর্যাদা যে তাঁহার সম্পদ বা বিত্তের উপর নির্ভর করে না, সে শিক্ষা আমাদের পরিবারে পাইয়াছি। সামাজিক সাম্য সম্বন্ধে অবশ্য কোনও লেকচার কোনও দিন শুনিতে হয় নাই। গুরুজনদের আচরণেই আমরা এই সাম্যবোধ লক্ষ করিয়াছি। এবিষয়ে একটি গল্প করিতে পারি ঃ আমার পিতার এক বন্ধু মাঝে মাঝে ঢাকা হইতে আমাদের কলকাতার বাসায় আসিয়া কিছুদিন থাকিতেন। তিনি রাজ কর্মচারী ছিলেন, সেজন্য তাঁহার সঙ্গে একটি আর্দালি থাকিত। এই আর্দালির নাম ছিল যামিনী। সে আমাদের খুব প্রিয় ছিল। একবার বাবার বন্ধুটি আসিলেন, কিন্তু যামিনী সঙ্গে নাই। আমরা সকলে ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিতে লাগলাম, যামিনী আসে নাই? একটু বিব্রত বোধ করিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, না এবার যামিনী আসে নাই, আমি কি চলিয়া যাইব? আমরা লজ্জা বোধ করিলাম। বলার সময় এই কাহিনিটি চলিত বাংলায় বলা ছাড়া, অন্য কোনওরকম পার্থক্য লক্ষ্য করিনি। বাঙালিদের মন এবং প্রাণ বিষয়ে এমন সরল অথচ হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য আমি আর পাইনি।

BanglaBook.org

——o——

রিক্তা ধরিত্রীর দুঃখপাঠ

"আবার মোরে পাগল করে দিবে কে।
হৃদয় যেন পাষাণ-হেন বিরাগ ভরা বিবেকে।
দিবে সে খুলি এ ঘোর ধূলি-আবরণ।
তাহার হাতে আঁখির পাতে জগত-জাগা জাগরণ।
সে হাসিখানি আনিবে টানি সবার হাসি।
গড়িবে গেহ, জাগাবে স্নেহ—জীবন বাঁশি।
প্রকৃতি বধূ চাহিবে মধু, পড়িবে নব আভরণ
সে দিবে খুলি এ ঘোর ধূলি আবরণ।" —রবীন্দ্রনাথ

গোটা গানটি উদ্ধৃত করে দিলেই বর্তমান গ্রন্থটির যথার্থ পাঠ-পর্যালোচনা হত।

একখানা গ্রন্থকে পর্যালোচনা করতে বলা হলে ঠিক কীভাবে করা তা শ্রেয় তার কোনো শাস্ত্রীয় পদ্ধতি আমার জানা নেই। তথাপি ইদানীং আমাকে কখনো এই দুরূহ কাজটি করতে হচ্ছে। একজন লেখক যে নিষ্ঠা আর শ্রম ব্যয় করে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন এবং তার পিছনে যে পরিমাণ চিন্তা-মনন আর অনুভূতির মন্থন-যন্ত্রণা তাঁকে পোহাতে হয়, সেকথা ভাবলে আমার কলম আর এগোতে চায় না। বিশেষ করে গ্রন্থটি যদি লেখকের মননশীল রচনা হয় তবেতো কথাই নেই। সমালোচক বা পর্যালোচক হিসাবে তখন নিজেকেই ডেকে বলতে সাধ হয়, তুমি কে হে তালেবর, একজন ভাবুকের ভাব বিচার নিয়ে, তাঁর নিদ্রাহীন তপস্যা নিয়ে, হাতুড়ে বদ্যির মতো অর্ধ শিক্ষিতের পাণ্ডিতি ফলাচ্ছ?

হাসান আজিজুলের (পুরো নামটি হাসান আজিজুল হক) 'চালচিত্রের খুঁটিনাটি' নামক দে'জ পাবলিশিং-কৃত পশ্চিমবঙ্গীয় নতুন সংস্করণের সুদৃশ্য গ্রন্থটি পর্যালোচনা করতে বসে প্রথমেই উপরোক্ত চিন্তাটি আমায় আচ্ছন্ন করল। হাসান আজিজুল হকের পরিচিতি উভয়বঙ্গেরই ব্যাপক। নতুন করে কিছু বলা বাহুল্যমাত্র। গল্প-উপন্যাস এবং প্রবন্ধ মিলিয়ে তাঁর রচনাসম্ভার যে খুব ব্যাপক এমন বলা যাবে না। তার কারণ, তিনি লেখেন কম, ছাপেন আরো কম কিন্তু ভাবেন অনেক।

BanglaBook.org

এই ঘরানার লেখকদের নিয়ে আমার মতো লাফাঙ্গা সমালোচক বা পর্যালোচকদের সমস্যা বেশ কঠিন হয়। বেঁটেখাটো, কিন্তু গ্রীক ভাস্কর্যের ক্রীড়াবীরদের মতো পেশিসমৃদ্ধ চেহারার তেরোটি নিবন্ধের সংকলন নিয়ে আমাকে অশিক্ষিত-পটুত্বের যুযুৎসুর প্যাঁচ খেলতে হবে ভেবে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। গতরে ভারি হলে বা দৈর্ঘ্যে লম্বা হলে হয়তো ফাঁক ফোকর গলে বেরিয়ে যাওয়া যেতো। কিন্তু বেঁটেখাটোদের বিশ্বাস নেই। তার উপর বৌদ্ধিক মাপে আমি যথেষ্টর চাইতে একটু বেশিই বেঁটেখাটো এবং মোটা হওয়ায় প্রথমেই 'ওয়াক ওভার' দিয়ে রাখা সমীচিন বোধ করছি। কিন্তু পত্রিকা সম্পাদকের নির্দেশটি পালন করতে তো 'প্যাচালডা সাইরেই ফেলতি হবে'। তা খাই আছাড় খাবো।

সংকলনের তেরোটি লেখাই রত্নগর্ভ রচনার এক বিশেষ ধরণ। রসসাহিত্য বলতে আলংকারিকেরা ঠিক কী দিক নির্দেশনা নির্দিষ্ট রেখেছেন সে বিষয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞান আমার নেই। প্রকাশক এবং স্বয়ং লেখকের ঘোষণা এবং দাবি অনুযায়ী রচনাগুলিকে Belles Letters হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। লেখক গ্রন্থটির 'মুক্তধারা' প্রকাশনার ভূমিকার একস্থানে লিখেছেন, " ... সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতি-বিদের কাজের ক্ষেত্রের উপর এই লেখাগুলি কখনো কখনো চড়াও হয়েছে। বিশেষজ্ঞের তত্ত্বজ্ঞানের যে অভাবটা দেখা গেছে সেটা পূরণের চেষ্টা হয়েছে অল্পবিস্তর রসসিঞ্চনের দ্বারা।" কথাটির মধ্যে অধ্যাপক সুলভ ব্যাখ্যা প্রচেষ্টা থাকলেও তার সত্যতা অস্বীকার করার মতো নয়।

'রস' বস্তুটা নিয়ে শিল্প সাহিত্য ক্ষেত্রে মামলা আছে ঢের। এতে আবিষ্ট হওয়া যায় তবে ব্যাখ্যা করতে গেলে বিপত্তি ঘটে। তাই ঐ চেষ্টায় যাব না। বরং 'রস' বিষয়ক দুটি বহু-চর্চিত শ্লোক উদ্ধার করে আপাত নিষ্পত্তিতে যাওয়া যেতে পারে। গদ্য বিষয়ে রসশাস্ত্রীরা জানিয়েছেন "গদ্যং নিকষাং কাব্যম্", এবং কাব্য বিষয়ের ভাষাকে "কাব্যম্ রসাত্মাকং বাক্যম্।" শ্লোক দুটিতে গদ্য এবং কাব্যের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই সে অর্থে। তবে গদ্যের কষ্টি পাথর কাব্যের রস বিচারে, এমাকি নিজের মধ্যেও যে Poesy অন্তর্লীন তার যাচাইয়ের জন্য এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। হাসানের গদ্য, সেই প্রেক্ষিতের বাংলার উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণের জনপদ-প্রকৃতি তথা জনপদ-আশ্লিষ্ট মানুষদের লোকজীবন ব্যাখ্যারই কষ্টিপাথর, একথা দ্বিধাহীনভাবেই উচ্চারণ করবো। প্রবন্ধ, নিবন্ধ বা রসসাহিত্য

BanglaBook.org

মাত্রেরই নবরসের এক বা একাধিক রসনিবেদনের দায় আছে। কিন্তু বর্তমান কালে সাহিত্য শিল্পের ক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত রসের আমদানি হয়েছে, রস-পিপাসুরা সেটিকে বিরক্তিরস নামে অভিহিত করতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রেই ভাষায় অকারণ মেদস্ফীতি তারই উপলক্ষণ। কিন্তু হাসান প্রসঙ্গে সে আলোচনার ইঙ্গিত মাত্রও পাপ। নেহাৎই সেই রসটির স্ফীতির কারণে এই উল্লেখ।

একটি বিষয় নিয়ে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আলাদা আলাদাভাবে সবকটি লেখা নিয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণের পরিসর না থাকায় সামগ্রিকভাবেই করি। বই-এ ডুব দিয়ে পাঠক নিজেই তার যাথার্থ খুঁজে নিতে পারবেন। একটি নিবন্ধে লেখক লিখেছেন, "বাইরের বাস্তবতা আমার লেখার বিষয়ে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আমার অভিজ্ঞতার অংশ হতে গিয়ে কি বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে? আমি কি আমার লেখার ভিতর দিয়ে সংগোপনে টুকরো টুকরো বাস্তব গড়ে তুলছি যাকে লোকে শিল্পের বাস্তব বলে, যা প্রকারান্তরে বাস্তব থেকে পালাবার এবং লুকোবার একটা উপায় মাত্র?" তিনি যেন সদর্পে এবং নিজস্ব বস্তুবাদী নিষ্ঠাকে প্রগলভ প্রদর্শনে উত্তর দেন, "না, বাস্তবকে অবলম্বন করে এরকম কোনো মোহ আমি তৈরি করতে চাই না।" যদিও তাঁর এই অঙ্গীকার রক্ষার প্রাণান্ত প্রয়াস সবকটি রচনাতেই লক্ষ্য করি, তবু নানান প্রশ্ন যে মনের মধ্যে উঁকি মারে তাও তো মিথ্যে নয়। সেসব প্রশ্ন সত্য এবং বাস্তবতা ঘিরেই। তিনি নিজেই স্বগতোক্তি-প্রায় উচ্চারণে মুখর "কী সহজ এই 'বাস্তবতা' শব্দটির ব্যবহার অথচ কী বিশাল এর বিস্তৃতি!" আমরা 'মোহদৃষ্টি' বা 'মোহ' ইত্যাদি শব্দের সহজতা ও বিস্তৃতি বিষয়েও অনুরূপ বিস্ময় প্রকাশ করতে পারি। বাস্তবতা, মোহ ইত্যাদি ব্যাপারগুলো আসলে কী সে বিষয়ে চূড়ান্ত সজ্ঞার্থের সর্বশেষ উত্তর-মীমাংসা কি আমাদের আয়ত্ব হয়ে গেছে? বস্তুবাদী-ন্যায়াশ্রয়ী একজন লেখকের কাছ থেকে বাস্তবতাকে এরকম চূড়ান্ত এক পূজাবেদিতে বসানো সব প্রশ্নে একটা পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেওয়ারই প্রবণতা বলে মনে হয়। কিন্তু তিনি স্বয়ংই বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করতে করতে একসময় নিজেই ঐ সীমাবদ্ধতার বেদিটি ভেঙ্গে দেন। বাস্তবতা স্তরান্তরতায় গতি পায়। সত্য, মিথ্যা, বাস্তবতা, মোহ ইত্যাকার মৌল ধারণাগুলি 'তৈলধারি' 'পাত্রাধারি' বাক্‌যুদ্ধ রসসম্ভোগে বিঘ্ন ঘটায়। সুতরাং সে প্রসঙ্গ যাক। শুধু লেখকের 'বাস্তব' শব্দটির সজ্ঞার্থ খোঁজা নিয়ে তাঁরই প্রচেষ্টার

BanglaBook.org

সামান্য উল্লেখ করি। খরাক্লিষ্ট রাঢ়ে বা জলভরা ভিজে শ্যামল সমতটে মর্ত প্রাণীর শেষ আশ্রয়গুলিতে যে পরিণতির চিহ্ন তিনি তাঁর শিশুকালে বা পরবর্তীকালে দেখেছেন, 'বহুকাল পর্যন্ত' বাস্তব বলতে সেটাই তাঁর কাছে গ্রাহ্যসত্য ছিল। কিন্তু সে কথার আভাস দিয়ে খানিক আগে তাঁর অনবধানতা বিষয়ে তর্ক তুলেছিলাম, লেখক নিজেই সেখানে পৌঁছে বাস্তবের 'স্তরান্তরার' প্রসঙ্গ টেনে এনে শেষ যুযুৎস্যুর প্যাঁচটি কষিয়েছেন এবং সেটি মোক্ষম। লেখকের সোনার দ'ত কলম হোক। এরকম যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী ক্যাচালই এক্ষেত্রে একমাত্র আলোচ্য নয়।

এবার গ্রন্থটির নির্মাণ প্রচেষ্টা বিষয়ে দুটি সংবাদ। লেখকগত শতকের সত্তর আশির দশকে পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন বাংলার গ্রাম এবং মফঃস্বল। বরিন্দ্ এবং রাঢ়ের নিদাঘ তপ্ততা পেরিয়ে শেষতক দক্ষিণ বাংলার সমতট। মস্তিষ্ক মোহশূন্য ছিল না। সেখানে শ্যামলিম প্রকৃতি, জনপদ বধূদের জল নিয়ে ঘরে যাওয়ার নয়নলোভন ছবি, স্নিগ্ধ সজল নীলঞ্জন ছায়ার প্রত্যাশা অবশ্যই ছিল। কিন্তু বদলে গভীর হতাশায় পেলেন প্রকৃতি এবং প্রাকৃতের পিশাচ-প্রতীম সব ছবি। ছবিগুলি বিচ্ছিন্ন, কিন্তু সামগ্রিকতায় বিশ্লিষ্ট নয়। ছবিগুলি পড়লে রবি ঠাকুরের প্রাগুক্তগানটির অন্তর্নিহিত আর্তি বা আকাঙক্ষার কথা মনে আসে, 'আবার কবে ধরণী হবে তরুণা। কাহার প্রেমে আসিবে নেমে স্বরগ হতে করুণা।' হাসানের ব্যক্তিগত গদ্যের এই পরিক্রমণ-স্মৃতিতে যে রসটি প্রোজ্জ্বল, তা এই গানটির মতোই করুণ। যেন তার রস ব্যাখ্যা। ধরণী যেন হাসানের বৃদ্ধ মা বাবার মতোই প্রাচীন এবং বোধ, অনুভূতিশূন্য হয়ে শেষ প্রহরের অপেক্ষায়। তাঁরা সবাই যেন দূরবাসী হয়েই চলেছেন।

নিরর্থক জেনেও প্রকাশনা বিষয়ে দু'একটি মন্তব্য না করে পারছি না—

(ক) প্রুফ সংশোধনের দায়িত্ব প্রকাশকের। অবহেলাকৃত এবং অকাতর মুদ্রণ-প্রমাদ প্রকাশকের মর্যাদা বৃদ্ধি করে না। বরং লেখকের প্রতি তা অসম্মান জ্ঞাপনের পর্যায়েই পড়ে।

(খ) 'মুক্তধারা'র সংস্করণে যে রচনাটির নাম দেখেছিলাম 'ঐখানের কথা'। বর্তমান সংস্করণের সূচিতে এবং নিবন্ধের শিরোনামে তা ছাপা হয়েছে 'খানের কথা'।

(গ) 'শ্যামল ছায়া নাই বা গেলে'র 'শ্যামল ছায়ার' পরে রবীন্দ্রনাথ একটি কমা চিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন। সেটি লুপ্ত হলে রবীন্দ্রনাথ বা উদ্ধৃতকারী হিসাবে লেখক কারুরই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সেটি লোপাট হয়েছে।

BanglaBook.org

(ঘ) এছাড়াও 'না' এর স্থলে 'নয়', 'য়' এর স্থলে 'র' ইত্যাদির ভ্রুক্ষেপহীন প্রমাদ শব্দের অর্থবিভ্রম ঘটায়। ব্যাপারটি ক্ষুদ্র কিন্তু পাঠক ক্লেশ ভোগ করবেন কেন?

(ঙ) "ওর মাংস মজ্জা পেশি সব গেছে এক?" (শ্যামল ছায়া) এই বাক্যটি বা প্রশ্নচিহ্নটির মানে কী, বোঝা গেল না।

তথাপি সুন্দর প্রচ্ছদ, দামী কাগজ, ছাপার অক্ষরের দর্শনধারী চেহারা এবং সুদৃশ্য বাঁধাই ইত্যাদি সহযোগে একখানা চমৎকার বই পাঠকদের উপহার দেবার জন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ। আকালের বাজারে এই বা কম কী?

—— o ——

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

লেখকের প্রস্থান

লেখালেখির জগৎ থেকে সম্প্রতি বিদায় নিয়েছি। কারণটা নিম্নরূপ— কোনও লেখক যদি দৈবাৎ একটি পুরস্কার লাভ করে দৈনিক পত্রিকায় খবর হন, তবে সাধারণ এবং সারস্বত ক্ষেত্রে তার দুটি প্রতিক্রিয়া হয়। দুটিই খ্যাতির বিড়ম্বনার বিষয়। এখানে একটির বিষয়েই বলব। দ্বিতীয়টি লেখকদের আভ্যন্তরীণ ঈর্ষা সংক্রান্ত বলে সে ব্যাপারে কিছু বলব না। যাঁরা রবীন্দ্রনাথ নাড়াচাড়া করেছেন, তাঁরা এর স্বরূপ সম্যক জানেন। আমার ক্ষেত্রে প্রথম বিড়ম্বনার ধরণটা কেমন ঘটেছে বা এখনও ঘটছে, তাই নিয়ে আজকের এই গদ্যপ্রয়াস। এবং তিন সত্যি, এরপর আর কলম খুলবো না।

আমি খুব একটা মিশুকে মানুষ, সামাজিক মানুষ বলে পাড়ায় তেমন প্রসিদ্ধি নেই। বরং তার উল্টোটাই বহুকাল ধরে ছিল। এখানে বসতি স্থাপনের পর না পাড়ার মানুষ আমাকে আপন করে নিয়েছিল, না আমি তাদেরকে। তার সম্যক কারণ ছিল। তখন সদ্য যৌবনকাল। যে সব গুণ থাকলে একটি যুবক নবাগত হলেও পাড়ায় আদৃত হয়, আমার মধ্যে সেইসব গুণের ছিটেফোঁটাও ছিল না। ইন্‌ডোর বা আউটডোর কোনো রকম খেলায়ই আমার না ছিল দক্ষতা, না আকর্ষণ। ক্লাবের ব্যাপারে, আমার এই পাড়ায় বসত করার আগের পাড়াগুলোর অভিজ্ঞতা ভাল ছিল না বলে ওদিকে ভিড়িনি। এখানে বসবাস করার আগে পর্যন্ত আমার কিছু রাজনৈতিক অবস্থান ছিল এবং তার মধ্যে গোপনীয়তাও ছিল ভীষণভাবে আবশ্যিক। ততদিনে যদিও ওব্যাপারে মোহমুক্তি আমার প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছিল, তবে বিপদমুক্ত ছিলাম না। এইসব কারণে আমার নিরালা বসবাসটাই কাম্য ছিল। তাছাড়া স্বভাবগত ভাবেও আমি ভীষণ কুঁড়ে, বিষণ্ণতাপ্রেমী এবং নিঃসঙ্গ-নিরালা জীবন যাপনে অভ্যস্ত। এর কারণ ব্যাখ্যা করা সময় ও পরিসর সাপেক্ষ বলে তা নিয়ে বিস্তারিত হচ্ছি না। দীর্ঘকাল বইই আমার একান্ত ও একমাত্র সঙ্গী, এমন কী তা এতটাই, যে আমার স্ত্রী পর্যন্ত বইকে তাঁর সতীন বোধে ঈর্ষা করেন। এভাবে চলছিল খারাপ না। আমার মত

BanglaBook.org

একজন জাত কুঁড়ে মানুষের পক্ষে এরকম নিটোল একটা অসামাজিক জীবনযাপন বাস্তবিকই খুবই পুষ্টিকর এবং কাম্য।

কিন্তু কাল হল লেখক হবার সাধ করে। পাড়ায় অ-মিশুকে বা অসামাজিক বলে কুখ্যাতি থাকলেও পাঁড় আড্ডাখোর হিসাবে বন্ধু মহলে কদর ছিল। বাড়িটাই ফলে হয়ে উঠেছিল একটা আন্তর্জাতিক আড্ডাকেন্দ্র। সেখানে দেশ-বিদেশের, জাত-বেজাতের কথা সাহিত্যিক থেকে আউল, বাউল, কত্তাভজা, বলাহাড়ি, সাহেব-ধনি, ফকির-দরবেশ, ব্যায়লা-বাদক, পালাগান গাইয়ে ইত্যাদি ছত্রিশ জাতের খিচুড়ি কালচারের অ্যাক্টিভিটি। সেই কালচারাল জগতে আমি একমেবাদ্বিতীয়ম্ 'চাড়াল'। 'র'টা পালটে 'ড়' করলাম সত্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে। 'কাল' টা বাদ। তারই পরিণামে লেখক হওন। তাতেও ক্ষতি ছিল না। প্রকৃত সমস্যা বা বিড়ম্বনা শুরু হল, একটা 'উম্‌দা' পুরস্কার পেয়ে। তার অর্থমূল্যটা অবশ্যই লাভের চাইতেও বেশ এবং তার পুরোটাই নিজস্ব। তৎসহ প্রচার কী? না, এই লেখা নাকি ন'সিকে অরিজিন্যাল। বাঙালির ঘরে রাখার মতো কিতাব নাকিএটি। তারপর শুরু সম্বর্ধনা, অভিনন্দন ইত্যাদির প্রতিযোগিতা। কাউকেই না বলা যায় না, যদিও পারিবারিক ভাবে তখন অত্যন্ত ধ্বস্ত অবস্থা। এর সঙ্গে লেখা চাই। না বলা চলবে না। কারণ না বলা মানেই হলো 'দর বাড়ানো'। সর্বত্র বলি যে, লেখক বলতে যা বোঝায়, তা আমি নই। আমার যেসব খ্যাতির কথা প্রচার পাচ্ছে তার পিছনে একটা বড় রকমের ভুল কোথাও আছে। কিন্তু সেসব যতবার যতভাবেই বলি না কেন সবাই ভাবে 'ঘ্যাম্' হয়েছে, দর বাড়াচ্ছে। বিনয় দেখাবার নামে এড়িয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার যদি কখনো কারুর কাছে জানতে চাই আমার কোনো লেখা পড়েছেন? উত্তর পাই, সে আর পড়িনি, আপনি বলছেন কী? এই তো সেদিনই আপনার পুরস্কার পাওয়া লেখাটিই পড়লাম। বেড়ে লিখেছেন মশাই। ঐ তো আনন্দবাজারেই বেরুলো তো? কী যেন নামটা বিষাদ-সিন্ধু না কী যেন? আমার বইটির নাম 'বিষাদবৃক্ষ'। ২০০৫-এ আনন্দবাজারে সেটির পুরস্কৃত হবার খবরটিই বেরিয়েছিল, বইটি নয়। তার আগে পরে খান দশেক বই আমার প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং সম্বর্ধনা প্রদানকারী এইসব পাঠক ভক্তরা লেখা চাইতেই পারেন। কেউ কেউ আবার বাজারে দেখা হলে সাহিত্য-সংবাদ আদান-

BanglaBook.org

প্রদানটা আরও সুন্দরভাবে সারেন। একটা বই দেবেন তো, পড়ে দেখবো। আজকালকার লেখকরা কী যে লেখে, মাথামুণ্ডু বুঝিই না কিছু। সে ছিল নবীন, বঙ্কিম এঁরা। আসলে জানলেন একটা ন্যাশনাল স্পিরিট যদি লেখার মধ্যে না থাকে, মানে দেশপ্রেম আর কী, একটা তেজ, প্রতিবাদি কণ্ঠস্বর, এইসব না থাকলে লেখা পড়ে ঠিক জুৎ হয় না এবং একইসঙ্গে মাছ তরকারির দাম আগুন হওয়ার জন্য বিক্রেতাদের চাব্‌কে সরকার কেন ছাল তুলে লাল করে দিচ্ছে না, নেকস্‌ট ইলেকশানে এদের আর ভোট দেয়া উচিত হবে কী না, ইত্যাকার সব জরুরি কথা একসঙ্গে শেষ করে, তাহলে এখন আসি, একটা বই দেবেন কিন্তু। ঐ চালওয়ালার দোকানে রেখে গেলেও আমি পেয়ে যাব। আসলে দেখা সাক্ষাৎ তো হয় না—হেঁ হেঁ।

এহ বাহ্য। একটা মোক্ষম ঘটনা বলি শুনুন। একটি নামী ক্লাবের দামী লাইব্রেরির পাঠকক্ষ উদ্বোধন উপলক্ষে আমন্ত্রণ। তাঁরা একটি সম্বর্ধনার আয়োজনও করেছেন। বিশেষ অনুরোধ একটি স্ব-রচিত প্রবন্ধ পাঠ করতে হবে। এইসব সভায় মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ, সেক্রেটারি ইত্যাদিরা না থাকলে মানায় না। তাঁদের গণসংযোগটা বেশ সহজে, মুফতে হয়ে যায়। সেসব ঠিকই যথানিয়মে ছিল। সভাপতিত্বে, বর্ষীয়ান এক আঞ্চলিক নেতা তথা পৌরপিতা; অধুনা প্রয়াত। আমার সঙ্গে দুএকটা সভায় ইতিপূর্বে পরিচয়াদি হয়েছে। সদাশয় পরোপকারী মানুষ। তবে বয়সটা স্মরণশক্তির পক্ষে অনুকূল নয়। জনাপাঁচেক বিশেষ বক্তার ভাষণের পর তাঁর খেয়াল হলো এবার লেখককে মানপত্রটা ধরিয়ে দিয়ে, তার প্রবন্ধ পাঠের সুযোগ দেওয়া উচিত। ক্লাব সম্পাদক মানপত্র পাঠ এবং প্রদান করে বসতেই সভাপতির কী খেয়াল হলো, তিনি লেখককে অর্থাৎ এই অধমকে সম্বোধন করে তাঁর ভাষণ শুরু করলেন। বস্তুত সভাপতির ভাষণ সর্বশেষ অ্যাজেণ্ডাই হয়ে থাকে। মানপত্রের জবাবি ভাষণে আমার প্রবন্ধ পাঠটি নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি মাথা টানলেও কান। লেখককে টানতে গিয়ে তার লেখ্য বিষয়ও এসে গেল। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে যা বলতে শুরু করলেন, তা শুনে, মঞ্চের এক প্রান্তে বসে থাকা আমার তো অবস্থা খাস্তা। সে বক্তব্যে প্রায় দাঙ্গা লাগার মতো অবস্থা। আসলে বইটিতো

BanglaBook.org

তিনি পড়া দূরস্থান, দেখেনওনি। আমার বিষয়েও তেমন জানাও নেই। তাতে কিছু ক্ষতি ছিল না। সমস্যা দাঁড়ালো বানিয়ে বলতে গিয়ে। সভা আরম্ভ হবার আগে আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, বইয়ের বিষয়বস্তু কী। এককথায় বলে দিয়েছিলাম, 'দেশভাগ'। ওটাই সর্বনাশের কারণ। সহজ হিন্দু সমীকরণে সভাপতি মশাই অঙ্কের ছকটি সাজিয়েছিলেন। দেশভাগ—হিন্দুস্তান—পাকিস্তান—হিন্দু, মুসলমান দাঙ্গা—উদ্বাস্তু—ক্যাম্প জীবনের দুঃসহ দুঃখ এবং বানিয়ে লিখতে গিয়ে যেমন গরু—বিদ্যাসাগর—শ্মশান ইত্যাদি মিলেমিশে খিচুড়ি হয়, তাঁরও তাই হল। আমি বাধ্য হয়ে বলে উঠলাম, দাদা আমি ওসব লিখিনি। কিন্তু মাইক হাত থেকে না নেওয়া পর্যন্ত তিনি থামার নামই করছিলেন না. সভা এবং মঞ্চে বেশ কয়েকজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভদ্রলোক ছিলেন, সভাপতির ভাষণে যদিও সাম্প্রদায়িকতা-দোষ তেমন ছিল না, সামান্য একটু এদিক-ওদিক ছিল। কিন্তু বিষয়টি তো স্পর্শকাতর এবং অস্বস্তিকর, আর কদর্থ করার মতো লোকের অভাবও এসব ক্ষেত্রে হয় না। তাই সে এক আচ্ছা বিড়ম্বনা। যা হোক, শ্রোতা দর্শকদের মধ্যে তখন বেশ একটা উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে, কিছু স্বার্থগন্ধী লোক কাঁঠালের ভূতির ওপরের মাছির মতো ভন্‌ভনানি শুরু করে দিয়েছে। আমি বলা কওয়ার ব্যাপারে বেশ কিছুটা তোত্‌লা। নার্ভাসও। প্রাণপণে বলতে চাইছিলাম, আমি ঠিক ওইসব কথা লিখিনি। সভাপতি মশাই ভুল বুঝেছেন ইত্যাদি। আসলে উনি বইটা বোধহয় পড়েনইনি। কিন্তু একথায় বিক্ষোভ আবার দ্বিমুখী হল। সভায় দুটি পক্ষ ছিলই, হয়তো ততোধিক। এখন মূলত দুটি শিবিরে জোটবদ্ধ। এ দল বলে, ওসব লেখেননি মানে? তাহলে কী লিখেছেন? ও দল বলে, সভাপতি পড়েনইনি বলতে আপনি কী বলতে চান? উনি না জেনে ঐসব বলেছেন? সে এক মহাবিভ্রাট। যা হোক, তখন সভাপতি নিজেই তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভার সাহায্যে সভা শান্ত করে আমাকে প্রবন্ধ পাঠ করার অনুমতি দিলে আমি ঢক ঢক করে দু'গ্লাস জল খেয়ে পাঠে মন দিলাম। কিন্তু ঠিক আমার পিছনে উপবিষ্ট মন্ত্রীমশাই এবং জনৈক সাংসদ তখন এত উচ্চরবে কিছু জরুরি কথাবার্তা বলতে থাকলেন যে তাঁদের কথা আর আমার পাঠ একসঙ্গে 'মাইকায়িত' হয়ে শ্রোতাসাধারণের

BanglaBook.org

শ্রবণপীড়ার উদ্রেক করল। ফলে পুনরায় বিশৃঙ্খলা। বাধ্য হয়ে সভাপতির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কী পড়ব? আপনি বরং মাননীয় মন্ত্রীমশাই এবং সাংসদ মশাইকে বলুন না, পাশের ঘরে গিয়ে কথাগুলো সেরে ফেলতে। ওঘরটা বেশ নিরিবিলি এবং ওটাও সরকারি অনুদানেই তৈরি। সভাপতি কিছু বলার আগেই তাঁরা দুজনে উঠে গেলেন। তবে পাশের ঘরে গেলেন, না রাগ করে একেবারেই চলে গেলেন, তা ঠিক খেয়াল রাখতে পারিনি। মনে মনে বেশ একটু ভয়ও পেলাম। সরকার এবং বিরোধীপক্ষ উভয়কে চটানো কী ঠিক হলো? পাব্‌লিক জানতে পারলে ওখানেও ভিড় জমবে।

সেই থেকে লেখার ব্যাপারে আমি খুবই সতর্ক। সম্বর্ধিত হবার আমন্ত্রণ রক্ষার ক্ষেত্রেও। লোকে আমায় খারাপ ভাবে ভাবুকগে। দাঙ্গার ভয়তো থাকবে না। তবে আসল কথাটা গোপনে বলি। এসব খারাপ ভাবা টাবা কিছু নয়, ওসব গেরাহ্যি করার বান্দা আমি নই। আমি হলাম বনেদি কুঁড়ে এবং সেটাই প্রকাশ্যে বলতে পারি না বলে নানান ধানাই পানাই গাওনা গাই। গোপনে বলছি এ কারণে যে কুঁড়েমির জগতে এখনও জনস্ফীতি ঘটেনি।

এর মধ্যে আবার একটি অত্যন্ত উচ্চতম শ্রেণীর ব্রাহ্মণত্বের দাবিদার, আমার বই-এ তাঁদের বিপ্র সম্প্রদায়কে হেয়ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে বলে, আমাকে প্রথমে মূর্খ, পাঁঠা, গাধা জাতীয় বিশেষণে বিশেষিত করেও সন্তুষ্ট না হলে, দশলক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণের একটি মামলা দায়ের করে, মামলা চালাবার জন্য স্ব-সম্প্রদায়ের কাছ থেকে মব্‌লগ চাঁদা তুলতে শুরু করে দিয়েছেন। তাতে তাঁদের সঙ্ঘ বা সঙ্ঘ মাতব্বরদের রোজগার ভাল হলেও আমার প্রচার প্রতিপত্তি বা বই বিক্রি তেমন বৃদ্ধি পায়নি। কারণ ব্যাপারটির বিবরণ কোনও দৈনিক পত্রিকার খবর হয়নি এখনও। বাড়িতে দু দুবার রুদ্রচণ্ড হামলাও হয়েছে। হবারই কথা। তাঁদের দাবি তাঁরা নাকি রুদ্রজ ব্রাহ্মণ। সুতরাং রুদ্র বীর্যের অমোঘতা যাবে কোথায়? আমার অপরাধ, তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মুসলমান জোলাদের সঙ্গে তাদের জাতিনাম একই সাথে ব্যবহার করেছি আমি। সে কারণে তাঁরা অসম্মানিত বোধ করেছেন। ভীষণ হিন্দু কিনা। খোঁজ নিয়ে এবং বিশেষ

BanglaBook.org

করে তাঁদের উকিলের চিঠি মারফৎ জানলাম যে তাঁরাও বইটি পড়েননি, পত্রিকার খবর পড়েই রুদ্র রোষ ফেটে পড়েছে। আমার লেখার অবদান এই ব্যবহার, ওদিকে প্রকাশক হাত উপুড় করছে না।

তাই বলছিলাম, আর যদি কলম খুলি তো কলমের মাথা খাই। এরপর যদি আপনারা আমার নামে কোনো লেখা দেখতে পান, জানবেন আমার কোনো দুশমন সে কাজটি করেছে। আমি নই। লেখক আমি অতঃপর বানপ্রস্থে প্রস্থান করলাম। আপনাদের কল্যাণ হোক।

—o—

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG